প্রথম প্রকাশ :

রথযাত্রা ১৩৬৬

অন্নপূর্ণা প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস কর্তৃক ৩।১ কলে
কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও প্রভাস চন্দ্র দাস কর্তৃক সত্যন
প্রেস, ২২/১/জে, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মু

উৎসর্গ

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের
সম্রাজ্ঞী
শ্রদ্ধেয়া লীলা মজুমদারকে,
যিনি আমাকে মুগ্ধ
বিস্ময়ে মগ্ন রেখেছেন তাঁর
সোনার লেখনীর যাদু স্পর্শে

সূচীপত্র

শিকার উপন্যাস

শিকার কাহিনী

শিকার অমনিবাস প্রসঙ্গে

বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের মতে "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" বর্তমান গ্রন্থে অরণ্যের নিভৃত গহনে লুকিয়ে থাকা ভয়ংকর সুন্দর বাসিন্দাদের বিচিত্র কাহিনী বলা হয়েছে। এর মধ্যে আছে অরণ্যের অধিপতি ডোরাকাটা বাঘ, আছে জঙ্গল-সম্রাট পিঙ্গল-ধূসর সিংহ, শয়তান চিতা আর দামাল হাতী।

কিন্তু এ কাহিনী কি শুধু রাইফেলের ট্রিগার-হতে ছিটকে আসা তপ্ত সীসের ব্যথার্ত আর্তনাদ? এ কি শুধুই পশু হত্যার ধারাবাহিক নিষ্ঠুর ইতিবৃত্ত? অথবা উন্নাসিক শিকারীদের পৌরুষ-দৃপ্ত আত্ম গরিমার জঘন্য বহিঃ প্রকাশ?

না, শিকার মানুষের বিজয়—লালসা মেটায় না, সে হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতায়। সেই কবে, সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে, খেয়ালী প্রকৃতির খেলাঘরে জন্ম নিয়েছিল আদি অরণ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার-বার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।

তারপর কালের আবর্তনে ধরণী হল তরুণী, তার দেহের আনাচে কানাচে জমল পরিপূর্ণতার বিস্তৃতি। সেদিনের আদি অরণ্য বিচিত্রতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল বসুন্ধরার বুকে। তাতে লাগল ছন্দের দোলা,

শুরু হল আলো আঁধারির খেলা, দেখা দিল সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দিবাকরের অরুণ আলোর আল্পনা।

কোথাও সে তুষার শুভ্র শঙ্খধবল রূপে উন্মোচিত, কোথাও তার বুকে নববরষার সজল মেঘের রঙ, আবার কখনো সে হয়েছে নব-দূর্বাদল শ্যামের মত চঞ্চল চিকন। রূপের এই রূপান্তর অরণ্যকে করেছে চির কুহক ঢাকা, সে যেন রহস্য তন্ময়তা ভরা দূরের উপত্যকা আর অভিযাত্রীরা হল মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক শিশুর দল। অন্তহীন অভিযানে তারা কোন দিনই অরণ্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবে না। চলবে শুধু ইশারায় আন্তরিক পরিচয়ের পালা।

এই অরণ্য তার বিশালতায় ভরিয়েছে মহাকবি উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের দরদী মন। তিনি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন মহাজীবনের বিশালতাকে—

Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain -- tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchymy ;

ভাববাদী কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে এই অঙ্গন যেন ধরিত্রীমাতার রত্ন খনি। যার স্নেহার্দ্র বুকের বাঁধন ছিন্ন করে চোখ মেলে পার্থিব নারী, বিচ্ছেদের বেদনায় স্রষ্টা হয় কাতর—

Three years she grew in sun and shower,
Then Nature said, A lovelicr flower
On earth was never sown ;
This child I to myself will take
She shall be mine and I will make
A lady of my own.

আবার এই বনানীর চিরন্তন সৌন্দর্য অন্বেষণে চীনা কবি লি-তাই-পো (Li Tai Po) বলে ওঠেন—

Flocks of birds have flown high and away.
A solitary drift of cloud, too, has gone
Wandering on
And I sit alone with ching-ting Peak
towering beyond
We never grow tired of each other
The mountain and I.

দেরাদুনের নির্জন কারাগারে নির্বাসিত জওহরলালের কাছে অরণ্য তার অনাবিল প্রাণ সত্তা নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে—

It was a gay and cheering sight. And then, very rapidly the leaves would come out in their millions and glisten in the sun light and play about in the breeze. How wonderful is the sudden change from bud to leaf !

শৈশবী কল্পলোকের কবি ওয়ালটার ডেলা মেয়ার অনুভব করেন অরণ্য মধ্যবর্তী নিঃসঙ্গতার আকুল আর্তিকে—

And he felt in his heart there strgangeness
Their stillness answering his cry,
While his horse moved, cropping the dark turf
Neath the starred and leafy sky.

বিপ্রলম্ভের বেদনা বিলাসের প্রতীক হিসেবে বনানী যুগে যুগে বিরহের মুরলী হয়ে বেজেছে। কালিদাসের কল্পনা তাই বিরহী যক্ষের সঞ্চারী মেঘের মতো নীলাম্বরে উড়ে চলে—

"নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥"

হাণ্টারের শিকারী জীবন আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরণ্য অঞ্চলে অতিবাহিত হয়েছে। ডেভিড লিভিংস্টোন অন্ধকারাছন্ন মহাদেশে যে জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন হাণ্টারকে তারই দৃপ্ত শিখা বলা যেতে পারে। 'আফ্রিকান সফারী' আখ্যানে মাসাই জাতির সিংহ শিকারের মনোজ্ঞ কাহিনী রয়েছে।

পালিতা সিংহী কন্যা এলসার মাধ্যমে জয় অ্যাডামসনের নাম আজ সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর অমর লেখনীকে আশ্রয় করে একাধিক চাঞ্চল্যকর শিকার—চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়েছে চরম উত্তেজনা ও গভীর সন্তোষ। অ্যাডামসনের আদরিণী এলসার একটি করুণ রস সিক্ত কাহিনী এই গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়াবে।

কর্ণেল অ্যালেন লক তাঁর শিকারী অভিজ্ঞতার জন্যে বেছে নেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিভৃত বনাঞ্চল। "মালয় অরণ্যের যমজ বাঘিনীর" মধ্যে সেই অনুভূতির স্থান আছে।

শের জঙ্ হলেন ভারতীয় শিকারী। হিমালয় পাদদেশে কেটেছে তাঁর শৈশব ও যৌবন। তিনি একাধারে কবি ও শিকার শিল্পী। "আমার প্রথম শিকারে" তাঁর কবি সত্তার সার্বিক উদ্ভাস দেখা যায়।

প্রসঙ্গত একটি কথা, এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক পাঠিকারা যেন অরণ্য অধিপতিদের সম্পর্কে ভীতি বিহ্বল মনোভাব পোষণ না করেন। আপাত দৃষ্টিতে যারা চলমান শয়তান, অন্তরালে তারাই হল নির্বাসিত সৌন্দর্য। উইলিয়াম ব্লেকের ভাষায়—

Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry ?

সত্যি, পৃথিবীর এমন কোন শিল্পী বা সাহিত্যিক নেই যিনি নিশান্তিকার ম্লান আলোকে উদ্ভাস ডোরাকাটা শ্বাপদের অভিব্যক্তির

নিখুঁত রূপ দিতে পারবেন। তাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে এসব কাহিনী হল আন্তরিক প্রয়াস মাত্র।

॥ তিন ॥

শিকার সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ মাননীয় অমিয় কুমার চক্রবর্তীকে আমার নমস্কার জানাই। সহৃদয় সহযোগিতার জন্যে স্মরণ করি শ্রদ্ধাভাজন ব্রজকিশোর মণ্ডল ও বিজয় চক্রবর্তীকে।

প্রকাশক অজয় দাস দারুণ শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও এই গ্রন্থ প্রকাশে যে তৎপরতা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার জন্যে তিনি আমার ধন্যবাদ পাবেন। গ্রন্থের প্রকাশন—নিপুণতা তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিশিষ্ট শিল্পী গণেশ বসুকে মনোরম প্রচ্ছদের জন্যে অভিনন্দন জানাই। রেখাঙ্কনের কাজে তরুণ শিল্পী স্বপন রায়চৌধুরী কে দিলাম শুভেচ্ছা।

প্রসঙ্গত একটি কথা—পাঠক পাঠিকার কাছে শিকার রত্নের পরবর্তী হীরক খণ্ড গুলি আমরা তিনটি পর্বে সুসজ্জিত করে প্রকাশ করার প্রকল্প গ্রহণ করেছি। আশা করি ক্ল্যাসিক অনুবাদ সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে এই সংগ্রহটি চিরন্তন সংযোজন রূপে গণ্য হবে।

॥ চার ॥

পরিশেষে স্মরণ করি সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিটি যার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে আমাদের হৃদয়ের অন্তর্লীন বেদনা ও অনন্ত অন্বেষা—

I had an inheritance from my father
It was the moon and the sun
I can move throughout the world now
The spending of it is never done.

পাঠক পাঠিকাদের জানাই হৃদ্য শুভ কামনা।

ইতি—

শুভ রথযাত্রা
তেরোশো ছিয়াশী

পৃথ্বীরাজ সেন


শিকার



সম্পূর্ণ শিকার উপন্যাস

জ্যোৎস্নার অরণ্যে অভিসার

জিম করবেট

জিম করবেট—যে নামটি শুনলে অরণ্য প্রিয় মন হঠাৎ চলে যায় গহন বনে, যে নামটি ভারতের অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে, সেই কিংবদন্তীর নায়ক মহান শিকারীর সর্ব শ্রেষ্ঠ শিকার উপন্যাস।

হিমালয়ের পাদদেশে ফুলের চাঁদোয়ার নীচে সোনালী গায়ক পাখীর মেলা, তারই অন্তরালে চিরতুষারের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আর আছে বিস্তৃত তৃণ ভূমি, যার এখানে সেখানে জেগে আছে হিংস্র শ্বাপদ শয়তান।

কখন যে বাতাসে উঠবে আলোড়ন, রক্ত তৃষ্ণায় মত্ত হবে মানুষ-খেকো, কে বলতে পারে?

পাহাড়ী বন আর মানুষকে নিয়ে লেখা অনবদ্য এই উপন্যাসটি শিকার সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

॥ এক ॥

বিন্দুখেড়া সত্যিই সুন্দর জায়গা—হিমালয়ের পাদদেশের গাছ-গুলো যখন ফুলে ভরে যায়, তখন তার নিচে ক্যাম্প ফেলার মত এত সুন্দর উপযুক্ত জায়গা আর কোথাও সত্যি নেই। কমলারঙের ফুলের চাঁদোয়ার তলায় সারি-সারি-সাদা তাঁবু। লাল-লাল সোনালী মিনিভেটের মাঝে সোনালী গায়ক পাখী, লাল মাথা কাকাতুয়া, সোনালী পিঠ কাঠঠোকরা আর গাছে গাছে ড্রোঙ্গোর আনাগোনার ফলে গাছ থেকে সেই ফুল ঝরে যায়। আর মনে হয় মাটির ওপর উজ্জ্বল চাদর বিছানো হয়েছে।

এই দৃশ্যের পেছনে ঘনবনে আবৃত হিমালয়ের পাদদেশের মাথায় পাহাড়ের সারি একের পর এক উঠে চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে গিয়ে ঠেকেছে। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক সকালে বিন্দুখেড়ায় আমাদের ক্যাম্প পড়ে।

এই বিন্দুখেড়া বারো মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া এক বিরাট তৃণ-ভূমির পশ্চিম ধারে। এই সমতল ভূমির ওপর দিকে একটি নদী বয়ে গেছে। তার তীরে কিছু কিছু চাষের জমি ছড়িয়ে আছে, আমরা সেখানে পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ আগে মাঠের ঘাসগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ঘাস আর সবুজ জমি দ্বীপের মতো হয়ে আছে, সেই দ্বীপগুলোতে শিকার পাবার আশায় আমরা এক সপ্তাহের জন্য বিন্দুখেড়ায় শিকারে গিয়েছিলাম। আমি দশ বছর ধরে এখানে শিকার করছি। তাই শিকার পরিচালনার দায়িত্ব আমারই ওপর ছিল।

তরাই এর এই ভূমিতে সুশিক্ষিত হাতির পীঠ থেকে শিকার করার এক সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার আছে। এখানে শিকার ভালই মেলে—দিন ভাল থাকলে কাদাসিঁটা, ভারুই পাখী থেকে চিতাবাঘ, জলার হরিণ, এমন কি বহু রকমের পাখী নজরে পড়ে। ফেব্রুয়ারীর এক সকালে, আমাদের শিকারের প্রথমদিনে, পাঁচজন দর্শক ও নয়জন বন্দুকধারী ছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে আমরা হাতিতে

চড়লাম এবং দুজন বন্দুকধারীর মাঝখানে একটি করে হাওদাওয়ালা হাতি রেখে একটি সারি করে নিলাম, আমি রইলাম মাঝখানের সারি থেকে পঞ্চাশগজ এগিয়ে। আমার দুদিকে রইল চারটে করে বন্দুকধারী ও চারটে করে হাওদাওয়ালা হাতি। আমরা দক্ষিণে রওনা হলাম। লক্ষ্য রাখলাম ডান দিকের জঙ্গল দিয়ে কোন শিকার যেন পালিয়ে না যায়।

এই ধরনের শিকারের সময় একদিকে জায়গা নেওয়াই সুবিধা-জনক। অবশ্য রাইফেল চালনায় খুব সিদ্ধ হস্ত হওয়া চাই। হাতির সারির সামনে কোনো শিকার আটকা পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই একধার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চেষ্টা করে। আর কোন পাখী বা জানোয়ার মারতে কেউ ব্যর্থ হলে সেই পাখী বা জানোয়ারকে পাশ থেকে মারা খুব কঠিন।

ভারতের জঙ্গলে ভোরের বেলা এক মিষ্টি গন্ধে হাওয়ায় নেশা ধরে যায়। পাখীরও যেন এই নেশা ধরে। তাই সব সময় লক্ষ্য স্থির রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে। সেদিন সকালে প্রচুর পাখী ছিল। বনের ধার ধরে এগোবার সময় আমরা পাঁচটি ময়ূরী, তিনটি লালরং মোরগ, দশটা কালোতিতির, চারটে ধূসর রঙের তিতির, দুটো ভারুই পাখী এবং তিনটি খরগোস মারলাম।

বনের একটা সমতল অংশে আমি হাতির সারি দাঁড় করিয়ে-ছিলাম। এ বনের ময়ূরী আর বন-মোরগ বিখ্যাত। এই বনের মধ্য দিয়ে কতকগুলি গভীর নালা চলে গেছে বলে সরল রেখায় সারি বেঁধে এর ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন। তাই আমি এর মধ্যে দিয়ে যেতে চাইলাম না। কয়েক বছর আগে এই জঙ্গলে উইণ্ডহাম আর আমি যখন বাঘের সন্ধানে এসেছিলাম তখন জীবনে এক নতুন ধরণের কার্ডিন্যাল বাছুড়ের দেখা পেয়েছিলাম। এদের আস্তানা হাতি ঘাসের জঙ্গলে। এরা যখন পালিয়ে বেড়ায় তখন খুব উজ্জ্বল প্রজাপতির মত দেখতে লাগে।

আমি হাতির সারিকে একটির পিছনে একটি করে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু দূরে যাবার পর তাদের আবার দাঁড় করালাম। আমরা এখন হিমালয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যে জমিটার ওপর খেদা দেওয়া হয় তার ওপরই নির্ভর করে সতেরটা হাতির সারি কত লম্বা হবে। ঘাস যেখানে ঘন সেখানে হাতির সারিকে আমি এক'শ গজের মধ্যে নিয়ে আসি। আর যেখানে হাল্কা সেখানে তার দ্বিগুণ লম্বাকরি। আমরা যখন ত্রিশটা পাখী আর একটা চিতা শিকার করেছি, তখন দেখলাম একটা ভুঁই-পেঁচা। এরা প্যাঙ্গোলিন আর সজারুর ছেড়ে যাওয়া গর্তে বাসা বাঁধে। এগুলো তিতিরের দ্বিগুণ। যখন ওড়ে তখন সাদা দেখতে হয় আর সাধারণ পেঁচাদের যে ধরণের ঠ্যাং হয় তার থেকে কিছু লম্বা এদের ঠ্যাং।

হাতির সারি দেখলে এরা প্রথমে পঞ্চাশ বা একশ গজ নিচু হয়ে উড়ে যায়। যাতে হাতির সারিটা তাদের গর্তগুলো পার হয়ে যায় তার জন্যই এ রকম করে। দ্বিতীয় বার সেই সারির মুখোমুখি হলেই হাতির মাথার ওপর দিয়ে তাদের বাসার দিকে উড়ে যায়। সেদিন সকালে আমরা যে পেঁচাটার সাক্ষাৎ পেলাম, সেটা কিন্তু অন্য রকম ব্যবহার করল। প্রথমবার ঠিকমত উড়ে গিয়ে হঠাৎ ছোট ছোট বৃত্তাকারে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। কারণটা তখনি বোঝা গেল। দেখা গেল একটা বাজ প্রচণ্ড বেগে বাঁ-দিকের বন থেকে বেরিয়ে এল। গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিতে না পেরে বাজের ওপরে থাকার জন্য পেঁচাটা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল। মাহুতসহ সমস্ত লোকের দৃষ্টি এখন সেই উত্তেজনা ভরা দৃশ্যে নিবদ্ধ দেখে আমি হাতির সারিকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। পেঁচাটা যখন ১০০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে গেছে ঠিক সেই সময় বাজটাও ঐ উচ্চতায় উঠে সমান ভাবে বৃত্তাকারে ঘুরছে।

সারির সবাই তখন দূরবীন হাতে দেখছে—শেষ পর্যন্ত পেঁচাটা কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? হ্যাঁ—একটু পরেই দেখা গেল পেঁচাটা দ্রুত গতিতে মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর বাজটা একলা

আকাশের বুকে ঘুরতে ঘুরতে সেই শিমুল গাছে ফিরে এসেছে। সবাই তখন আনন্দে উল্লসিত, হয়ে উঠলো। সেদিন সকালে চুয়ান্নটা পাখী আর চারটে জানোয়ার শিকার করা হয়েছিল। অথচ বাজপাখীটার হাত থেকে ভুঁইপেঁচাটা নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে বলে বন্দুকধারী দর্শকরা এবং মাহুতরাও মনখুলে আনন্দ করছে।

আমি আবার হাতির সারিকে দক্ষিণ দিকে খেদা দিতে শুরু করলাম। এখানকার নদীর জলে গ্রামের তিনটি জমির জলসেচের ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘাসের জঙ্গল বেশ ঘন। সকলে এখানকার জলা হরিণ শিকারের জন্য তৈরী হয়ে গেল। একটা চিতাও এখান থেকে পাবার সম্ভাবনা আছে।

আরও পাঁচটি ময়ূর, চারটে ক্লোরিক্যাল মন্দাপাখী, তিনটি কাদা-খোঁচা ও একটা হরিণ মারা পড়ল। ঠিক এই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমার হাওদার পেছনে এক দর্শকের হাতের ভারী শক্তিশালী রাইফেল থেকে হঠাৎ আমার বাঁ কানের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। আর কানের পর্দা ফেটে-গিয়ে অত্যন্ত যন্ত্রনা শুরু হ'ল। সে রাতে আমার ঘুম হল না। পরের দিন ভোরবেলা জরুরী কাজ আছে বলে পঁচিশ মাইল হেঁটে আমার কালাধুঙ্গির বাড়িতে চলে এলাম।

কালাধুঙ্গির ট্রেনিং প্রাপ্ত তরুণ চিকিৎসক আমার কানের পর্দাটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করলেন! একমাস পরে আমরা গ্রীষ্ম বাস নৈনিতালে চলে এলাম। সেখানে র‍্যামলে হাসপাতালে নৈনিতালের সিভিল সার্জেন কর্ণেল বারবার ও একই মন্তব্য করলেন। ক্রমশ আমার মাথার মধ্যে এক ফোঁড়া হতে লাগল। আমার কষ্ট দূর করার জন্য তখন আমি আমার দুই বোন এবার কর্ণেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাসপাতাল থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করলাম। এই 'দুর্ঘটনা' বলার কারণ তল্লাদেশের মানুষখেকোর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে তাই।

১৯২৯ সালে আলমোড়া আর নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার পদে

নিযুক্ত হলেন বিল বেনেস ও গ্রাম ভিভিয়ান। দু'জনেই মানুষখেকো বাঘের দাপটে ভুগছিলেন।

আমি ভিভিয়ানকে কথা দিয়ে ছিলাম যে আমি প্রথমেই তার বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করব। কিন্তু শীতকালে বেনেসের তুলনায় তার বাঘটা কম সক্রিয় বলে, ভিভিয়ানের অনুমতি নিয়েই আমি অন্যটিকে প্রথমে মারবার চেষ্টা করব ঠিক করেছিলাম।

আমার এই উপন্যাস তল্লাদেশের বাঘকে নিয়ে। এই বাঘটা বিল বেনেসকে ভোগাচ্ছিল। আমার 'জঙ্গলের উপাখ্যান' এ লিখেছি কিভাবে আমি জঙ্গলে হাঁটতে ও রাইফেল চালাতে শিখেছি।

॥ দুই ॥

৪ঠা এপ্রিল আমি নৈনিতাল ছাড়লাম। সঙ্গে নিলাম ছজন গাড়োয়ালী। তাদের মধ্যে মাধো সিং, রাম সিং, এলাহাই রাঁধুনি এবং গঙ্গারাম ব্রাহ্মণও ছিল। চোদ্দ মাইল হেঁটে কাঠগুদামে নেমে আমরা ট্রেনে উঠলাম এবং বিকেলের গাড়িটায় বেরিলে এবং পিলিভিট হয়ে পরদিন দুপুরে টনকপুব গিয়ে পৌঁছলাম। এখানকার এক পেশকার আমায় জানালে যে, আগের দিন তল্লাদেশের মানুষখেকো একটি ছেলেকে মেরেছে আর বেনেসের নির্দেশে দুটি কাঁচামোষ টোপ হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চম্পাবত দিয়ে তল্লাদেশে পাঠান হয়েছে। আমার লোকজনেরা রান্নাবান্না ও খাওয়ার কাজ সেরে নিল। আমবা চব্বিশ মাইল দূরে কালা ধুঙ্গায় ঐ রাতেই পৌঁছবার জন্য যাত্রা করলাম।

রাস্তার প্রথম বারো মাইল গভীর বনের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। তারপর পায়ে চলা. দুটো পথের একটি পথ দিয়ে কালাধুঙ্গায় নেমে যেতে হয়। অপর পথটি কোলিয়ারের ট্রামওয়ে লাইন ধরে চলে গেছে। এই 'লাইনটি কোথাও জলে ভেসে গেছে, কোথাও পাথুরে অংশের ওপর দিয়ে গেছে। আমরা যখন উপত্যকার 'অর্ধেক রাস্তায়

এসেছি—তখন রাত হয়ে গেছে। আমরা একটি উপযুক্ত চাতাল দেখে তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা করলাম। লোকজনেরা সন্ধ্যা ভোজনের আয়োজন করতে লাগল। আমি তাঁবুর বিছানায় লম্বা হলাম।

গরমে ষোল মাইল হেঁটে খুব ক্লান্ত হয়ে সিগারেট ধরিয়ে শুয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ চোখে তিনটি আলো পড়ল। প্রতি বছরই এপ্রিল মাসে নেপালের বনে আগুন লাগান হয়। তাই আলো দেখে মনে করলাম হাওয়ার দাপটে নদীর উপত্যকার গাছে আগুন এমন করে জ্বলে উঠেছে। এমন সময় আরো দুটো-আগুন একটু ওপরে চোখে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম যেগুলো আগুন বলে মনে করছিলাম সেগুলো আগুন নয়, আলো। আর সব আলো গুলোই একই আকারের ও ২ ফুট দৈর্ঘ্যের। একই ভাবে সব জ্বলছিল, কাঁপছিল না। ধোঁয়ার ও কোন চিহ্ন ছিল না। তারপর ক্রমশ আরো আলো পাহাড়ের চারদিকে দেখা দিতে লাগল। আমার লোক-জনেরাও আগ্রহের সঙ্গে আলোগুলো দেখছিল।

রাত্রিটা ছিল স্তব্ধ। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম কোন শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে কিনা? সেই আলোর দূরত্ব ছিল ১৫০ গজ— কিন্তু তারা জানাল যে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। উল্টো দিকের পাহাড়ে কি হচ্ছে তাই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ক্লান্ত আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রিতে একবার আমাদের ওপরের পাহাড়ে একটা ঘুরালের আতঙ্কিত শব্দ শুনলাম এবং একটু পরেই একটা চিতাবাঘ ডেকে উঠল। এখনও আমাদের অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে এবং উঠতেও হবে অনেকটা শক্ত জায়গা দিয়ে। আমি আমার লোক-জনদের নির্দেশ দিয়েছিলাম খুব ভোরে রওয়ানা হতে। ওরা তাই পূর্ব দিকে সামান্য আলোর আভাস পেতেই আমাকে এক কাপ চা দিয়েই বিছানা গুটিয়ে ক্যাম্প খাট গুছিয়ে তাঁবু উঠিয়ে ফেললো।

আমি লোকজনদের সঙ্গে যাবার সময় নদীর পোলের ওপর দাঁড়িয়ে

কালকের সেই যে-আলো দেখা যাচ্ছিল সেই জায়গাটার দিকে তাকালাম। দূরবীণ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার বার পাহাড়ের মাথা থেকে নদীর ধার পর্যন্ত দেখতে লাগলাম। কিন্তু মানুষ বা কোন পোড়া গাছ চোখে পড়ল না। এও বুঝলাম এক বছরের মধ্যে ঐ স্থানে আগুন লাগে নি। পাহাড়টা খুব শক্ত পাথরের আর পেছনের জায়গাগুলোতে ঝোপঝাড়। যেখানে কাল আলো দেখা গিয়েছিল সেখানে পাহাড়টা সরলভাবে উঠেছে।

নয়দিন পর বিপদগ্রস্ত পাহাড়ীদের উদ্ধার করে আমি এক রাত্রের জন্য কালাধুঙ্গায় তাঁবু ফেললাম। প্রকৃতি প্রেমিকের কিংবা মাছ শিকারীর পক্ষে কুমায়ুনে কালাধুঙ্গার মতো জায়গা খুব কমই পাওয়া যায়। নেপাল ভারতকে যে কাঠ দিয়েছিল তা কেটে আনার সময় কোলিয়ার যে বাংলো বসিয়েছিল সেই বাংলো থেকে জমিটা সারি সারি বেঞ্চের মতো সারদা নদীতে নেমে গেছে। আগে এই সারি ধরে ফসল হত। সকাল সন্ধ্যায় এখানে সম্বর আর চিতল হরিণদের চরতে দেখা যায়।

বাংলোর পেছন দিকটায় সুন্দর বনের মধ্যে চিতাবাঘ আর বাঘের বাস, ময়ূরী, বনমোরগ আর কালেগে পাখীর ঝাঁক দেখা যায়। বাংলোর নীচে বড় বড় জলা ও ভেড়িগুলো সারদা নদীর সব থেকে ভালো মাছ ধরার জায়গা।

পরদিন খুব ভোরে আমরা কালাধুঙ্গা থেকে যাত্রা করলাম। গঙ্গারাম পাহাড় ভেঙ্গে পূর্ণগিরি হয়ে দূর পথে রওনা হল। আর বাকি আমরা সারদা নদীর গভীর উপত্যকা ধরে সোজা এগোলাম। পূর্ণগিরির পবিত্র মন্দিরে পূজা দেখার উদ্দেশে গঙ্গারাম আরো দশ মাইল বেশী ঘুরপথে এগোলো। তাকে বলেছিলাম তল্লাদেশের সেই আলো সম্বন্ধে মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করবে।

পরে গঙ্গারাম পুরোহিতদের কাছ থেকে শোনা একটি গল্প আমাদের শোনাল।

পূর্ণগিরির মন্দিরে ভগবতীর পূজা হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। এখানে যাওয়ার পথ মাত্র দুটো—একটা বরমদেও থেকে অন্যটা কালাধুঙ্গা থেকে। দুটো পথ পাহাড়ের উভয় পাশে এসে মিলেছে। এখানেও একটি মন্দির আছে। কিন্তু বেশী বিখ্যাত মন্দিরটি আরো ওপরে বাঁ দিকে। এটিতে পৌছবার এক-মাত্র পথ হল পাথর খণ্ডের গুহার মধ্য দিয়ে। ভীতু বা বয়স্করা ঝুড়িতে ওঠে। দেবীকে নাকি যা সম্মোহন করেন একমাত্র তিনিই ওপরের মন্দিরে পৌছতে পারেন। আর অন্যেরা অন্ধ হয়ে যান ও নিচের মন্দিরে পূজা দেন।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূজো শুরু হয় এবং মধ্যাহ্নে শেষ হয়ে যায়। মন্দিরের ওপরে যে শৃঙ্গ আছে দেবীর আদেশে সেখানে ওঠা নিষিদ্ধ। অনেক দিন আগে এক সাধু দেবীর আদেশ অগ্রাহ্য করে সেই শৃঙ্গে আরোহণ করেন। দেবী কুপিত হয়ে সেই সাধুকে নদীর ওপরে পাহাড়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন। এই সাধুই পূর্ণগিরি থেকে চিরতরে বহিস্কৃত হয়ে সেখান থেকে আর ৩১০০০ ফুট উচুঁতে দেবীর পূজা করেন আলো জালিয়ে। দেবীর উদ্দেশ্যে মানসিক করা এই আলো এক বিশেষ সময়ে কেবল মাত্র দেবীর প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিরাই দেখতে পান। এই অনুগ্রহ আমার এবং আমার লোকজনের ওপর বর্ষিত হবার কারণ হল, আমরা পাহাড়ীদের উদ্ধারের জন্য এক কাজে যাচ্ছিলাম। দেবী পাহাড়ীদের ওপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে পূর্ণগিরির প্রধান পুরোহিত রাওয়াল আমার কাছে এলেন। আমি পূর্ণগিরির আলো সম্বন্ধে স্থানীয় একটি কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই প্রবন্ধের জন্য তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। আমিই একমাত্র ইউরোপীয় যার ঐ আলো দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাই তিনি আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। তিনি আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যেমন আমি একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম, সেই ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিচের বিষয় গুলো মনে রাখা দরকার।

—আলোগুলি সব একই সঙ্গে জ্বলে ওঠেনি।

সব আলোগুলিই এক আকারের।

বাতাসেও আলোগুলি স্থির ছিল।

তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নড়াচড়া করতে সমর্থ।

পরের বছর ইউ, পি-র গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেইলির সঙ্গে সারদা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। স্যার ম্যালকম আমার প্রবন্ধ পড়েছিলেন। তিনি নদীর উপত্যকার কাছে এসে জায়গাটা দেখতে চেয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে চারজন ছেলে ছিল। তারাই মাছ ধরার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চামড়ার নৌকা বেয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল, এই ছেলেগুলো এক ঠিকাদারের লোক। তাই এরা অত্যন্ত সাহসী আর নদীর গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ।

আগে আমরা তল্লাদেশে যাওয়ার পথে যে চাতালে তাঁবু খাঁটিয়েছিলাম এবারও জেলেদেব সেখানে নামাতে বললাম। স্যার ম্যালকমকে দেখালাম কোথায় আলো দেখা গিয়েছিল এবং কোন পথে আলোটা ওপরে উঠে গেছে। স্যার ম্যালকম জেলেদের জিজ্ঞেস করলো তারা এ সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা। তিনি জানতেন ভারতীয়দের কাছ থেকে কি করে খবর সংগ্রহ করতে হয়। স্থানীয় ভাষায় তাই জিজ্ঞেস করলেন। তারা যা বলল তা হল—তাদের বাড়ী কাংড়া উপত্যকায়। সেখানে তারা চাষবাস করে। কিন্তু তাতে সংসার চলেনা বলে তারা ঠাকুর দান টং-এর কাজ করে টাকা রোজগার করে। তাদের কাজ হল সারদা নদী দিয়ে বড় বড় কাঠের টুকরো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারা নদীর এই গভীর উপত্যকাটিকে ভালভাবে জানে। কারণ, এখানে উল্টোটাল রয়েছে, ফলে কাঠগুলো এখানে আটকে যাবে আর তাদের খুব ঝামেলা হয়। তারা কখনো নদীর এখানে বা অন্য কোন আকারে কোন রকম অদ্ভুত জিনিষ দেখেনি।

আমি স্যার ম্যালকমকে বললাম ওদের আর একটা প্রশ্ন করুন, ওরা

কি কখনো সারদা নদীতে সারা বছর ধরে কাজ করেছে কিংবা এই উপত্যকায় কি কখনো রাত কাটিয়েছে ?

তারা প্রশ্ন শুনে বলল তারা তো এখানে কোন দিন রাত কাটায়নি এবং কাউকে রাত কাটিয়েছে বলেও শোনেনি। কারণ এই উপত্যকায় নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।

আমাদের থেকে দু হাজার ফুট ওপরে একটি সরু ফাটলে বংশ পরম্পরায় ভক্তদের খালিপায়ের দাগ পড়তে পড়তে মসৃণ হয়ে গেছে, সেই ফাটলটা লম্বা ভাবে পঞ্চাশ গজ নেবে এসেছে। সেখানে হাত দিয়ে ধরার কোন জায়গা নেই। এই ফাটলটা পার হতে গিয়ে বহু লোক মারা পড়ে। শেষ পর্যন্ত মহিশূরের মহারাজা কয়েক বছর আগে এই পাহাড় বরাবর নিচের মন্দির থেকে ওপরের মন্দির পর্যন্ত একটা ইস্পাতের তার ঝুলিয়ে দেবার জন্য কিছু টাকা দান করেছেন।

আমার ক্যামেরা বইবার জন্য গঙ্গারাম আমার সঙ্গে রয়ে গেল। আমরা সেই চাতাল থেকে দু-মাইল যাওয়ার পর রাঁধুনী ও ছজন গাড়োয়ালীকে পেলাম। তারপর ছক ধরে আমরা কখনো গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কখনো সারদা নদীর কিনারা দিয়ে হেঁটে চললাম। কালাধুঙ্গা, চুকা পার হয়ে পাহাড়ের দেশে পৌঁছুলাম। যার ওপরে আমাদের গন্তব্যস্থল, যেখানে তল্লাদেশের মানুষখেকোর দৌরাত্ম্য চলছে। পাহাড়ের পাদদেশে আমরা ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে দুপুরের রান্না আহার করলাম। তারপর ১০০০ ফুট উঁচু পাহাড়টা ডিঙোতে হবে।

বিকেলে পড়ন্ত রোদের তেজে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। খুব কঠিন চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলাম। পথটা একটু সহজ করার জন্য কোথাও একটুও বাঁক নেই। বারবার থেমে থেমে আমরা সূর্য্যাস্তের সময় শৃঙ্গ থেকে হাজার ফুট নিচে ছোট্ট একটি গাঁয়ে এসে পৌঁছুলাম। এই গাঁটি এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছিল আমাদের। কারণ মনুষ্য বসতি আছে বলে এই গাঁয়ে মানুষখেকো বারবার হানা দেয়। কিন্তু আমাদের আর এগোবার শক্তি ছিলনা বলে ঐ গাঁয়েই আমরা উঠলাম।

গাঁয়ের দুটি পরিবার আমাদের দেখে খুব খুশি হয়ে খাবারের ব্যবস্থা করলো আর লোকজনদের শোবার জন্য একটি বন্ধ ঘর দিল। যে ঝরনা থেকে এই দুই পরিবারের জলের ব্যবস্থা হয় আমি সেই ঝরনার ধারে একটা গাছের তলায় তাঁবুর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে রইল একটা হ্যারিকেন ও রাইফেল।

প্রত্যেক গ্রামের মাতব্বরদের বিল বেনেস জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, যদি কোন মানুষ বা জানোয়ার বাঘের হাতে মারা পড়ে, আমি না যাওয়া পর্যন্ত তা যেন সরিয়ে নেওয়া না হয়। পেশকার আমায় টনকপুরের দেউনবির মারা যাবার খবর দিয়েছিল ৪।৬ তারিখে। আজ ৬ তারিখের রাত্রি। টনকপুরে গাড়ি ছাড়ার পর থেকে আমরা এক মিনিটও সময় নষ্ট করিনি। আমি জানতাম যে বাঘ তার শিকারের সবটাই খেয়ে ফেলেছে এবং তাকে যদি বিরক্ত করা না হয় তবে সে ধারে কাছেই থাকবে। সেদিন সকালে যাত্রা করার সময় ঠিক করে ছিলাম, একটি মোষকে টোপ হিসেবে ফেলবো।. কিন্তু সারদা নদীর চড়াই থেকে উঠে আসতেই আমাদের পক্ষে কষ্ট কর হল। একদিন নষ্ট হওয়া খুবই আফশোসের ব্যাপার। এতে করারও কিছু নেই। বাঘটা সরে গেলেও খুব বেশী দূর নিশ্চয় যায় নি। তবে আমার অসুবিধে হল যে কুমায়ুনের এই অঞ্চলের পথঘাট আমার ভাল জানা ছিল না।

বাঘটা এখানে আট বছর ধরে রাজত্ব করছে আর দেড়শ লোককে প্রায় মেরে ফেলেছে। সুতরাং না পেলে তার জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। যাই হোক বাঘটা কি করছে তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা না করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ তিন ॥

আমাকে খুব ভোরে বেরোতে হবে। আমি তাই অন্ধকার থাকতে উঠে ঝরণার জলে স্নান করে নিলাম। সূর্য্য ওঠার আগেই আমি ২৭৫ রিগরি মেজার রাইফেলটি পরিষ্কার করে তেল দিয়ে নিলাম। যাত্রার জন্য পাঁচ পাউণ্ড গুলি নিলাম। বাঘের জন্য বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের লোক দুটি তাই আমাদের সঠিক কোন নির্দেশ দিতে পারল না যে, আমরা কতদূরে কোনদিকে গেলে বাঘের দেখা পাবো। আমি সঙ্গীদের ভাল করে খেয়ে নিতে বললাম। আরও বললাম তারা যেন এখন থেকে সর্বদা একসঙ্গে থাকে আর বিশ্রাম করলে যেন খোলা জায়গায় বসে।

আগের দিন বিকেলে আমরা যে পথ ধরে এসেছি সেই পথের চারপাশে দেখতে দেখতে দাঁড়ালাম। টনকপুরে পাহাড়ের পাদদেশে ঘন কুয়াশা। টনকপুরের পর রূপালী ফিতের মতো চক্‌চক করছে নদীটা। চুকা তখনও কুয়াশায় ঢাকা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আঁকাবাঁকা পথটা দেখা যাচ্ছে। দশ বছর পর থেকে মানুষখেকো মারবার সময় আমাকে এই পথের প্রতিবর্গ ফুট চিনতে হয়েছে। শত বৎসর পূর্বে কুমায়ুনের চাঁদ রাজারা পূর্ণগিরি মন্দিরের পুরোহিতদের যে গ্রামটি দান করেন সেই গ্রামটি এবং পূর্ণগিরির শিখর দেশ প্রভাত সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পঁচিশ বছর পর তল্লাদেশে পৌঁছবার 'এই পর্বায় আমার মনে পড়ছে। অনেক দিন হয়ে গেলেও আমার স্মৃতির গভীরে যে সব ঘটনা দাগ কেটেছে তা আজও মুছে যায় নি।

পাহাড়ের অপর পারে গিয়ে দেখি যে পথ ধরে আমরা এসেছি সেই পথটা ছফুট চওড়া একটি ভালো অরণ্য পথের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। আমি এক ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। আমার চোখে কোন গ্রাম পড়ছিল

না আর কোন রাস্তায় যাবো তাও জানা নেই। শেষে ঠিক করলাম পূর্বদিকে গেলে সারদা নদী থেকে দূরে সরে যেতে পারবো। সুতরাং ঐ দিকেই যাত্রা করলাম।

আমাকে যদি বলা হয় পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে কোন সময়ে বেড়ানোর জায়গা ঠিক করতে, তাহলে আমি চোখ বুজে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে এক সকালবেলায় হিমালয়ের উত্তরাভিমুখী কোন বনবীথি সমাকীর্ণ পাহাড় অঞ্চলই বেছে নেব। এপ্রিল মাসে সমস্ত গাছে নতুন পাতা দেখা যায়। এক একটির এক এক ধরনের রং, সবুজ, লাল আর অকির্ড ছাপিয়ে ভায়োলেট বাটার কাপ আর রডো ড্রেনডন ফুটে উঠে। বুলবুল, ব্যাবনার, মিনিভেট বিট এবং আরও নানান জাতের পাখী—শীতের সময় তারা পাহাড় ত্যাগ করেছিল তারা আবার তাদের বাসায় ফিরে এসেছে—আনন্দে গান জুড়েছে। যেখানে কোন বিপদ নেই, সেখানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালে শুধু এই শব্দ গুলোই কানে আসে। যা মনের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। মানুষকে উদাস করে দেয়।

কিন্তু যখন মানুষখেকোর বিপদ থাকে তখন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোর সখ থাকে না। খুব সতর্কতার দরকার হয়, বিপদের ভয় শিকারকে তো আগ্রহপূর্ণ করে তোলেই এছাড়া বনের সব কিছুকে নজরে আনে। যে বিপদকে বোঝা গেছে এবং যার মুখোমুখি হবার জন্য আপনাকে তৈরী হতে হবে। তাই সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে না। কোন পাথরের পেছনে কোন ক্ষুধার্ত্ত বাঘ আছে বলে ভায়োলেট ফুলের রং স্পষ্ট হয় না। বিপদের সময় জঙ্গলের বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেবার জন্য কোন ব্যবলার পাখী ডেকে ওঠে বা ওক গাছের উঁচু ডালে কালো মাথা ওয়ালা মিডির পাখী গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠলে তা মোটেই নিরানন্দের কারণ হয় না।

ভয় আমার ঐতিহ্যগত নয়! ভয়কে প্রতিরোধ করার জন্য এবং তাকে সংযত রাখার মতো অভিজ্ঞতা আজ আমার হয়েছে যা আমার প্রথম

দিকে ছিল না। আগে যে কোন শব্দ শুনলেই ভয় পেতাম। এখন বুঝতে পারি, বিপদটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে আর কোন শব্দে মনোযোগ দেবো। এখন আমার গুলি চালাবার নিশ্চয়তা আছে। অভিজ্ঞতা থেকেই যা আসে এবং এটুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া পায়ে হেঁটে এবং একা একা কোন মানুষখেকো বাঘ শিকার করার মতো অত্যন্ত বিশ্রী রকমের আত্মহত্যা করার পদ্ধতি আর নেই।

সেই এপ্রিল মাসের সকালে বনের যে পথ ধরে আমি যাচ্ছিলাম সেটি এমন এক অঞ্চল দিয়ে গেছে সেখানে একটি মানুষখেকো বাঘ দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে এবং বাঘটা যে মাঝে মাঝে এই পথ ব্যবহার করছে তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তার নানা ধরনের দাগ দেখে। সেখানে চিতা বাঘের, সম্বর, ভালুক, কাকর ও শুয়োরের আসা যাওয়ার অনেক দাগ আছে। এখানে নানা রঙের পাখী আর ফুলের অন্ত নেই। সাদা প্রজাপতির মত অকির্ড ফুলগুলো জল সব থেকে সুন্দর।

একটি গাছে যেখানে অকিড গজিয়েছে সেখানে হিমালয়ের কালো জাতের ভালুকের তৈরী এক অপূর্ব বাসা দেখে তার কুশলতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা ওক গাছ তুষার বা ঝড়ের চাপে দুভাগ হয়ে গেছে, এই ভাঙা গাছের ডাল নিয়ে ভালুকটা বাসা তৈরী করেছে। ভালুকরা এমন ধরনের গাছ বেছে নেয় যা ডাল বেঁকানো যায়, ভাঙে না। ছ হাজার থেকে আট হাজার ফুট উঁচুতে আমি এই ধরনের বাসা দেখেছি। শীতের মাসগুলোতে মধু আর খেজুর খাবার জন্য ভালুকরা যখন নিচে আসত তখন তারা যে বাসা বানাত তাতে পিঁপড়ে ও মাছি মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা থাকত। উঁচুতে বাসার ফলে এরা রোদ পোয়াতে পারে নিশ্চিন্তে।

প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পরে বন শেষ হল। একটি ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়াতে নজরে পড়ল একটা গ্রাম। আমি যখন গ্রামে গেলাম, তখন সমস্ত গ্রামের লোকজন আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলো। মাঝে মাঝে আমি ভাবি কুমায়ুনের যে কোন গ্রামে

কোন আগন্তুক এলে যে উদ্দেশ্যেই আসুক সে সমাদর পায়, তেমন সমাদর পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা আমার সন্দেহ আছে

এ গ্রামেই আমিই প্রথম শ্বেতকায় পায়ে হাঁটা মানুষ, পৌঁছনো মাত্র তারা আমাকে বসার জন্য কার্পেট বিছিয়ে মোড়া দিল। এক গ্লাস দুধ হাতে তুলে দিল। সারা জীবন ধরে পাহাড়ীদের সঙ্গে মেশবার ফলে কুমায়ুনের নানান রকম ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাই তাদের প্রতিটি চিন্তা বোঝার ক্ষমতা আমার হয়েছিল। আমার হাতের রাইফেল দেখে তারা ভেবেই নিয়েছিল যে আমি মানুষখেকো থেকে তাদের উদ্ধার করতে এসেছি।

কিন্তু তাদের অবাক লাগছে এত সকালে আমি কোথা থেকে হেঁটে এলাম। কাছাকছি যে বাংলোতে আমি রাত কাটাতে পারি তা এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে।

আমি তাদের কয়েকটি সিগারেট বিলিয়ে দিলাম। তাতে তাদের মধ্যে বেশ আলাপীভাব দেখলাম। তাদের কতকগুলো প্রশ্নের জবাব দিয়ে, আমি তাদের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। ওরা বলল গ্রামটির নাম তামালি। গ্রামটি বহু বছর ধরে মানুষখেকোর উপদ্রবে ভুগছে। সবায়ের মতে সে বছর বাটি সিং কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটতে গিয়ে তার বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে এবং দাম সিং ত্রিশ টাকা দিয়ে যে কালো ষাঁড়টা কিনেছিল, সেটা সেবার পাহাড় থেকে পড়ে মরে যায়, ঠিক সেই বছরই মানুষখেকোর আবির্ভাব ঘটে, শেষে যে মানুষ খেকোর হাতে মারা গেছে সে হ'ল কুন্দনের মা। সে মারা গেছে আগের মাসের বিশ তারিখে।

বাঘটা মাদী না মদ্দা তা কেউ জানে না। তবে সেটা বিরাট আকৃতির। এর জন্য সারা গ্রামে এমন ভয়ের সঞ্চার হয়েছে যে কেউ আর দূরের জমিগুলো চাষ করতে যায় না। আর গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য টনকপুরেও যায় না। বাঘটা নাকি তামালি থেকে বেশিদিন অনুপস্থিত থাকে না। আমাকে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য তারা

খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তবে বাঘটাকে এখানেই মারার সুযোগ সবচেয়ে বেশী ভাল।

আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কারণ বলতে গ্রামবাসীরা বুঝল। তারা আমার চারপাশে পঞ্চাশ বা তারও বেশি যে গ্রামবাসীরা বসেছিল, তাদের আশস্ত করে বললাম যে আমরা সুযোগ পেলেই আবার তামানিতে ফিরে আসবো। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি রওনা হলাম যেখানে বাঘের সর্বশেষ শিকারটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

গাঁয়ের থেকে যে পথটা বনের সেই সড়কটাতে এসে মিশেছে, আমি যে পূর্ব দিকে গেছি তা আমাদের লোকদের বোঝাবার জন্য আমি সেখানে একটা চিহ্ন দিয়ে গেছিলাম। এবার ফিরে এসে পশ্চিমদিকে যাচ্ছি বলে অন্য একটা চিহ্ন দিলাম। আমি সেই রকম চিহ্নের দাগ দিলাম তা পাহাড়ী অঞ্চলের সর্বত্র পরিচিত। প্রথম চিহ্নটি হল, রাস্তার ওপর একটা পাথর বা এক টুকরো কাঠির সাহায্যে একটি ডালকে এমন ভাবে রাখা যাতে অন্য শিকারী বোঝে ডালগুলির পাতা যেদিকে রয়েছে সেদিকেই তাকে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় চিহ্নটি হল দুটো ডালকে চাবিকাঠি চিহ্নের মতো করে রাস্তার ওপর ফেলে রাখা।

পশ্চিমের রাস্তাটার অধিকাংশই সমান্তরাল করা এবং বিরাট বিরাট ওক গাছের মধ্যে দিয়ে গেছে। ওক গাছগুলোর নীচে এক হাঁটু মত কাঠ গাছের ঝোপ। বনের চার পাশে অপূর্ব তুষারশোভিত পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য।

চার মাইল পশ্চিমে যাবার পর বনের সেই রাস্তাটি উত্তরে ঘুরেছে এবং উপত্যকার মাথার দিকে তা পার হয়েছে। এখন কার নদীর ওপর পাহাড়ে ওকগাছের গভীর বন, পাথরের ওপর পা দিয়ে নদী পার হয়ে, একটা চড়াই পেরিয়ে এক খোলা জায়গায় পৌছলাম, তারই উল্টোদিকে এক গ্রাম—সেই গ্রাম থেকে কয়েকটি মেয়ে নদীর দিকে আসছিল। তারা আমায় দেখতে পেয়ে 'সাহেব এসেছে' 'সাহেব-এসেছে', বলে মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, আমি গ্রামে পৌছবার আগেই

খবর ঘরে ঘরে রটে গেল, যখন গ্রামে পৌঁছলাম, গ্রামের সমস্ত নারী, পুরুষ, শিশুর বিরাট দল আমাকে ঘিরে ধরল।

গ্রামবাসীরা জানাল গ্রামটির নাম তল্লাকোট। চম্পরত থেকে পাটোয়ারী দুদিন আগে এখানে এসে পৌঁচেছে, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। পাটোয়ারী এখানে এসে পৌঁছোবার পরেই মানুষখেকো একটি মেয়েকে মেরেছে। পাটোয়ারীর কথায় এরা আমার আগমনের সংবাদ পেয়েছে, এবং এও জেনেছে যে আমি মানুষখেকোকে মারতে আসছি। আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনারের কথা মত তারা মড়িকে কোথাও সরায় নি।

আমি আসছি অনুমান করে সেদিন সকালেই তারা মড়ির খোঁজে একদল লোককে পাঠিয়েছে, যদি তার কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেখানে আমার জন্য একটা বাসা তৈরী করতে। গাঁয়ের মাতব্বর যখন আমাকে খবরটা দিচ্ছিল তখনই ত্রিশজন লোকের দলটি ফিরে এল। এই লোকজনেরা জানাল যে বাঘটা মেয়েটিকে যেখানে খেয়েছে সেখানে তারা কেবল মেয়েটার দাঁতগুলোর সন্ধান পেয়েছে। এমন কি তার জামা কাপড়ও পাওয়া যায় নি।

আমি যখন তাদের প্রশ্ন করলাম কোথায় বাঘটা মেয়েটিকে খেয়েছে? তখন দলের মধ্য থেকে একটি সতের বছরের ছেলে আমায় বলল যে, গাঁয়ের ওপাশে গেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে তার মাকে কোথায় মেরেছে। ছেলেটির পেছন পেছন আমরা সকলে, গ্রামের লোকজনও চললাম

দুটো পাহাড়ের মধ্যে যোগাযোগকারী পঞ্চাশ গজ লম্বাকার একটা পিঠের মতো জায়গায় এসে আমরা পৌঁছলাম। দুদিক থেকে দুটি বিরাট উপত্যকার মাথা এসে সেই জায়গায় মিশেছে। বাঁ দিকটি নেমে গেছে লাঠিয়া নদীর দিকে। ডানদিকেরটি খাড়াই ভাবে দশ কি পনের মাইল নেমে গেছে কালি নদীতে। ছেলেটি দেখালো উপত্যকার বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তর ধারটা ঘাসে ভরা ঘন আগাছাভরা জঙ্গল।

ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দিকটায় ৮০০ থেকে ১০০০ গজ দূরে এবং আমাদের থেকে ১০০০ ১৫০০ ফুট নিচে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেটি বলল, আরো কিছু মেয়ের সঙ্গে তার মা যখন ঘাস কাটছিল ঠিক ঐ জায়গায়, সে মারা পড়ে। তারপর নালার ওপর একটা ওক গাছ দেখাল, তার ডালগুলো বাঁদরে ভেঙেছে। সে বললে ঐ গাছের নীচে তারা তার মায়ের শেষ অংশটুকু ঝুলতে দেখেছে। বাঘটি সম্পর্কে সে বলল সে বা তার দলের লোকেরা কেউই দেখেনি বা কিছু শোনে নি। কিন্তু যখন তারা পাহাড় বেয়ে নাবছিল তখন তারা একটা ঘুরালের ডাক, এবং কিছুটা পরে একটা বাঁদরের ডাক শুনেছিল।

একটা ঘুরাল আর একটা বাঁদর। ঘুরাল অনেক সময় মানুষ দেখেও ডাকে কিন্তু বাঁদর তো তা করে না। তবে দুজনেই বাঘ দেখলে ডেকে থাকে। হয়ত প্রথমে ঘুরাল এবং পরে বাঁদরট বাঘটাকে চলে যেতে দেখেছে।

আমি যখন এই বিষয়ে চিন্তা করছিলাম আর মনে মনে আমার সামনে বিস্তৃত এলাকার একটি মানচিত্র খাড়া করছিলাম, তখন পাটোয়ারী খাওয়া দাওয়া সেরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। আমি বেনেদের কাছে যে দুটো কচি মোষ চেয়েছিলাম সে বিষয়ে তাকে বলতে সে বললে যে চম্পাবত থেকে মোষ দুটো নিয়েই রওনা হয়েছিল।

৪ঠা এপ্রিল তল্লাকোট থেকে দশমাইল দূরে যে গ্রামে মানুষখেকো একটা ছেলেকে মারে সেই গ্রামে তাদের রেখে এসেছে। সেই মৃত দেহটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট চম্পাবতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য সেই টনকপুরে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে আর ছেলেটির মৃতদেহ সংকার করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমার লোকজনেরা তখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই গাঁয়ের

মাতব্বরকে ছোট্ট নদীটার কাছে খোলা জায়গায় তাঁবু ফেলতে নির্দেশ দিলাম। তারপর ঠিক করলাম বাঘটা যেখানে মড়িকে খেয়েছে সেখানে একবার ঘুরে আসি। দেখব বাঘটা মাদী না মদ্দা। আর মাদী হলে বাচ্চারা সঙ্গে আছে কিনা ?

কুমায়ুনের এই আগন্তুক আমার খুব পরিচিত নয়। তাই মাতব্বরকে যখন কোন পথে যাব জিজ্ঞেস করলাম, তখন সেই ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, সাহেব আমি তোমার সঙ্গে যাঁবো এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

মানুষখেকোর বিপদের মধ্যে যারা থাকে তাদের সাহস দেখে এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির ওপর তাদের বিশ্বাস দেখে আমি খুবই অবাক হয়েগেছি।

এই যে ছেলেটি, যার নাম ডুঙ্গার সিং, সেও সাহস আর বিশ্বাস তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডুঙ্গার সিং বছরের পর বছর মানুষ-খেকোর, দৌরাত্ম্যের মধ্যে বাস করছে—আর কয়েক ঘণ্টা আগেই সে মায়ের মৃত দেহের শেষচিহ্ন দেখে এসেছে। এর পরও সে একা এবং নিরস্ত্র অবস্থায় একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যেতে চাইছে এবং এমন অঞ্চল সেটা, যেখানে সে ভালো করেই জানে তার মায়ের হত্যাকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইমাত্র সে ঐ স্থান থেকে ত্রিশজন লোকের সঙ্গে ঘুরে গেছে।

সেই নিচের মত জায়গাটা থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে নামার কোন পথ ছিল না। তাই ডুঙ্গার সিং আমাকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল এবং একটা সরু পথ ধরে এগোল। যখন ঝোপঝাড়ের পথ ধরে এগোচ্ছি তখন আমি ছেলেটিকে বললাম—আমি কানে ভাল শুনতে পাইনা। তাকে বলে ছিলাম সে যদি আমাকে কোন কিছু দেখাতে চায় তবে যেন সে থেমে পড়ে, আর সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দেয়। আর যদি কিছু বলতে চায় তবে যেন আমার কাছে এসে ডান কানে ফিসফিসিয়ে বলে।

প্রায় চারশ গজ এগোবার পর ডুঙ্গার সিং থেমে পড়ল এবং

পিছনের দিকে তাকাল। আমিও ফিরে সে দিকে তাকালাম। দেখলাম পাটোয়ারী সঙ্গে একটা লোককে নিয়ে আসছে। লোকটির হাতে একটা বন্দুক। সে আমাদের পিছনে পিছনে নেবে আসছে। কোন সংবাদ দিতে আসছে মনে করে দাঁড়ালাম।

কিন্তু না কোন সংবাদ নয়। সে তার বন্দুক বইবার লোকটিকে সঙ্গে করে আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। অনিচ্ছা সত্বেও রাজী হলাম। কারণ তাদের পায়ে ছিল ভারি ভারি জুতো—জঙ্গলে ঐ জুতো পড়লে খুবই বিরক্তি কর শব্দ হয়।

ঘন আগাছার মধ্যে দিয়ে আরো চারশ গজ এগিয়ে আমাদের দলটি—খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। এখানে পায়ে চলার সরু রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে বাঁ-দিকে গভীর নালার দিকে। অপরটি পাহাড় ঘুরে ডানদিকে। দুঙ্গার সিং এখানে দাঁড়াল আর গভীর নালার দিকে পথটা দেখিয়ে বলল। ঐ দিকেই বাঘটা তার মাকে খেয়েছে।

আমি চাইনা বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়ে বুটওলা লোকদের সঙ্গী করতে। তাই দুঙ্গার সিংকে বললাম যে, সে যেন ঐ লোক দুটিকে নিয়ে এই খালি জায়গায় থাকে। কথা শেষ করে আমি নালার দিকে এগোতে যাবো, দেখি দুঙ্গার সিং হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে তাকাল। আমিও ঐ দিকে মুখ ফেরালাম। দেখলাম যে উঁচু জায়গায় কিছুক্ষণ আগে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই খানে একটা ছোটখাটো ভীড় হয়ে গেছে।

দুঙ্গার সিং আমাদের ইসারায় হাত দিয়ে চুপ করতে বলে কি যেন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। শেষ কথাটি শোনার পর সে আমার কানে কানে বলল,—'আমার ভাই আপনাকে জানাতে বলছে যে, এখান থেকে কিছু নিচে—একটা পোড়ো ফসলের জমিতে রোদে পিঠ দিয়ে লাল মতো কি একটা শুয়ে আছে।

ঐ ফসলের জমিটায় আর চাষ করা হয় না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কিছু নিচে দেখলাম কি যেন একটা লাল মতো শুয়ে আছে, হয়তো কোন লাল রংয়ের শুকনো পাতা বাহারের গাছ বা কোন কাঁকর কিংবা কোনো কম বয়সী সম্বর। অবশ্য বাঘও হতে পারে। অবশ্য কোন সুযোগ হলে আমি কিছুতেই তা হাত ছাড়া হতে দেব না।

আমি তুঙ্গার সিংয়ের হাতে আমার রাইফেলটা দিয়ে পাটোয়ারী ও তার লোককে হাত ধরে কাছের একটা গাছের কাছে নিয়ে গেলাম। পাটোয়ারীর বন্দুক থেকে গুলি বের করে দিয়ে সেটাকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে লোক দুটিকে বললাম তারা যেন গাছের ওপর চড়ে বসে থাকে। আর যদি তারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় তবে যেন, আমি নেবে আসতে না বলা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকে। লোক দুটি মহাখুশীতে যত উঁচুতে পারল গাছের ওপরে উঠে বসল। ওদের ব্যবহার দেখে মনে হল গ্রাম থেকে আমাদের অনুসরণ করার সময় মানুষখেকো শিকারের বিষয়ে ওদের মধ্যে যে উৎসাহ ছিল, এখন তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

ডানদিকের জমিটায় বহুদিন চাষবাস বন্ধ আছে। এখন সেখানে ওট ঘাসের ভালো ফসল হয়েছে। এই জমিটা আমার দিকে প্রায় একশ গজ লম্বা এবং দশ ফুট চওড়া এবং জমিটা যেদিকে পাহাড়ের গায়ে মিশেছে সেদিকটা ত্রিশফুট চওড়া, পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত জমিটা সোজা গিয়ে আবার বাঁ দিকে বেঁকেছে।

তুঙ্গার সিং জানাল যে ওধার থেকে জমিটার ঐ লাল জিনিষটা ভালো দেখা যাবে। মাথা নিচু করে এবং জমির আলের ভেতরের দিকটা ধরে আমরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে জমির ওধারে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে আমরা শুয়ে পড়লাম এবং জমির ধারের ঘাস সরিয়ে নিচের দিকে তাকালাম।

আমাদের নিচে যে ছোট্ট উপত্যকাটা ছিল তার ওধারে ঘাসের জমি খাড়াই ভাবে নেবে গেছে। তারপর রয়েছে ওক গাছের চারার

ঘন বন। সেই বনের পর গভীর নালা। সেখানেই বাঘটা হুঙ্কার সিংয়ের মাকে খেয়েছে। ঘাসের ঢালু জমিটার পর একটা বিরাট পাথর। সেই পাথরের নিচের গাছগুলো উচ্চতায়ও প্রায় আশি থেকে একশ ফুট।

আমাদের সামনে সোজাসুজি আর একটা একশ গজ লম্বা ধাপ কাটা চাষের ঢালু জমি। সেই জমিটায় আমাদের দিকে সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছানো। বাকীটায় এক ধরনের সুগন্ধী আগাছা জন্মেছে। এগুলি চার-পাঁচ ফুট লম্বা হয়, পাতার নিচের দিকটা সাদা সূর্য্যের আলোটায় টোলেম সেই ঘাসের জমির ওপর দশফুট দূরে একটা বাঘ শুয়ে আছে।

কাছের বাঘটা আমাদের দিকে পিঠ করে পাহাড়ের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। আর দূরের তার পেটটা ছিল আমাদের দিকে, লেজটা পাহাড়ের দিকে কাছেরটাকে ভালোভাবেই গুলি করা যাবে, কিন্তু দূরের গুলির আওয়াজ শুনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়বে, আর যদি দূরেরটাকে প্রথমে গুলি করি তাহলে কাছেরটা হয় পাহাড়ের ওপর উঠে আসবে সেখানে আড়াল কম, নতুবা আমার দিকে এগিয়ে আসবে। ঠিক করলাম দূরেরটাকেই প্রথমে গুলি করব।

দূরত্ব ছিল ১২০ গজের মতো আর চড়াইয়ের দিকে করা হচ্ছে যা তাই হিমালয়ের নিচের দিকে গুলি করার সময় গুলি উঠে যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে না। জমির ধারের ঘাসের ওপর হাতটা রেখে এবং রাইফেলটা স্থির ভাবে ধরে, জানোয়ারটার হৃদপিণ্ড যেখানে হবে, সেখানটায় নিশানা করে আস্তে আস্তে ঘোড়া টিপলাম বাঘটা একটা পেশীও লাড়ালো না। কিন্তু অন্য বাঘটা বিদ্যুতের মত ছুটে জমির মাঝে পাচ ফুট চওড়া নালাটা এক লাফে পার হয়ে গেল।

এখানে দ্বিতীয় বাঘটা একটু দাঁড়াল। তারপর তার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর আমার গুলি খেয়ে সে লাফিয়ে উঠে নালাটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয়

গুলিটা মারার পরই আমি দেখলাম সুগন্ধী আগাছার ঝোপে একটু নড়াচড়া। একটা বিরাট জানোয়ার নালাটার ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেখানে দুটো বাঘ শুয়েছিল, তার এত কাছে যে ছুটে গেল সেটা আরেকটা বাঘ ছাড়া কিছুই নয়।

আমি জানোয়ারটাকে দেখতে যাচ্ছিলাম। কিছু আগাছা ভেদ করে সে যে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলাম, কারণ আগাছার পাতার নিচের দিকটা সাদা। জানোয়ারটি পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ঘাসের মধ্যেই ঘাসের ঢালু জমিটার ওপর একটা বাঘ বেরিয়ে এল। বাঘটা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল। আমি তাই বাঁক ধরে কাছে থেকে তার পাশে গুলি করলাম।

আমি গুলি করে বহু বাঘ মেরেছি। একটা গুলিতে এত নিশ্চিন্ত ভাবে আর কোনো বাঘের মৃত্যু দেখিনি। মুহূর্ত কয়েক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে তরপরই সামনের দিকে পথ রেখে সে পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। কয়েক ফুট নিচে আট দশ ইঞ্চি চওড়া একটা এক গাছের চারা ছিল। বাঘের পেটটা সেই চারা গাছে আটকে গেল। মাথাটা আর সামনের পাদুটি এক দিকে এবং লেজ ও পেছনের পাদুটি আরেক দিকে ঝুলে রইল।

রাইফেল কাঁধে রেখে এবং ঘোড়ায় আঙুল রেখে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু বাঘটা আর একটুও নড়াচড়া করল না। আমি দাঁড়িয়ে উঠে পাটোয়ারীকে ডাকলাম, সে এতক্ষণ গাছের ওপর থেকে সমস্ত ঘটনা গুলোই বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। ডুঙ্গার সিং আমার কাছেই শুয়ে ছিল। এখানে উত্তেজনায় নাচতে শুরু করল এবং যেভাবে একবার বাঘ দুটোর দিকে আর একবার সেই পিঠের মতো উঁচু জায়গায় সমবেত লোকজনদের দিকে চাইছিল। তাতে মনে হল, সে সেই রাতে এবং পরের অনেক রাতে ও কিভাবে এই কাহিনী শোনাবে তাই ভাবছে।

প্রথম বাঘটাকে দেখে ভেবেছিলাম মানুষখেকোটার একটা সাথী

হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় গুলির পর যখন তৃতীয় বাঘটা বেরিয়ে এলো তখন বুঝলাম বাঘিনী আর তার দুটো বাচ্চাই এখন আসামী। তিনটিই প্রায় সমান আকারের বলে মা আর বাচ্চা তা বোঝা যাচ্ছিল না। —এই তিনটির মধ্যে একটি যে তল্লাদেশের মানুষখেকো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ এই পাহাড়ে বাঘ খুব কম দেখা যায়। আর এই তিনটি বাঘকেই মারা হল জনবসতি এলাকায়। বাঘের বাচ্চা দুটো মায়ের অপরাধের জন্য মারা পড়ল। যতদিন বাচ্চা দুটা মায়ের দুধ খেয়েছে ততদিন তাদের মা মানুষের মাংস এনে দিলে তারা তাও যে খেয়েছে তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে তখন থেকেই তারা মানুষখেকো নয়। মানুষখেকো বাঘের বাচ্চা ছোটবেলায় মানুষের মাংস খেলেই মানুষখেকো হয়ে ওঠে না।

জমিটার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে রাইফেলটা হাঁটুর ওপর রেখে আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে সিগারেট বিলিয়ে দিলাম। তাদের বললাম, আমাদের ধূমপান হয়ে গেলে আমি এখন সেই বৃষ্টি জলের নালায় যে বাঘটা পড়েছে, তাকে খুঁজতে যাবো। তবে আমি নিঃসন্দেহ যে বাঘটা মৃত। তবু কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় আমি মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম।

মনে মনে ভাবছিলাম গত আট দশ বছর ধরে সে মানুষখেকোর দৌরাত্ম্য কয়েকশ বর্গমাইল ধরে আমি তল্লাদেশে পৌঁছবার এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনা চক্রে তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাচ্চা সহ মানুষখেকোকে গুলি করে ফেললাম। দেহের প্রতিটি কোষ উত্তেজনায় কাঁপছিল। শক্ত হাতে রাইফেল ধরে শিকারীর আনন্দ অনুভব করছিলাম। তার ওপর পায়ে হেঁটে বাঘ শিকারের বেলায় আহত জানোয়ারকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে রেহাই পাওয়াও কম হল না।

আমার লোকেরা কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যের জন্য আমার অদৃষ্টের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাদের মতে তারা নৈনিতালের মন্দিরের

পুরোহিতের কাছে পরামর্শ নেয়, যাতে এই অভিযান ব্যর্থ না হয়। তারা ভল্লাদেশে যাত্রা করার জন্য একটি শুভ দিন দেখে নিয়েছিল। আর আমাদের যাত্রা করার সময়ও কোন কিছু অশুভ চোখে পড়েনি। সুতরাং আমার সৌভাগ্যের জন্য এই সবই কিছুটা দায়ী।

আর যদি ব্যর্থ হতাম তাহলেও আমার সৌভাগ্য দায়ী হত না। কারণ যার মৃত্যুর সময় আসেনি রাইফেলের নিখুঁত নিশানা তাকে বিদ্ধ করবে না। যারা আমার সঙ্গে শিকারের সঙ্গী হয়েছে, আমি সব সময় তাদের সংস্কারের গুণের আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি।

আমি নিজেই শুক্রবার যখন কোথাও যেতে রাজী হই না, তখন কোনো পাহাড়ী মঙ্গল কি বুধবার উত্তর দিকে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিকে বা রবিবার কি শুক্রবার পশ্চিম দিকে যদি যাত্রা না করতে চায়, তাহলে আমি ব্যঙ্গ ঠাট্টা করি না। আর কোন বিপজ্জনক অভিযানের সময় যাত্রার শুভদিন দেখতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া খুব সামান্য ব্যাপার। কিন্তু আনন্দদায়ক ও সন্তুষ্ট চিত্ত সঙ্গী আব বিপদের ভয়ে ভীত সঙ্গীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

জমিটার ধারে বসে আমবা যখন আমাদের সিগারেট শেষ করছি, তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, চারাগাছে আটকে যাওয়া বাঘটা হঠাৎ নড়তে শুরু করেছে। শরীরের রক্তটা সামনের দিকে গড়িয়ে পরছিল বলেই লেজের দিকটার থেকে সেই দিকটা বেশী ভারী হয়ে উঠে ছিল। এবার সেটা মাথার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। চারাগাছ থেকে বেরিয়ে বাঘটা সেই ঘাসের ঢালু জমি বেয়ে পিছনে নামতে লাগল। তারপর সেই পাথরটায় ধীরে ধীরে পৌঁছল। যখন বাঘটা শূন্যে পড়ে যাচ্ছিল তখনই আমি রাইফেল তুলে শূন্যে গুলি করলাম।

সাফল্যের আনন্দে আমি গুলি চালালাম। আমি যেন দেখাতে চাইলাম, শূন্যে গড়িয়ে পড়া বাঘকেও আমি গুলি করতে পারি। কিন্তু বাঘটা মুহূর্তের মধ্যে গাছের আড়ালে চলে গেল তারপর ডালপালার হুড়মুড়ানির পর একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দ পাওয়া গেল।

এখন সমস্যা অন্যত্র। বাঘটাকে আমি শূন্তে গুলি করতে পেরেছি কিনা সেটাই প্রধান বিবেচ্য নয়। এখন যেটা বিপদের কারণ তা হল, বাঘটা ঢালু জমিতে থাকলে যা হত, তার থেকে গ্রামবাসীদের এখন আরও বেশী ভুগতে হবে।

সিগারেট শেষ হলে আমি সঙ্গীদের চুপচাপ বসে থাকতে বললাম। আব জলের নালায় যে বাঘটা পড়েছে, আমি সেটার খোঁজে চললাম। পাহাড়টা খবই খাড়া। মাত্র পঞ্চাশ ফুট মত পেরিয়েছি—এমন সময় তুঙ্গার সিং অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করে বলল—সাহেব। ঐ দেখ, ঐ বাঘটা চলে যাচ্ছে, আমার চিন্তা তখন আমার নীচের বাঘটাকে নিয়ে। মনে করলাম বাঘটা বোধ হয় আমায় তেড়ে আসছে। আমি গুলি করার জন্য রাইফেল তুললাম। আমাকে তৈরী হতে দেখে ছেলেটা ডেকে বলল, সাহেব ও দিকে নয়—ঐদিকে। সামনের দিকে মোকাবিলা করতে হবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তুঙ্গার সিং-এর দিকে ফিরলাম। দেখলাম সেই উপত্যকার নিচের ঢালু জমিটা যেখানে তুঙ্গার সিং-এর মামারা গেছে, সে সেদিকটায় আমায় দেখাচ্ছে।

প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাইনি, তারপর দেখলাম, বাঘটা কোণাকুণি একটা পাহাড়ের দিকে উঠে যাচ্ছে, খুবই খোঁড়াচ্ছে বাঘটা। একসঙ্গে তিন চার পা-র বেশী হাঁটতে পারছে না। ওর ডানদিকের কাঁধে একটা বড় রক্তের দাগ। দাগটি দেখে মনে হল, সে বাঘটা গাছের আড়ালে ঢুকে পড়ে দেখাল মনে হয়েছিল, এটা সেই বাঘটাই। কারণ বৃষ্টির জলের নালায় যে বাঘটি পড়েছে, তার গুলি লেগেছে বাঁ দিকের কাঁধে।

আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে পাহাড়ের গায়ে একটি পাইনের চারা ছিল। আমি প্রায় ৩০০গজের নিশানা করে বাঁ হাতে চারাগাছটাকে ধরে ডান হাতের কব্জির ওপর রাইফেলটা রেখে ধীরে সুস্থে গুলি চালাবার ব্যবস্থা করলাম। আমার থেকে বাঘটা অনেক উঁচুতে।

বাঘটা স্থির হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর গুলি চালালাম। দূরত্বটা ছিল প্রায় ৪০০ গজের মত।

কিন্তু শুধু ধুলো উড়তেই দেখলাম, আর বাঘটা একটু সামনের দিকে লাফ দিল, তারপরেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। আমি নিশানাটা একটু বেশী করে নিয়েছিলাম, আর বুলেটটা একটু উঠে গিয়েছিল। এখন বাঘটাকে মারার জন্য একটি গুলির দরকার। বাঘটা যখন ওপর থেকে পড়ছিল, তখন আমি বোকার মত একটা গুলি খরচ করে ফেলেছি।

আমি রাইফেলটা নিয়ে দেখতে লাগলাম—বাঘটা আস্তে আস্তে খুব কষ্ট করে পাহাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক চেয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিমালয় অঞ্চলে যারা শিকার করেন নি তারা হয়তো আমার বুদ্ধির বিষয়ে প্রশ্ন তুলবেন—কেন আমি ২৭৫ রাইফেলের মতো হাল্কা একটা অস্ত্র ব্যবহার করলাম। আর কেনই বা শিকারে মাত্র পাঁচটি গুলি নিয়ে বেরিয়েছিলাম, এ বিষয়ে আমার মতামত হল :

(১) এই রাইফেলটি আমার অতি পরিচিত বিশ্বস্ত বন্ধু। বিশ বছর ধরে এটি আমি ব্যবহার করছি।

(২) এটি বহন করার পক্ষে বেশ হাল্কা। সঠিক নিশানা করা যায় আর ৩০০ গজ পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করা যায়।

(৩) কর্ণেল আমাকে বার বার নিষেধ করেছিলেন ভারী রাইফেল ব্যবহার করবে না। আর হাল্কা রাইফেল দিয়ে প্রয়োজনের বেশী গুলি যেন না করা হয়।

(৪) আর পাঁচটি গুলি নেওয়ার কারণ হল, ঐ দিন সকালে আমি বাঘ মারতে বেরোই নি। সর্বশেষ মানুষটি যেখানে মারা গেছে সেই গ্রামটি খুঁজে বার করার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। আর কচি মোষগুলোকে যাতে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি তার চেষ্টায়ও ছিলাম।

কিন্তু আমি যদি একটি মোক্ষম গুলি নষ্ট না করতাম তবে এই হাল্কা রাইফেল আর পাঁচটি গুলিতেই কাজ হতো।

আমার লোকজনেরাও সময় মতো এসে অন্য লোকজনদের সঙ্গে সেই উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারা জানত আমার কাছে মাত্র পাঁচটি গুলিই আছে। তাই যখন দেখল আমার পঞ্চম গুলির পর আহত বাঘটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন, মাধো সিং আরো গুলি নিয়ে দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নেবে এলো।

সবুজ ঘাসের ওপর আর বৃষ্টির জলের নালায় যে দুটো বাঘ ছিল তাদের মৃত অবস্থাটা পেলাম। দুটো বাঘই দেখলাম পূর্ণ বয়স্ক। আর যেটি আহত অবস্থায় চলে গেল সেটি তাদের মা নিশ্চয়ই—তল্লা দেশের মানুষখেকো।

মাঠো সিং আর দুঙ্গার সিংকে বললাম। আহত মৃত বাঘদুটোকে গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। আমি আহত বাঘিনীর পিছু সন্ধানে চললাম। ভাঙা ডালপালা সামান্য রক্তের দাগ অনুসরণ করে শেষ গুলিটা যেখানে করেছিলাম সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। বুলেটটায় দেখলাম বাঘের পিঠের কিছুটা লোম ছাড়িয়ে নিয়েছে মাত্র। অর্থাৎ তার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর গুলির শব্দে সে লাফিয়ে ছিল সেখানে একটু বেশী টাটকা রক্ত দেখতে পেলাম।

রক্তের দাগ দেখে অনুসরণ করতে লাগলাম। কিন্তু শক্ত ঘাসের মধ্যে আমি বাঘিনীর পায়ের দাগ হারিয়ে ফেললাম। কাছেই ছিল একটা ঘন আগাছার জঙ্গল। প্রায় একশগজ চওড়া। জঙ্গলটা পাহাড়ের দিকে অনেকটা ছড়িয়ে ছিল। আমার সন্দেহ হল বাঘিনী ঐ দিকেই আছে। কিন্তু রাত হয়ে আসছে। আর সঠিক গুলি চালাবার মত যথেষ্ট আলো না থাকায় আমি গ্রামে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করলাম এবং সেই জঙ্গলটা খোঁজার কাজ পরদিন সকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখলাম।

পরের দিন সকালে উঠেই আমি আগে বাঘ দুটোর ছাল

ছাড়ালাম। তারপর নৈনিতাল থেকে আসা ছয় ইঞ্চি পেরেকে ছাল-গুলো শুকোতে দিলাম। আমি যখন এসব কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমার তাঁবুর চার পাশের খোলা জায়গায়—যে গাছগুলো ছিল সেখান থেকে প্রায় একশ শকুন এসে নাবল। মানুষখেকোর শিকারের কাপড় গুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। কারণ সেই বাঘের বাচ্চাগুলোই রক্তে মাখা কাপড় চোপড় গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিলে ফেলেছিল।

আমাকে ঘিরে গ্রামের লোকেরা বসেছিল। আমি তাদের বললাম যে, জঙ্গলে বাঘিনীটা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে আমি সেখানটা খুঁজে বার করব। এ কাজের জন্য কিছু গাড়োয়ালাদের সাহায্যের প্রয়োজন। তারা খুসী হয়ে ঐ কাজ করতে রাজী হল।

প্রায় দুপুর নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা ঐ কাজে বেরুলাম। আমার লোকজনেরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেই উঁচু জায়গাটা পার হয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে এসে আশ্রয় স্থলের পিছনে হাজির হল। আর আমি আগের দিন বিকেলে যে সরু পথ ধরে বাঘটাকে অনুসরণ করেছিলাম, সেই পথ ধরে এগোলাম। সেই আগাছার জঙ্গলে একটা বড় পাথরের চাঁই (ঠিক যেন বাড়ি) পড়ে ছিল। আমি সেই চাঁইটার ওপর উঠে আমার লোকদের টুপি নেড়ে খেদানো শুরু করার নিশানা দিলাম।

বাঘের হাতে যাতে কাউকে না পড়তে হয়—সেজন্য আমি তাদের বলেছিলাম পাহাড়ের ওপর থেকে চীৎকার করে হাত তালি দিতে আর পাথর গড়িয়ে ফেলতে। ঝোপ থেকে শুধুমাত্র একটা কাকর আর কিছু কালো পাখী ছাড়া আর কিছুই বেরিয়ে এলো না। পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে ঝোপের যখন সবটাই প্রায় এলোকয়ে খোঁজা হয়ে গেল তখন টুপী নাড়িয়ে তাদের খেদানো বন্ধ করে তাদের গ্রামে ফিরে যেতে বললাম।

লোকজনেরা গ্রামে ফিরে যেতে আমি সেই জঙ্গলটা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু বাঘিনীর চিহ্নমাত্র ও পেলাম না। আগের দিন

বিকেলে তাকে দেখে বুঝেছিলাম সে ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। রক্ত দেখে বুঝেছিলাম আঘাতটা খুব গভীরে হয়নি। কিন্তু বাঘটা গুলি খেয়ে মড়ার মত পড়েছিল কেন? আর কেনইবা সে চারা গাছের ওপর দশ-পনের মিনিট একেবার মরার মত ঝুলেছিল। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। পরে আমি দেখেছিলাম নিকেলের নরম মাথাওলা গুলিটা তার ডান কাঁধের জোড়ার মধ্যে শক্ত ভাবে আটকানো রয়েছে। দ্রুতগামী বুলেট হাড়ের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেয়ে শকটা জানোয়ারের পক্ষে খুবই বেদনায় হয়।

কিন্তু বাঘ জীবনীশক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় বেশী ভারী জানোয়ার। কিন্তু কেন যে হাত বুলেট এই রকম একটি জীবকে একেবারে ধরাশায়ী করে দশ-পনের মিনিট অজ্ঞান করে রেখেছিল তা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

পাহাড়ের ওপর উঠে এসে আমি দাঁড়ালাম। চারপাশটা ভালো করে দেখতে লাগলাম। মনে হল পাহাড়টা বহুদূর বিস্তৃত এবং উপত্যকাকে দুভাগে ভাগ করে রেখেছে। বাঁ দিকের উপত্যকার গোড়ার দিকেই বাঘটি মেয়েটিকে মেরেছে। উপত্যকাটির ডান-ধারটায় যা আগাছা ও আগাছার জঙ্গল আর বাঁদিকে খাড়াই ঢালু জমি একটা পাথরের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে। নিশ্চিন্তে একটু সিগারেট খাবো বলে পাহাড়ের উপর একটা পাথরের মাথায় বসলাম—ধূমপান করতে করতে বার বার ভেবে পাহাড়ে এলাম।

(১) বাঘিনীটা সে সময় আমার গুলি খেয়ে পড়ে গেল, তখন থেকে শুরু করে গাছের মধ্য দিয়ে পড়ে যাওয়ার পথে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

(২) গাছের উপর পড়ার ফলে তার আঘাত তেমন ছিল না। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু সে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

(৩) এই অবস্থায় সে যেদিকে পারছিল এগোচ্ছিল। পাহাড়

বেয়ে উঠছিল বটে কিন্তু কোথায় যাচ্ছিল তার কোন ঠিকানা ছিল না।

এখন আমার প্রশ্ন বাঘিনীটা কতদূর এবং কোথায় যেতে পারে? আহত হয়ে তার পক্ষে পাহাড় বেয়ে ওঠা বা নামা খুবই কষ্টকর। সে নিশ্চয়ই কোন একটা আশ্রয় খুঁজে নেবে। তার আঘাতটা সামলে নেবে বলে আর কোন আশ্রয়স্থল পেতে হলে বাঘিনীকে পাহাড় পার হতে হবে। সুতরাং দেখা দরকার সে তাই করেছে কিনা?

পাহাড়ের চূড়া যদি ছুরির মত ধারালো না হত তবে, কোন জানোয়ার তার ওপর দিয়ে চলে গেলেও তার পা অনুসরণ করা অসম্ভব। পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার মত একটা পথ রয়েছে। এই পথ দিয়ে সমস্ত জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করে। পথটা বাঁ দিকের ঘাসের ঢালু জমিতে গেছে, ডান দিকে খাড়া একটা পাথরের চাতাল মত নেবে গেছে, তার পরই নিচে নালা পর্যন্ত গাছ নেমে গেছে।

ধূমপান শেষ করে আমি সেই পথে রওনা হলাম। পথের ওপরই পেলাম ঘুরাল, সাবম্ভি, সম্বর, বাঁদর, সজারু এবং মদ্দা চিতার পায়ের দাগ। যতই এগোতে লাগলাম ততই হতাশা আমাকে গ্রাস করতে লাগল। কারণ আমি জানতাম যদি এই পথে বাঘিনীর সন্ধান না পাই তবে, তবে আর কখনো তার দেখা পাবার আশা নেই, এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রায় এক মাইল যাওয়ার পর আমি এক বাঘিনীর পায়ের দাগ ও শুকনো রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। মাঝে দুটো ঘুরাল আমাকে দেখে ঢালু ঘাসের জমির ওপর দিয়ে ছুটে পালাল।

বাঘিনীর দাগটা দেখে মনে হল গতকাল হতবুদ্ধি অবস্থায় সে ঘাসের ঢালু জমি বেয়ে নেবে গেছে। তারপর সে সুস্থ হলে পাহাড় ঘুরে এই পথের ওপর এসেছে। আমি আধ মাইল পর্যন্ত তার পায়ের দাগ ধরে এগোলাম।

ডান দিকের খাড়া পাহাড় বেয়ে বাঘিনীটা নামার চেষ্টা করছে,

সম্ভবতঃ সে নালা পার হয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিতে চায়। আমার মনে হল বাঘিনীটা তার আহত পায়ের জন্যই হোক বা হত-বুদ্ধির জন্যই হোক নালার মধ্যে যাতে পড়ে না যায়, উঠে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বৃথা। আমি পাহাড়ী ছাগলের মত দৃঢ় পায়ে পাহাড় উঠতে পারি—কিন্তু নিচে নামা অত্যন্ত কষ্টকর আমার পক্ষে। তাই আমি আরো কয়েক শ গজ ঐ পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের একটা ফাটল পেলাম। ঐ ফাটল বেয়ে আমি নালাটির নিচে গেলাম।

তিরিশ ফুট চওড়া নালাটি ধরে আমি যখন ওপারের দিকে উঠলাম, দেখতে পেলাম, সেই পাথরের চাতালটা নালা থেকে ষাট বা আশি ফুট ওপরে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কোন জানোয়ার ওখান থেকে পড়লে তার মৃত্যু অবধারিত। বাঘিনীটা যেখানে পড়েছে সেই জায়গাটার কাছে এগিয়ে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আমি দেখতে পেলাম একটা বিরাট জানোয়ারের পেটের সাদা দিকটা।

কিন্তু আমার আনন্দটা দীর্ঘস্থায়ী হল না, ওটা বাঘিনীটা নয় একটা সারাও। ওটা নিশ্চয়ই ওখানে শুয়েছিল তারপর বাঘিনীর গন্ধ পেয়ে ও শব্দ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়েছে। ফলে একটা পাথরের ওপর পড়ে ওর ঘাড়টা ভেঙ্গে গেছে। সারাওর কাছেই এক জায়গায় বালিগুলো আলগা হয়ে গিয়েছিল। বাঘিনীটা ঐ জায়গা-টাতেই লাফিয়ে পড়েছিল; ফলে ওর কাঁধের চোটটাই বেড়ে গেছে।

তারপরও সে মৃত সারাওটাকে ভ্রূক্ষেপ না করে নালাটা পার হয়ে গেছে। ফেলে গেছে খুব ভাল রক্তের চিহ্ন। এবার আমি বুঝতে পারলাম তাকে সামনের প্রথম আশ্রয়স্থলটাতেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমার অবস্থা সত্যিই খারাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড কালো মেঘ করে ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। সেই বৃষ্টির ফলে রক্তের সমস্ত দাগ মুছে ধুয়ে গেল। তখন বিকেলও শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে কঠিন পথ ধরেই ফিরতে হইবে; তাই বাঘিনী খোঁজা আর হল না। আমি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সমস্ত শিকারেই ভাগ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বুঝতে-পারলাম বাঘিনীটার ভাগ্য এখন পর্যন্ত সুপ্রসন্ন যাচ্ছে। কারণ সে তার বাচ্চাদের নিয়ে ঘন ঝোপের আড়ালে আমাদের দৃষ্টিরবাইরে শুয়ে ছিল। খোলা জায়গায় থাকলে তাকে চিনতে পারা সহজ হত। তারপর আমার একটা গুলি তার শরীরের মধ্যে ঢুকেও হাড়ে আটকে যাওয়ায় আঘাতটা মারাত্মক হতে পারেনি।

পরে বাঘিনীটা দুবার পাথরের ওপর থেকে পড়ে গেছে। অথচ মৃত্যু যেখানে অবধারিত সেখানে সে একবার ডালপালা থাকার জন্য বেঁচেছে আর একবার নরম বালির জন্য বেঁচেছে। শেষবার আমি পৌঁছোনো সত্ত্বেও বাঘিনীটা তাকে বাচিয়েছে। অবশ্য আমার ভাগ্যও নেহাৎ মন্দ নয়। কারণ আমিও জানতে পেরেছি বাঘিনীটা কোথায় থাকতে পারে আর সে যদি পাহাড় বেয়ে নেমে যেত তবে তার হদিশ পেতাম না।

পরদিন সকালে আমি দুজন গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে নালায় ফিরে গেলাম। কুমায়ুনে সারাওর মাংস খুব জনপ্রিয়। আমার লোকজনেরা খুব খুশি হলো ঐ ঘাড় ভাঙা সারাওটি পেয়ে। আমার লোকজনেরা সবাই সারাওর ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত। তখন আমি আগের দিনের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত এগোলাম। দেখলাম ডানদিকের দুটি গভীর জঙ্গল পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

পাহাড়টা যা খাড়া তা বাঘের পক্ষে বেয়ে ওঠা অসম্ভব। বর্ষায় নালাটা ঝরনায় পরিণত হয়েছে। আমি ফিরে এসে লোকজনদের ডাকলাম। তারা মূল নালা থেকে পঞ্চাশগজ দূরে একটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে আমার জন্য এক কেটলি গরম জল করতে ব্যস্ত ছিল। তারপর আমি দ্বিতীয় নালাটা পরীক্ষা করার জন্য এগোলাম। দেখলাম পাহাড় বেয়ে একটা জন্তু জানোয়ারের চলার পথ নেমে এসেছে। সেই পথের ওপর আমি বাঘিনীর পায়ের দাগ পেলাম। বৃষ্টির জন্য কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার সামনেই একটা বিরাট পাথর ছিল। ঐ

পাথরটার কাছে এগোতেই দেখি কয়েকটি ছাপের দাগ আর কিছুটা শুকনো রক্তের দাগ। নালাটার মধ্যে পড়ে যাবার পর সম্ভবতঃ চল্লিশ ঘটা আগে তা ঘটেছে। বাঘিনীটা এই খানে এসেছিল এবং আমি যখন আমার লোকজনকে কেটলি করে গরম জল করার জন্য ডেকে বলেছিলাম তখন সেই শব্দ শুনে সরে গেছে।

আহত বাঘের কাছে পায়ে হেঁটে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। অবশ্য প্রত্যেক বাঘের মেজাজ এক রকম হয় না। কতদিন আহত বাঘ বিপদ জনক অবস্থায় থাকে তার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। একবার একটা বাঘ পালাতে গিয়ে পেছনের থাবার একইঞ্চি লম্বা কেটে যায়। এই আঘাত পাবার পর পাঁচ মিনিট সে প্রায় একশগজ দূর থেকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে। আরেকটা বাঘকে দেখেছিলাম সে কয়েক ঘণ্টা ধরে চোয়ালের কষ্ট পাচ্ছিল। তার কয়েক ফুটের মধ্যে গেলেও সে কিছু বলে না।

কিন্তু আহত মানুষখেকোর বেলায় সমস্যাটা একটু অন্য রকমের। আঘাতটা যদি বাইরের হয় তবে তার খাদ্যের প্রেরণা থাকবে। আর তখন সে কাছে গেলেই আক্রমণ করবে প্রবল গতিতে। বাঘেরা সাধারণতঃ আহত না হলে বা মানুষখেকো না হলে, খুব ভালো মেজাজের হয়। তাই যদি না হত তবে যেসব জঙ্গলে বাঘ আছে—সে সব স্থানে হাজার হাজার মানুষের কাজ করা সম্ভব হত না। আর আমার মতো লোকের পক্ষে বছরের পর বছর হেঁটে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হতনা।

মাঝে মাঝে কোন বাঘ তার বাচ্চার খুব কাছাকাছি আনা বা যে মড়িটা পাহারা দিচ্ছে, তার কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হয় না। সে তার ঘড়ঘড়ে ডাকের মধ্যে দিয়েই এই আপত্তি প্রকাশ করে। আর যদি তা কার্যকর না হয় তবে সে দৌড়ে এসে প্রচণ্ড হুঙ্কার দেয়। যদি এই হুঙ্কার তার গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে আক্রমণ করে। বাঘেরা যে কত ভাল মেজাজী হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার অভিজ্ঞতায় আছে।

একদিন আমাদের কালাধুঙ্গির বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে বোয়ার নদীতে আমি আর আমার বোন ম্যাগি বিকেলে মাছ ধরছিলাম। আমি ছোট ছোট দুটো মহাশীর মাছ ধরেছি এবং একটা পাথরের ওপরে বসে ধূমপান করছি, এমন সময় সেখানে হাতির পিঠে চড়ে এলো জিওফ হপকন্স। ইনিই পরে উত্তর প্রদেশের বনরক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। তার বাড়ীতে সেদিন কয়েকজনের আসার কথা। মাংস কম পড়েছে বলে সে একটা কাকর বা বন-ময়ুরী মারতে বেরিয়েছে -২৪০ রুল রাইফেল সঙ্গে নিয়ে।

আমাদের যা দরকার সেই পরিমাণ মাছ আমার ধরা হয়ে গেছে, কাজেই আমরা জিওফের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম তার প্রয়োজন মত শিকার খুঁজে বার করে দেবার জন্য হাতীতে চড়ে আমরা নদী পার হলাম।

মাহুতকে একটা জঙ্গলের দিকে পাঠালাম। সেখানে কাকর আর ময়ূরী পাওয়া যাবে। আমরা যখন ছোট ছোট ঘাস আর কুল গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ চোখে পড়ল একটা চিতল হরিণ, গাছের নীচে মরে পড়ে আছে।

হাতি থামিয়ে আমি মাটিতে নেমে পড়লাম। হরিণটা কিসে মরল দেখতে গেলাম। মনে হল সেটা মাদী আর বয়স্ক। তার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন না দেখে মনে করলাম হয়তো সেটাকে সাপে কামড়েছে। কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ওটা মারা পড়েছে। আমি পেছন ফিরে যেই হাতিতে উঠতে যাবো অমনি দেখলাম একটা পাতার ওপর, টাটকা রক্তের দাগ। দাগটা দেখে মনে হল যে জানোয়ারটার থেকে এই রক্ত এখানে এসেছে সে কিছুক্ষণ আগে ও এই মরা চিতলটার কাছে ছিল। কিছুদূরে আর একফোঁটা রক্ত। এই টাটকা রক্তের দাগ দেখে অবাক হয়ে দেখতে গেলাম কোথা থেকে এই রক্তটা আসছে।

হাতিটাকে ইসারায় আমাকে অনুসরণ করতে বললাম। ষাট সত্তর গজ যাবার পর পাঁচ ফুট উঁচু এক ঘন ঝোপের সামনে এসে পড়লাম।

রক্তের দাগ যেখানে শেষ হয়েছে—সেখানে এসে আমি দুহাত দিয়ে ঝোপ ফাঁক করলাম। হাতির পিঠে আমি লাঠিটা ফেলে এসেছি।

আমার হাতের নিচেই একটা চিতল হরিণ পড়ে আছে। তার শিং দুটো যেন সামনে মোড়া। একটা বাঘ হরিণটাকে খাচ্ছিল। আমি সেই ঝোপটাকে সরালাম, বাঘটা এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, যার অর্থ হল, সে বেশ বিরক্ত হয়েছে আমার উপস্থিতিতে। আমি এখন মানে মানে সরে পড়লে সে বাঁচে।

আমিও বাঘটাকে দেখে অত্যন্ত হকচকিয়ে গেছি। আমার হৃদপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাঘটা কয়েক মুহূর্ত সোজা আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে সুন্দর ভঙ্গীতে তার পেছনের দিকের ঝোপে লাফ মারল। অথচ সে ইচ্ছে করলে আমার মাথায় একটা থাবার চাটি মারতে পারত।

আমরা আসার একটু আগেই বাঘটা সেই কুলগাছের জঙ্গলে চিতল-টিকে মেরেছে আর আড়ালে খাবার সময় রক্তের চিহ্ন রেখে গেছে। হাতির পিঠে যে তিনজন ছিল তারা দেখতে পেয়েছে বাঘটাকে লাফাতে। মাহুত তাই দেখে আমাকে হুঁসিয়ার করার জন্য চেঁচাল —সাহেব, খুব হুঁসিয়ার, শের হ্যায়।

আমার লোকজনেরা এবং তারা ফিরে গিয়ে সারাগুন ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি সেই অবসরে এক কাপ গরম চা খেয়ে নিলাম। যে জায়গায় চাপ রক্ত দেখে ছিলাম, সেখানে আবার ফিরে এলাম। আমার সঙ্গের ছজন লোক অনেকবারই আমার সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছে সুতরাং শিকার সম্বন্ধে তাদের একটু অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে।

তারা সেই রক্ত দেখে মতামত প্রকাশ করে বলল যে বাঘিনীর আঘাতটা খুব গুরুতর। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেটা মারা যাবে। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারলাম না। কারণ

আমার মতে আঘাতটা খুব বেশী নয় এবং যতসময় যাবে তত তাড়াতাড়ি সে ভাল হয়ে উঠবে। ফলে তাকে পরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একটা সরু গভীর নালা একটি পাহাড় বরাবর চলে গেছে, তার ডানদিকের জঙ্গলটা নালার দিকে ঢালু এবং সেই জমিটার ওপর ঘন গাছের জঙ্গল। নালার জমিটার ওপর রিঙ্গন আর নানান রকম আগাছার ঘোর জঙ্গল।

আমি ঠিক করেছিলাম নালার ডানদিকে আমার লোকজনদের পাঠিয়ে সবথেকে উঁচু গাছটায় চড়তে বলব যাতে তারা আমার গতি-বিধির ওপর নজর রাখতে পারে। আর দরকার হলে তারা আমার নজর আনার জন্য শিস দেবে। পাহাড়ীরা খুব ভাল শিষ দিতে পারে। তাদের বাঘিনীর কাছ থেকে বিপদ হবার ভয় নেই। কারণ তাদের দিকে কোন ঝোপ বা জঙ্গল নেই। সেই বড় পাথরের কাছে চাপা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে সোজা যাচ্ছে বাঘিনীটা। নালার বাঁ দিক ধরে উঠে গেছে। আমিও এই পাহাড় ধরে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

জঙ্গলে শিকারের কাহিনী বই পড়ে শেখা যায় না। সেই রকম অনুসরণের ক্ষেত্রেও তাই আমি যেভাবে অনুসরণ শুরু করলাম, সেটি আমার শিকার পদ্ধতির সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় বলে মনে হয়।

সময় সময় এই কাজটা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ বলে মনে হয়। অনুসরণের ব্যাপারে সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হল চিহ্ন দেখে অনুসরণ করা অপরটি হল চিহ্ন না দেখেই অনুসরণ করা কিন্তু সেখানে রক্তের কোন চিহ্ন নেই। এই পদ্ধতি ছাড়াও আমি অনেক সময় ঘা-এর মাছি বা মাংসভুক পাখীকে অনুসরণ করে আহত জানোয়ারের সন্ধান পেয়েছি। রক্তের দাগ অনুসরণ করে খোঁজ করা খুবই সুনিশ্চিত ব্যাপার। কিন্তু আহত জানোয়ারের সবসময় রক্তপাত নাও হতে পারে।

তখন তাদের পায়ের দাগ বা গাছপালার অবস্থা দেখে অনুসরণ

করতে হয়। সাধারণতঃ মাটির অবস্থার ওপর অনুসরণের কাজ কঠিন কি সহজ তা নির্ভর করে।

আমার ডাকের শব্দ শুনে বাঘিনীটা সেই যে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তখনই তার রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেছে। আর সে চলার জন্য একটু একটু সে রক্তের দাগ রেখে গেছে—তার বিঝিয়ে ওঠা ঘা থেকে, তা দেখে অনুসরণ করাও খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

তাই জানোয়ারটার পায়ের দাগ ধরে এবং গাছপালার অবস্থা দেখেই আমাকে অনুসরণ করতে হচ্ছিল। আমি যে মাটির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তাতে ঐভাবে অনুসরণ করা কঠিন হচ্ছিল না বটে, কিন্তু অনেক বেশী সময় লাগছিল। আর এরজন্য বাঘিনীরও সুবিধে হচ্ছিল। কারণ এতে তার ঘা-টাও শুকোবে আর তাকে পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। গত কয়েক দিনের একটানা প্রচণ্ড পরিশ্রম আমাকে খুবই ক্লান্ত করে ফেলেছিল।

আমি প্রথম একশ গজ এক হাঁটু উঁচু পাতা-বাহার গাছের ঝোপ দিয়ে অনুসরণ করে চললাম। এখানে অনুসরণে কোন ভয় নেই। কারণ বাঘ প্রায় সরলরেখাতেই গমন করেছে। এর পর শুরু হয়েছে ঘন রিঙ্গল গাছের ঝোপ। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল বাঘিনীটা নিশ্চয়ই এই গাছের মধ্যেই আছে। কিন্তু সে যদি আক্রমণ না করে তবে তাকে গুলি করা যাবে না। কারণ এই রিঙ্গল বনের গাছের জড়াজড়ি করা ঝোপের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে অনুসরণ করা অসম্ভব।

আমি ঠিক ঝোপের মাঝখানটায় গেছি এমন সময় একটি কাকর ডেকে উঠল। বুঝতে পারলাম বাঘিনী তাহলে চলতে শুরু করেছে। কাকরটিকে দেখলাম একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমানে ডেকে চলেছে। তাতে অনুমান করলাম বাঘিনীটা পাহাড় বেয়ে না উঠে বাঁ দিকের খোলা জায়গার দিকেই গেছে।

আমি ফিরে এসে আরো বাঁদিক ঘুরে গেলাম। কিন্তু সেদিকে কোন খোলা জায়গা দেখলাম না। সেই হরিণটাকেও দেখলাম না।

কাকরটা একটু পরেই থেমে গেল কিন্তু কতকগুলো কালোপাখী ডাকতে শুরু করে দিল। বাঘিনীটা তাহলে এখনও এগিয়ে চলেছে, কিন্তু কোথা থেকে যে শব্দটা আসছিল সেটা আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না।

আমি এতদিন গর্ববোধ করতাম, জঙ্গলের এক অপূর্ব গুণ হল শব্দ কোথা থেকে আসছে বা কতদূর থেকে আসছে তা স্থির করা। কিন্তু এই প্রথম আমার মনে হল আমার সেই দুর্ঘটনার জন্য আমি আমার সেই গুণটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

আমি বহু বছর ব্যয় করেছি জঙ্গলের ভাষা শেখার এবং নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু তাদের সেই ডাক শোনার আনন্দের জন্য আমি আর কানের ওপর নির্ভর করতে পারছি না। বহু বছর আগে দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্বেকার বন্দুকের গুলি বড় এক দুর্ঘটনার ফলে এই কানের পর্দাটাও আহত হয়েছে। বাকী কানটাও ভাল নেই। ফলে আমি বেশ অসুবিধেতে পড়লাম। তবু এই অবস্থায় ও আমি কোন হিংস্র জানোয়ারকেও আমার ওপরে বেশী সুবিধে নিতে দেবনা।

আমি আবার পাতা বাহারের ঝোপে ফিরে গিয়ে শুধু চোখের ওপর নির্ভর করে বাঘিনীটাকে খুঁজতে লাগলাম। এই জঙ্গলে প্রচুর শিকার আছে।

সম্বর, কাকর, বানর, নানাজাতীয় পাখী। বাঘটাকে সে বার-বার বিরক্ত করছে তা বুঝতে পারলাম এবার আমি শব্দের ওপর নজর না দিয়ে বাঘিনীকে পায়ে পায়ে লক্ষ্য করে অনুসরণ করতে লাগলাম। কখনও সে পাহাড়ে সোজা এগিয়েছে, কখনও বা ঝোপের আড়ালে এঁকে বেঁকে গেছে। পাহাড়টার মাথায় প্রায় একশগজ জুড়ে শক্ত ঘাস রয়েছে এখান থেকে একটা সরু পথ পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। ছোট শক্ত ঘাসের জমিতে আমি বাঘের পায়ের চিহ্ন হারিয়ে ফেললাম।

বাঘনীটা বুঝতে পেরেছিল যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই

সে যতদূর সম্ভব নিজেকে আড়াল করে এগোচ্ছিল। আমি প্রথমে ডান দিকের আগাছার জঙ্গলে এগোব ঠিক করলাম। যখন জঙ্গলটার দু-এক গজের মধ্যে এসে পড়েছি ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা ভারী জানোয়ারের চাপে যেন একটা শুকনো ডাল ভেঙে যাবার শব্দ শুনলাম।

আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলাম শব্দটা বাঁ দিকের ঝোপ থেকে আসছে। কাজেই আমি ফিরে শব্দটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। সেদিন আমি দ্বিতীয় ভুল করলাম। চা করার জন্য লোকজনকে ডেকে চীৎকার করে বলেছিলাম। কারণ পরে আমার লোকজনেরা আমায় বলেছিল যে আমি নাকি বাঘিনীর ঠিক পেছনেই খোলা জমিটা পার হয়েছিলাম এবং আমি যখন ফিরে চলে এলাম তখন ঝোপের কয়েক গজ ভেতরে একটু খোলা জায়গায় সে শুয়েছিল। হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

বাঁদিকের ঝোপে বাঘিনীর কোন চিহ্ন না পেয়ে আমি আবার খোলা জায়গায় চলে এলাম। আমার লোকেরা শিষ দিতে আমার লোকেরা যেদিকে আছে সেদিকে তাকালাম। আর ডানদিকের একটা গাছের উঁচু ডালে তারা রয়েছে। আমি তাদের হাত নেড়ে জানালাম যে তাদের আমি দেখতে পেয়েছি। তারাও সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে হাত নেড়ে দেখিয়ে আবার নিচের দিকে দেখাতে লাগল। তারা যা বোঝাল তা হল বাঘিনীটা পাহাড়ের শিখরে উঠে আবার ওধারে নেমে গেছে।

আমি তাদের কথামত যত তাড়াতাড়ি পারলাম সরু পথ ধরে শিখরে উঠতে লাগলাম। ওপারে খোলা কিছুটা জায়গা চোখে পড়ল। ঐ খোলা জায়গার ঘাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর আগের দিন বিকেলে বৃষ্টি হওয়ার জন্য সেই জমির ছাই মাটি ভিজে আছে। আমি সেই মাটির ওপর বাঘিনীর পায়ের দাগ পেলাম। পাহাড়টা ধীরে ধীরে দৈর্ঘ ঢালু নদীর দিকে নেমে গেছে।

আমি তল্লাকোটায় আসার দিন এই নদীটা পার হয়েছিলাম। বাঘিনীটা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তৃষ্ণা মিটিয়ে নদী পার হয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। আমি তাই দেখে পাহাড়ের শিখরে ফিরে এলাম এবং আমার লোকজনদের ডেকে নিলাম।

প্রায় সাত ঘণ্টা আমি ব্যয় করেছি বড় পাহাড় থেকে নদীটা পর্যন্ত বাঘিনীকে অনুসরণ করতে। দূরত্ব হবে প্রায় মাইল চারেক। দিনটা যদিও ব্যর্থ তবুও বেশ উত্তেজনা পুর্ণ। আহত বাঘিনীর কবলে যাতে না পড়ি সেজন্য নিজেকে সতর্ক হয়ে অনুসরণ করার ফলে আমি কেবল নিজেই উত্তেজনা ভোগ করিনি। আমার লোকজনেরা গাছের ওপর থেকে বাঘিনী আর আমার ওপর লক্ষ্য করতে গিয়েও যথেষ্ট উত্তেজনা উপভোগ করছে। আর সারাদিন পরিশ্রমও অনেক হয়েছে। সেই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছি। এখন রাত ৮টায় ক্যাম্পে ফিরছি।

পরদিন সকালে উঠে আবার বাঘের চামড়াগুলোকে উল্টে পাল্টে ছড়িয়ে শুকোতে দিলাম। আর কাঁচা জায়গাগুলোতে ছাই আর ফটকিরি গুঁড়ো ঘসে লাগিয়ে দিলাম। আমার অন্য লোকেরা এ অবসরে খেয়ে নিচ্ছিল।

বাঘের চামড়ার অনেক বেশী যত্ন করতে হয়। চামড়া থেকে চর্বিটা যদি সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে না নেওয়া হয় এবং কান ঠোঁট ও থাবার ভাল করে যত্ন না নেওয়া হয় তবে লোমগুলো খসে পড়তে থাকে, এবং চামড়াটাও নষ্ট হয়ে যায়। দুপুরের আগেই বেরোবার জন্য আমি তৈরী হলাম। দুজন লোককে ক্যাম্পে রেখে গেলাম, তারা সারাওর চামড়াটার ব্যবস্থা করবে। আর চারজনকে নিয়ে আমি আগের দিন বিকেলে বাঘিনীটাকে যেস্থানে অনুসরণ করেছি সেই জায়গার উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

যে উপত্যকার উপর দিয়ে ছোট নদীটা বয়ে গেছে সেটা বেশ চওড়া আর সমতল। উপত্যকার বাঁ দিকে সেই পাহাড়টা যার ওধারে

আমি আগের দিন বাঘিনীকে অনুসরণ করেছি ও ঐ ডান হাতের পাহাড়টার ওপর দিয়ে টনকপুরে যাবার রাস্তাটা চলে গেছে।

যখন মানুষখেকোর ভয় ছিল না তখন এই দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকাটায় খুব বেশীরকম তল্লাকোটের গরু ছাগল চরানো হত। ফলে জমিতে অসংখ্য চলার দাগ রয়েছে।. আর মাঝে মাঝে জলের নালা রয়েছে।

উপত্যকার এখানে এই জায়গাগুলোতে আগাছা আর জঙ্গলের ভিড়। এখানে নানারকম পশু সম্বর, কাকর, ভালুক শিকার করা যায়। কারণ তাদের নখের চিহ্ন আছে। তবে মানুষখেকো শিকারের স্থান নয়।

বাঁ দিকের পাহাড়টা থেকে উপত্যকার অনেকটাই দেখা যায়। যদি দরকার হয় এই ভেবে আমি আমার লোকজনদের পাহাড়ের মাথায় তিরিশ গজ দূরে দূরে এক একটা গাছের ওপর চড়িয়ে ভাল করে চারপাশে দেখিয়ে নিচ্ছিলাম।

তারপর আগের দিন বিকেলে বাঘিনীকে যে জায়গা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম সেইখানে আমি চলে এলাম।

হিসেব করে দেখলাম আমি ৭ই এপ্রিল বাঘিনীটাকে আহত করেছি। আর আজ হল ১০ই এপ্রিল। সাধারণতঃ বলা হয় যে বাঘ আহত হবার চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলে আর বিপজ্জনক হয় না। অর্থাৎ আর দেখলেই ছুটে আক্রমণ করতে যায় না। অবশ্য আঘাতের গুরুত্বের ওপর ও কিছুটা নির্ভর করে।

যে কোন বাঘ, যদি গায়ে আঘাত পেয়ে থাকে তবে সে কাছে গেলে সরে যায়। কিন্তু কোন বাঘ যদি খুবই কাবু হয়ে থাকে তবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সে বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আমি সঠিক ভাবে জানি না এই বাঘিনীটার আঘাত কি ধরণের? তবে আগের দিন যখন সে আমায় আক্রমণ করেনি তখন তার, আহত অবস্থার কথা ভোলা যায় না। তাকে এখন একটা মানুষখেকো বলেই ধরতে হবে। সে এখন বেশ

ক্ষুধার্ত। কারণ সেই মেয়েটিকে সেও তার বাচ্চারা মিলে খাবার পর আজ পর্যন্ত সে কিছু খায়নি।

বাঘিনীটা একটা গভীর নালা পার হয়ে তার ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে। তাকে অনুসরণ করতে করতে গরু বাছুর চলাচলের পথে এসে পড়লাম। এখানে সে নালাটা থেকে ডানদিকে গেছে।

ত্রিশ গজ দূরে একটা ঘন পাতাওয়ালা গাছ রয়েছে। বাঘটা সারা রাত এই গাছের নিচেই শুয়েছিল। সে তার গায়ের জ্বালায় ছটফট করেছে। কিন্তু পাতাগুলোতে কোন রকমের দাগ নেই। এখান থেকে আমি নতুনভাবে তার চিহ্ন দেখে এগোতে লাগলাম। যাতে তার খপ্পরে না পড়ি তাই খুবই সতর্ক রইলাম। বিকেল পর্যন্ত কয়েক মাইল এগিয়ে গেলাম।

সূর্য অস্ত যেতে আমি আমার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলাম। তারা শোবার সময় বলল যে জঙ্গলের পশু-পাখীর আওয়াজ ধরে তারা বুঝতে পেরেছে বাঘিনী কোন পথে এগিয়েছে। কিন্তু তারাও তাকে দেখতে পায়নি।

হাওয়ার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আহত হয়নি এমন কোনো মানুষখেকো বাঘকে শিকার করার সব থেকে বেশী বিপদ হল, পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়া। দু দিক থেকে আক্রান্ত হওয়া তার চেয়ে কম বিপদের। যদি হাওয়াটা ডানদিক থেকে বইতে থাকে তবে বাঁদিক থেকে এবং পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে, এবং যদি বাঁদিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে তবে ডানদিক থেকে ও পেছন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে।

এই অবস্থায় সামনের দিক থেকে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে না। কারণ আমি অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি কোন বাঘ আহত হলে সে মানুষ-খেকো হোক বা না হোক সামনে থেকে কখনো আক্রমণ করে না। সাধারণতঃ মানুষখেকোরা যতদূর লাফ দিতে পারে ততদূর থেকে অক্রমণ

করে। আহতরা একটু দূর থেকে দশ-বিশ গজ—কিংবা ত্রিশ গজ দূর থেকেও আক্রমণ করে।

সুতরাং এইসব যা করতে হবে তা মুহূর্তের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। কিন্তু পরের ক্ষেত্রে রাইফেল তুলে নিশানা করে গুলিটা করার সময় পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে খুব দ্রুত গুলি করতে হবে। আর মনে প্রাণে প্রার্থনা জানাতে হবে এক বা দু আউন্সের একটা সীসার টুকরো কয়েক শ পাউণ্ডের পেশী আর হাড়কে যেন ঠেকিয়ে দিতে পারে।

এই বাঘিনীটা সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে তার আঘাতের জন্য সে লাফিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না, এবং আমি যদি তার নাগালের বাইরে থাকতে পারি তবে কিছুটা নিরাপদ থাকব।

কিন্তু তাকে দেখার পর আজ চারদিন কেটে গেছে। সুতরাং এর মধ্যে হয়তো তার আঘাতটা সেরে উঠেছে। সেটা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। তাই ১১ই এপ্রিল যখন আমি সকালে একা একাই তাকে আগের দিন যে পর্যন্ত গেছিলাম সেইখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করলাম, তখন থেকেই আমি বড় বড় পাথরের চাঁই, ঝোপ-ঝাড়, গাছ বা এমন কোন জিনিষ এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কারণ এসব জিনিষের পেছনে বাঘিনীটা আমার জন্য ওৎ পেতে থাকতে পারে।

আগের দিন সে টনকপুরের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার আরেক জায়গা দেখে বুঝলাম সে রাত কাটিয়েছে। এবার সে শুকনো ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে ছিল। তারপর সে এগিয়ে গেছে। তার নতুন চিহ্ন দেখে এগোতে লাগলাম। সে ঘন ঝোপ-ঝাড় এড়িয়েই চলেছে। জলের নালা ধরেই সম্ভবতঃ এগিয়েছে।

সে জন্তুজানোয়ারের চলার পথ ধরেই এগিয়েছে। তাই মনে হয় সে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেনি। নিশ্চয়ই কিছু মারার জন্য খাবার জন্যই সে ঘুরছে। একটু পরেই একটা জলের নালায় সে একটা কয়েক সপ্তাহের মাত্র শিশু হরিণছানা মেরেছে। হরিণের বাচ্চারা বালির ওপর

শুয়ে যখন রোদ পোহাচ্ছিল তখনই সে তাকে মেরেছে। ছোট খুর ছাড়া হরিণটার কিছুই সে বাকি রাখেনি। আমি এখন তার মাত্র এক মিনিট কি দু'মিনিট পিছনে আছি।

এই সামান্য খাদ্যটুকুতে তার খিদে বরং বেড়েইছে। তাই আমি আরো সাবধান হয়ে গেলাম। জায়গায় জায়গায় সেই জন্তুর চলার পথটা নালা আর বনের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে। আমার অবস্থাটাও যদি ভাল থাকত তবে তাকে আমি পায়ে হেঁটেই ধরে ফেলতাম। কিন্তু আমার অবস্থা খুবই খারাপ। আমার মুখে আর ঘাড়ের ফোলাটা এমন বেড়েছে যে আমি মাথাটাকে আর ওপরে নিচে এপাশে ওপাশে নাড়াতে পারছিলাম না। আমার বাঁ চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক এখনও একটা চোখ ভাল আছে আর সেটা ডান চোখ। আর এখনও আমি কিছুটা শুনতে পাচ্ছি।

সারাদিন ধরে বাঘিনীকে অনুসরণ করেও তাকে আমি একবারও দেখতে পেলাম না। সেও বোধহয় আমায় দেখেনি। সেখানেই সে জঙ্গলের নালা বা জন্তুদের চলার পথ ধরে এগিয়েছে, সেই সময় আমি তল্লাটির ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে তার পায়ের দাগ খুঁজেছি। তাছাড়া জমিটাও আমার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। আমাকে অনেক বেশী হাঁটতে হচ্ছিল। ফলে বাঘিনী কিভাবে এগোচ্ছে তাকে কি করে বাগে আনবো তার কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি সেদিনের মত অনুসরণ করা ছাড়লাম। বুঝতে পারলাম বাঘিনীটা গ্রামের দিকে এগিয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে আমি বুঝলাম আমার খুব বিপদের দিন চলছে সমস্ত শিরায় শিরায় কে যেন হাতুড়ির মতো পিটোচ্ছিল। যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হল। এক বিরাট ফোঁড়ার বেদনা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। কেবল চা খেয়ে রাত কাটালাম। এজন্য আমি খুব ভীত হয়ে পড়লাম। কেবলই যেন মনে হতে লাগল আর একটা দীর্ঘ রাত আমাকে এই যন্ত্রণায় বসে বসে

কাটাতে হবে। আর কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু সেটা যে কি ঘটবে সেটাও যেন আমি অনুমান বা কল্পনা করতে পারছিলাম না।

তল্লাদেশের মানুষদের আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং নিজের 'দুঃসময়' পার করার জন্যই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু আমি যা করেছি তাতে তাদের অবস্থা আরো বিপদের হতে পারে।

বাঘিনীটা এখন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার সব থেকে সহজ শিকার মানুষের প্রতি নজর দেবে। কারণ সে তার স্বাভাবিক শিকার ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে তার ক্ষুধার জন্য এখন মানুষকেই খুঁজবে। সুতরাং বাঘিনী এবং আমার মধ্যে এখন একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। আর এই রাতটিই সব থেকে উপযুক্ত রাত।

পাহাড়ী ব্যবস্থায় এক কাপ দুধ চা খেয়েই আমি সান্ধ্যভোজন সেরে নেবার ব্যাবস্থা করলাম। চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা টা শেষ করলাম তারপর আমার আটজন লোককে ডাকলাম। তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম পরদিন বিকেল পর্যন্ত যেন আমার জন্য এই গ্রামেই তারা অপেক্ষা করে। আর আমি যদি তখনও না ফিরি তবে যেন তারা আমার জিনিষপত্তর বেঁধে পরদিন ভোরেই নৈনিতাল রওনা হয়ে যায়। কথাগুলো শেষ করে আমি বিছানাটা থেকে আমার রাইফেলটা নিয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেলাম।

শেষ কয়েক বছর ধরেই আমার লোকজনেরা আমার সঙ্গে শিকারে সাথী হয়েছে। তারা তাই আমার ব্যবহার সম্বন্ধে জানে। তাই কোন কথা কেউ বলল না। কোথায় যাচ্ছি তাও জিজ্ঞেস করল না। কিংবা বাধাও দিল না। তারা দল বেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে চলে যেতে দেখল। তাদের গালে তখন যেন একটা চকচকে দাগ দেখেছিলাম। হয়তো চাঁদের আলোর জন্যই ওরকম দেখাচ্ছিল।

ছোটবেলার কথা চিন্তা করলে যেটা থেকে আমি বেশি আনন্দ পাই তাহল শীতের কয়েকমাস আমরা দশ বারোজন মিলে চাঁদের আলোয় বনের রাস্তা দিয়ে যে ঘুরে বেড়াতাম এবং ঘরে ফিরে এসে যে

কড়া চা খেতাম সেই দিনগুলির কথা। এই হাঁটার সময় বনের মধ্যে রাত্তিরে মানুষের মনে যে ভয় হয় সে ভয় আমাদের কেটে যেত, এবং রাত্তিরে বনের মধ্যে যে শব্দ শোনা যেত তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতাম।

পরে বহু বছরের অভিজ্ঞতা আমার আত্মবিশ্বাস আর জ্ঞানকে বাড়িয়েছে মাত্র। ১১ই এপ্রিল রাত্রে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আমি যখন ক্যাম্প ছেড়ে বেরোলাম তল্লাদেশের মানুষখেকোর একটা হেস্ত-নেস্ত করতে, তখন আমার মনে কোন ভয়ের অনুভূতিও ছিল না।

বাঘের প্রতি আমার এত আগ্রহের কারণ অনেক বছর আগে থাকতে। আমি এমন এক জায়গায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেখানে তারা প্রচুর পরিমাণে ছিল আর তাদের লক্ষ্য করার মত প্রচুর সময়ও আমার ছিল। খুব ছোটবেলায় আমার বাঘ দেখতেই বেশী ভাল লাগত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু পরে বাঘ মারার স্পৃহা জন্মাল। তখনই এক নাবিকের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকায় একটি রাইফেল কিনলাম, আমার মনে হয় যে সেটা কোথা থেকে চুরি করেছিল। সেটা হাতে করে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরুতাম

পরে অবশ্য আমার ঝোকটা বাড়ে বাঘের ছবি তোলার দিকে— আমার অবশ্য তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল। বাঘের ছবি তুলতে গিয়েই তাদের সম্বন্ধে না জানা অনেক বিষয় আমি জানতে পারলাম।

সরকারের কাছ থেকে অরণ্যের স্বাধীনতা লাভ করার পর যা আমি ছাড়া ভারতের আরেকজন মাত্র পেরেছিলেন, এবং যা থাকার ফলে আমার খুবই উপকার হয়েছিল; আমি ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অরণ্যে, বনের মধ্যে কোনরকম বাধা না পেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। দিনের পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এবং এক একবার সাড়ে চারমাস ধরে বাঘের চলাফেরা লক্ষ্য করে, তাদের স্বভাব এবং বিশেষ করে তাদের শিকার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলাম।

বাঘ কখনো তার শিকারের পিছনে ধাওয়া করে না। এক সে শিকারের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে নতুবা তাকে গোপনে অনুসরণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই সে হয় একেবারে লাফ দিয়ে নতুবা দৌড়ে গিয়ে একলাফে তার শিকার ধরে। যদি কোন জানোয়ার বাঘের এক লাফের দূরত্ব এড়িয়ে চলতে পারে, তার সঙ্গোপন অনুসরণ করে এড়িয়ে যেতে পারে এবং তার দৃষ্টি, গন্ধ বা শব্দের দ্বারা কোনরূপ বিপদ টের পেলেই যদি সে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়, তবে সে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। পশুর ন্যায় গন্ধ এবং শব্দের সূক্ষ্ম অনুভূতি সভ্যতার বিকাশে মানুষ হারিয়েছে। আর মানুষ খেকো বাঘের পাল্লায় পড়লে মানুষকে তখন সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমি যখন অস্থির হয়ে যন্ত্রণার জ্বালায় সে রাতে বেরিয়ে পড়লাম, তখন আমার সব থেকে যেটা অসুবিধে হচ্ছিল তা হল আমার একটি চোখই সক্রিয় ছিল। আমি যদি বাঘের আওতার বাইরে থাকি তবে সে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তাকে আমি দূর থেকে হত্যা করতে পারি। তাই আমি আমার লোকদের নৈনিতাল ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম, বাঘের সঙ্গে পেরে উঠতে পারব না বলে নয়। আমার ভয় হয়েছিল আমি হয়ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারি আর আত্মরক্ষা করতে নাও পারি।

কোন একটা জায়গায় একবার ঘুরে যদি সেখানকার একটা মানচিত্র মনে মনে এঁকে নেওয়া যায় তবে সেখানে পৌঁছতে দ্বিতীয়বার কোন অসুবিধেই হয় না।

আমি বাঘিনীটাকে যে পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম সেখান থেকে আবার অনুসরণ করতে শুরু করলাম।—সৌভাগ্য বশতঃ বাঘিনীটা জন্তু জানোয়ারের পথ ধরে চলছিল বলে আমার অনুসরণ করার কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। সম্বর বা কাকর গুলো মাঝে মাঝেই বনের মধ্যে খোলা জায়গায় খাদ্য বা আড়ালের জন্য বেরিয়ে আসছিল। যদিও আমি তাদের সতর্ক করে দেবার শব্দ—ঠিকমত শুনতে পারছিলাম না।

তবে ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারছিলাম বাঘিনী চলতে শুরু করেছে। আর কোন দিকে যাচ্ছে তারও একটা ধারণা করা যাচ্ছিল।

গরু ছাগল চলাচলের সরু আঁকা-বাঁকা পথটা বা ঝোপঝাড়গুলো ঘুরে তার উল্টো দিকে গিয়ে আবার সেই দাগটা ধরার চেষ্টা করলাম। দেখলাম এই সরু পথটা অনেক বেশী দীর্ঘ। আমি একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। সেখানে দেখি ছোট ছোট ঘাস এবং বড় বড় ওক গাছ রয়েছে। বড় একটা গাছের ছায়ায় আমি থামলাম। গাছের ওপর একদল বাঁদর আছে বুঝলাম। গত আঠারো ঘণ্টা ধরে আমি পায়ের ওপর আছি আর অনেকটা হেঁটেছি। জায়গাটা নিরাপদ দেখেই বসে জিরিয়ে নেব ঠিক করলাম। কারণ বাঁদরেরা বিপদ দেখলেই সতর্ক করে দেবে। গাছে হেলান দিয়ে সামনের ঝোপে মুখ করে আমি বসলাম আধ ঘণ্টা। সর্ব প্রথম একটা বুড়ো বাঁদর আমাকে হুসিয়ারী জানাল। বাঘিনীটা তাকে দেখতে পেয়েছে। আমিও বাঘিনীটাকে শুয়ে পড়বার মুখে দেখতে পেলাম। আমার ডানদিকে একশ গজ দূরে এবং ঝোপ থেকে দশগজ বাইরে সে রয়েছে। আমার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে সে বাঁদরটাকে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল।

কালাধুঙ্গীতে আমি শীতকালে আমাদের প্রজাদের জমির ফসল শুকোবার সময় শুয়োর আর হরিণের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করি, তাই রাতে আমার শিকারের অভ্যেস আছে। জ্যোৎস্না রাতে একশগজ দূরে যে কোন জানোয়ারকে আমি গুলি করতে পারি। আর যারা নিজে নিজেই গুলি করতে শিখেছে তাদের মতো আমি দু-চোখ দিয়েই গুলি করতে পারি। এর ফলে এক চোখ দিয়ে আমি লক্ষ্যটাকে চোখে রাখতাম, অন্য চোখে নিশানা করতাম। তারপর গুলি চালাতাম।

অন্য সময় হলে আমি অপেক্ষা করতাম, বাঘিনী উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত। কিন্তু এখন আমার বাঁ চোখটা দুর্ভাগ্যবশতঃ বন্ধ এবং একশ গজ দূরে একটা মাত্র চোখ দিয়ে গুলি করা অনেকটা বিপদের ব্যাপার।

আগের দু-রাতে বাঘিনী একটা জায়গাতেই শুয়েছিল এবং সারা রাত ধরে ঘুমিয়ে ছিল। সুতরাং আজও সে তাই করতে পারে। যদি সে ঐ ভাবে পেটের উপর ভর দিয়ে মাথাটা ওপরে রেখে শুয়ে থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, তবে আমি ঐ গরু ছাগলের পথ ধরে ঝোপের মধ্যে গিয়ে, দশগজ দূর থেকে গুলি করতে পারি। অথবা খোলা জায়গার ওপব দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুলি করা যায় এমন জায়গায় যেয়েও গুলি করতে পারি।

যাই হোক, বাঘিনীটা কি করবে সেই ব্যাপারে মনস্থির না করা পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার এখন আর করার কিছুই নেই।

আধ ঘণ্টার ও বেশী সময় ধরে বাঘিনীটা একই ভাবে শুয়ে রইল। মাঝে মাঝে মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ায়। এদিকে বুড়ো বাঁদরটা ঘুমনো সুরে এক নাগাড়ে ডেকে যেতে লাগল। বাঘটা শেষ পর্যন্ত ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল তারপর আমার ডান দিকে হেঁটে চলে গেল। যেদিক দিয়ে সে এসেছিল সেদিকে দশ পনের ফুট গভীর ও বিশ-পঁচিশ ফুট চওড়া একটা খোলা নালা ছিল। আমি এই নালাটাকে পেরিয়েই এখানে এসেছি।

আমার আর বাঘিণীর মধ্যে দূরত্ব যখন ১৫ গজের মতন, তারপক্ষে আমাকে দেখা যখন আর সম্ভব নয়, তখন আমি তাকে আড়ালে অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

গাছের আড়ালে আড়ালে একটু দ্রুতগতিতে আমি এগোতে লাগলাম। সে নালার ধারে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদেব মধ্যে ফারক রইল মাত্র পঞ্চাশ গজ। এবার সে আমার রাইফেলের নিশানার মধ্যে এসেছে। কিন্তু একটা ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বলে গুলি করা হল না। অনেকক্ষণ এইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নালাটা পার হবার জন্য খুব আস্তে আস্তে তার ধারে গেল।

বাঘিনীটা এগিয়ে যেতেই আমি নিঃশব্দে নিচু হয়ে এগিয়ে গেলাম। একটা বড় ভুল করলাম আমি মাথা নিচু করে দৌড়ে। মাত্র কয়েক গজ যেতেই আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমার কাছেই দুটো ওক গাছ কয়েক ফুট দূরে দূরে ছিল। তাদের ডালগুলো ছিল পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। আমি রাইফেলটাকে ফেলে সেই গাছ বেয়ে দশ বারো ফুট উঠে একটা ডালে পা রেখে একটা ডালে বসলাম। তাছাড়া পিছনের ডালটায় পিঠ দিলাম। আমার সামনে যে ডালটা ছিল আমি তার ওপর আমার মাথাটা রাখলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথার ফোঁড়াটা ফেটে গেল, আমি ভয় পেলাম রক্তটা বুঝি মাথার ভেতরে চলে যাবে। কিন্তু তা না গিয়ে আমার বাঁ কান ও নাক দিয়ে বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ কোন তীব্র যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের বড় আনন্দের ব্যাপার। একজন ভুক্তভোগী লোক বলে ছিল কথাটি। তিনি চরম বেদনার পর বেদনা উপশমের সুখও পেয়েছেন। প্রায় শেষ রাতে হঠাৎ আমার যন্ত্রণাটা কমে গেল। পূর্বদিকে তখন আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। আমি মাথাটা আস্তে আস্তে তুললাম। একটা সরু ডালে চার ঘণ্টা বসে থেকে আমার পা ব্যথা করতে লাগল। আমি উঠে ভাল করে বসলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম আমি কোথায় আছি—আমার কি হয়েছে। আমার মাথা মুখ ও ঘাড়ের বিরাট ফোলা ভাবটা কেটে গেছে। আর ব্যথাটাও চলে গেছে।

এখন আমার ইচ্ছে মতো মাথা ঘোরাতে কষ্ট হচ্ছে না। আর আমার বাঁ চোখটাও খুলে গেছে। আমি বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছি। বাঘিনীকে গুলি করার একটি সুযোগ হারিয়েছি বটে, তবে এখন আমার বিপদ কেটে গেছে। বাঘিনী এবার যত দূরেই যাক আমি তাকে দ্রুত অনুসরণ করে গুলি করার সুযোগ আবার পাবো।

শেষে যখন আমি তাকে দেখি তখন সে গ্রামের দিকে এগোচ্ছে। চারাগাছটা থেকে অতি কষ্টে লাফিয়ে নেবে রাইফেলটা তুলে নিয়ে

আমি বাঘটাকে অনুসরণ করতে গেলাম। জলের কাছে নেবে আমি আমার জামা কাপড় এবং নিজেকে সম্ভব মতো পরিষ্কার করে নিলাম। আমার লোকজনেরা আমার নির্দেশ মতো সেই রাতটা গ্রামে কাটায় নি। তারা আমার ক্যাম্পের কাছেই আগুন জেলে কেটলি করে জল গরম করে নিয়ে বসেছিল। আমার শরীর থেকে জল ঝরে পড়ছে—এই অবস্থায় ফিরতে দেখে তারা আনন্দে লাফিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল—মাজেরা সাহেব! আপনি ভাল আছেন, আপনি ফিরেছেন?

উত্তরে বললাম,—হ্যাঁ ভালো আছি এখন। আমি ফিরে এসেছি।

যখন কোন ভারতীয় তার আনুগত্য প্রকাশ করে তখন তা বিনা দ্বিধায় এবং কোন মূল্য পাবার আশা না রেখেই করে।

তল্লাকোটে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন গাঁয়ের মোড়ল আমার লোকজনদের জন্য দুটো ঘর ছেড়ে দিল। কারণ বাইের রাত কাঠানো নিরাপদ ছিল না। আমার এই কাল রাত্রিতে বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও আমার লোক জনেরা আমার কোন রকম সাহায্য হতে পারে মনে করে বাইরে রাত কাটিয়েছে এবং এক কেটলি গরম জল করে রেখেছে চা-এর জন্যে যদি আমি ফিরি এই ভেবে।

আমি চা খেয়েছিলাম কিনা আমার মনে নেই। তবে মনে আছে—কেউ আমার জুতো খুলে ছিল। তারপর আমি বিছানায় শুয়ে পড়তেই কে যেন আমার গায়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি শান্তিতে ঘুমোলাম। কে যেন আমায় খুব জরুরী কাজে ডাকছে। কিন্তু কারা যেন বলছে আমার—ঘুম না ভাঙাতে। এই সব স্বপ্ন দেখলাম। বারবার এই স্বপ্নটাই দেখলাম। কিন্তু ঘুমের নেশা কাটিয়ে কথাটা সত্যি হয়ে উঠল। তাঁকে জাগাতেই হবে। নতুবা তিনি খুব রাগ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে অপর জনরা বলল,—না, কিছুতেই আমরা তাঁকে জাগাবো না। তিনি খুব ক্লান্ত।

কথাটা গঙ্গারাম বলছিল। তাকে ডেকে বললাম লোকটাকে আমার—কাছে নিয়ে আসতে।

মিনিটের মধ্যে একদল ছেলে বুড়ো আমার ক্যাম্পে এসে ভিড় করল। গ্রামের উল্টো দিকে মানুষখেকোটা একটা ছাগল খেয়ে ফেলেছে—এই কথাটাই তারা উৎসুক হয়ে বলতে এসেছে।

জুতো পরে তৈরী হতে হতে ভিড়ের মধ্যে চাইলাম। খুঁজছিলাম ডুঙ্গারসিংকে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ছাগলগুলো কোথায় মরেছে সে কি জানে। আর আমাকে কি সে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে।

ডুঙ্গারসিং আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল—হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি জানি। আর আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো।

গাঁয়ের মোড়লকে ভিড় সরিয়ে ফেলতে বলে আমি ২৭৫ রাইফেলটা নিয়ে ডুঙ্গারসিংকে সঙ্গে করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে আমার শরীরটা খুব তাজা হয়ে উঠেছিল। আর এখন মাথার ব্যথার জন্য আমাকে আস্তে আস্তে হাঁটতেও হবে না। আমি বেশ জোরে হাঁটতে পারছি। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি এই প্রথম বেশ স্বচ্ছন্দে কোনরূপ অসুবিধে ভোগ না করে হাঁটতে পারছি।

আমি যেদিন তল্লাকোটে এসে পৌঁছেছি,—সেদিন এই ডুঙ্গারসিংই আমাকে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে একটা সরু পিঠের মত উঁচু জায়গায় হাজির করেছিল। আমি এখানকারই একটা উপত্যকায় বাঘের বাচ্চা-দুটোকে মেরে ছিলাম। আর বাঘিনীটাকে আহত করেছি। বাঁ-দিকের উপত্যকায় একটা উঁচু জায়গা থেকে গরু ছাগল যাতায়াতের একটা ধীরে ধীরে পথ নেমে গেছে। এই উপত্যকাতে ছাগলগুলো বাঘিনীর হাতে মারা পড়েছে।

ছেলেটার পিছন পিছন আমিও দৌড়ে নামতে লাগলাম। খাড়াই এবং ভাঙাচোরা পথ ধরে এঁকে বেঁকে প্রায় পাঁচ-দশগজ যাবার পর পথটা একটা ছোট নদী পার হয়ে গেছে এবং তারপরই সেই নদীটার

বাঁ দিকের তীরে উপত্যকাটা নেমে গেছে এই পথটা যেখানে নদী পার হয়েছে তার কাছেই খোলা ও সমতল একটা জায়গা আছে। এই খোলা জায়গাটার ডান দিকে পাথরের সারির মতন আছে। এর উল্টো দিকে একটা ছোট গুহা এবং এই গুহার মধ্যে তিনটে ছাগল মরে পড়েছিল।

ছেলেটা পাহাড় বেয়ে আমাকে নিয়ে যখন নামছিল তখন সে বলল, কতকগুলো ছেলে দুপুরের দিকে অনেকগুলো ছাগল নিয়ে ঐ খাদের মধ্যে চরাচ্ছিল। তখন একটা বাঘ অর্থাৎ মানুষখেকোটা হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সেটা ছাগল মারে। বাঘ দেখেই ছেলেগুলো ভয়ে দৌড়তে শুরু করে. আর চিৎকার করে। কাছেই কিছু লোক কাঠ কুড়োচ্ছিল, তারাও তাতে যোগদিল। ছাগলগুলোর ছুটোছুটিতে আর লোকজনের চিৎকারে বাঘটা সরে গেল. কিন্তু কোন দিকে গেল তা কেউ বুঝতে পারল না।

লোকজনেরা তিনটি মরা ছাগল নিয়ে দৌড়ে গ্রামে গিয়েছিল আমাকে খবর দিতে। আর তিনটি ছাগল পিঠ ভেঙ্গে ঐখানেই পড়ে রইল।

আমি নিঃসন্দেহ যে সেই আহত মানুষখেকোই ঐ ছাগলগুলো মেরেছে। কারণ গতরাতে সে গাঁয়ের দিকেই যাচ্ছিল। 'গছাড়া আমার লোকজনেরা বলছিল, আমার ফেরার ঘণ্টা খানেক আগে একটা কাকর এই ছোট্ট নদীর তীর থেকে ডাকছিল। তারা প্রায় একশ গজ দূরে থেকেও শুনতে পেয়েছে। তারা ভেবেছিল, আমাকে দেখে কাকরটা বোধ হয় ডাকছে। তাই আগুনটাকে তারা আরো জোরে উস্কে দিয়েছিল।

খুব সৌভাগ্যের বিষয়। তারা তখন আগুন উস্কে দিয়েছিল। কারণ আমি পরে দেখলাম যে বাঘিনীর পায়ের দাগ ঐ আগুনের সীমানা এড়িয়ে গ্রামের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। নিশ্চয় কোন মানুষ শিকারের চেষ্টায়। মানুষ 'পাহাড়ে গ্রামেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। প্রথম

সুযোগেই তাই ছাগলগুলোকে মেরেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে সে এই কাজ সমাপ্ত করেছে। কারণ আঘাতের ফলে সে খুব খোঁড়াচ্ছিল। জায়গা আমার চেনা ছিল না। আমি তাই ডুঙ্গারসিংকে জিজ্ঞেস করলাম, বাঘিনীটা কোন দিকে গেছে মনে হয়?

উপত্যকার দিকটা দেখিয়ে সে বলল ঐ দিকেই ঘন জঙ্গল। তাই বাঘিনী নিশ্চই ঐ দিকে গেছে। আমি ঐ দিকে যাব বলে তাকে সব জিজ্ঞেস করে জানছি, এমন সময় একটা কালেগী পাখী ডেকে উঠল। ডাক শুনে ছেলেটি ফিরে তাকাল আর পাহাড়ের উপর দিকে চাইল। আমাকে সে বলেছিল পাখীটা ঐ দিকে ডাকছে।

আমাদের বাঁ দিকে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে আর সেখানে কিছু ঝোপ আর কয়েকটা গাছ রয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম বাঘটা ঐ পাহাড় বেয়ে ওঠে নি। আমাকে খুঁজতে দেখে ডুঙ্গারসিং বলল যে পাখীটা পাহাড়ের ওপর থেকে ডাকছে না। পাহাড়ের ওদিকে একটা নালা রয়েছে। সেই দিক থেকে ডাকছে। আর পাখীটা আমাদের দেখতে পায়নি। সুতরাং সে বাঘটাকে দেখেই ডাকছে।

ডুঙ্গারসিংকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে সে যেন দৌড়ে গ্রামে পৌঁছে যায়। তার ফেরার সময় সমস্ত পথটা আমি রাইফেল ধরে পাহারা দিলাম। যতক্ষণ না সে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছয়। সে চলে গেলে একটা সুবিধে মত বসবার জায়গা খুঁজে নিলাম।

উপত্যকার এদিকে বড় বড় পাইন গাছ। তার ত্রিশ চল্লিশ ফুটের মধ্যে কোন ডাল না থাকায় তার উপর চড়া অসম্ভব। তাই আমাকে প্রয়োজন হলে মাটিতেই বসতে হত। আমি চিন্তা করতে লাগলাম বাঘিনীটা যদি রাত না হওয়া পর্যন্ত না ফেরে আর ছাগলের মাংসের থেকে যদি মানুষের মাংসই বেশী পছন্দ হয়, তবে চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত দু-তিন ঘণ্টার অন্ধকার আমাকে অনেকখানি ভাগ্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাহাড়ের সারিতে একটা বড় চ্যাটালো পাথর রয়েছে। তার কাছেই রয়েছে আরেকটা ছোট পাথর। আমি ছোট পাথরে বসে বড় পাথরের আড়ালে থেকে দেখলাম, যদি বাঘিনী আমার অনুমান মত নির্দিষ্ট পথ ধরে আসে তাহলে সে শুধু আমার মাথাই দেখতে পাবে। তাই ঠিক করলাম ঐখানেই বসব।

আমার সামনে চল্লিশ গজ চওড়া একটা গাছ এবং ওধারে কুড়ি ফুট উঁচু পাড় রয়েছে। সেই পাড়ের ডান দিকে পাহাড়টা খাড়া উঠেছে। লোকজনেরা যতক্ষণ ছিল গর্তের মধ্যে ঐ ছাগল তিনটেও জ্যান্ত ছিল। এখন তারা মৃত। ছাগলগুলোকে মারার সময় বাঘিনী একটা ছাগলের পিঠের চামড়া তুলে ফেলেছিল।

কালেখ পাখীটা এখন আর ডাকছে না। আমার চিন্তা অন্যদিকে ঘুরতে লাগল। পাখীটা কি ছেলেটার পিছনে বাঘিনীটাকে যেতে দেখে ডেকেছে না বাঘিনীকে ফিরে আসতে দেখে ডেকেছে। কি করবো ভাবছি। অপেক্ষা করবো না উঠে ব্যাপার দেখবো। বেলা দুটোর সময় আমি আমার জায়গাটাতে বসেছি। আধ ঘণ্টা বাদে একজোড়া হিমালয়ের ম্যাগপাই পাখী উপত্যকা ধরে এলো। এরা বাসা বাঁধার সময় ছোট ছোট পাখীর বাসা ভেঙে দেয়। কিন্তু এই সুন্দর পাখীদের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যেখানেই মড়ার গন্ধ সেখানেই তারা হাজির হয়।

ছাগল গুলোকে দেখে তারা ডাক বন্ধ করে সাবধানে এগোতে লাগল। যে ছাগলটার পিঠের ছাল ছাড়ানো ছিল তার ওপর তারা হুঁসিয়ারী ডাক ডেকে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ ধরে একটা শকুনি উড়ছিল। ম্যাগপাইগুলোকে মরা মাংসের পাশে বসতে দেখে এখন সেটাও পাইন গাছ থেকে নেবে শুকনো আর একটা ডালে বসল। এই ছোট আকারের সাদা বুক, কালো পিঠ ও লাল মাথা ওলা বড় জাতের শকুনগুলো সর্বদা আগেই মড়ার গন্ধ পায়।

এই শকুন আসাকে আমি স্বাগত জানালাম। কারণ এর দ্বারাই আমার ঈপ্সিত খবর আমি পাব। একটা পাইন গাছের ওপরে বসে সে সমস্ত জায়গাটাই দেখতে পাচ্ছিল অনেক দূর পর্যন্ত। সে নেমে এলে বুঝতাম বাঘিনীটা অন্যত্র চলে গেছে। কিন্তু সে যদি ঐ ডালেই থাকে তবে বুঝতে হবে বাঘিনীটা কাছাকাছি কোথাও আছে। আরো আধ ঘন্টা এই ভাবেই বসে রইলাম। ম্যাগপাই দুটো খেতেই লাগল আর শকুনিটা একটা গাছের ডালেই বসে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘে সূর্যটাকে ঢেকে ফেললো। ফলে পাখীটা আবার ডাকতে শুরু করল। আর ম্যাগপাই দুটো চিৎকার করতে করতে উপত্যকা বরাবর নেমে গেল। অর্থাৎ বাঘিনী আসছে। আগের দিন রাতে মাথাটা ঘুরে যাবার জন্য—সুযোগটা নষ্ট করেছি। কিন্তু আজ আমার অনুমানের আগেই গুলি করার সুযোগ পাবো।

পাহাড়ের ওপর ঝোপ থাকার জন্য নালাটা আমার নজরে আসছিল না। বাঘিনীটা খুব ধীরে ধীরে আমার দিকে চেয়েই সমতল উঁচু জমিটা দিয়ে এগোচ্ছে। আমার মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে। নরম টুপিটা চোখের ওপর পর্যন্ত নামানো। আমি যদি স্থির নিশ্চল থাকি তবে সে আমায় দেখতে পাবে না। তাই রাইফেলটাকে রেখে আমি পাথরের ওপর স্থির হয়ে বসে রইলাম। আমার উল্টো দিকে এসে সে মাটির ওপর বসল। আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান রইল শুধু বড় একটা পাইন গাছ। আমি তার একদিকে মাথাটা অন্যদিকে লেজের কিছুটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তার ঘারের ওপর মাছি বসে বিরক্ত করছিল বলে সে লেজ দিয়ে তা তাড়াবার চেষ্টা করছিল।

বছর আটেক আগে বাঘিনী যখন আরো তরুণী ছিল তখন সে কোন সজারুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে গিয়ে আহত হয়েছিল। তার এই আঘাতের সময় তার বাচ্চা হয়ে থাকবে এবং স্বাভাবিক শিকার ধরে বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্য আহরণ করার ক্ষমতা তার নিজের ছিল না। ফলে সে মানুষ মারার দিকে নজর দিয়েছিল।

তল্লাদেশের লোকেরা এই বাঘিনীর হাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর সে উঠে তিনপাত্র গিয়ে আমার দিকে পাশ ফিরে ছাগলের দিকে তাকাল। চ্যাটানো পাথরের ওপর কনুই রেখে আমি তার হৃদপিণ্ডটা যেখানে, সেখানটা অনুমান করে ঘোড়া টিপলাম। দেখলাম পিছনের পাহাড়ের একটু ধুলো উড়ল। বুঝতে পারলাম গুলি ওর গায়েই লাগেনি। গুলিটা খেয়ে বাঘিনীটা সামনের দিকে লাফ দিল। তারপর সে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে আরেকটা গুলি করার আগেই ছুটল।

আমি এবার নিজের উপর ক্ষেপে গেলাম। এবং ভালো করে গুলি করার সুযোগ পেয়েও মারতে পারলাম না দেখে আমার খুব জিদ চেপে গেল। আমি বাঘিনীর পিছনে ছুটতে লাগলাম। খাড়াই পর্যন্ত অনুসরণ করে আমি হেঁচড়ে হেঁচড়ে একটা চলাচলের পথে নামলাম। বাঘিনীটা নিশ্চই এই পথ দিয়ে গেছে। এই পথের উপর নদীটা পার হয়ে বাঁ দিকের পাহাড়ে পাইন গাছের বন। এই পথ ধরে পঞ্চাশ/ষাট গজ যাবার পর একটা ঘুরাল হুঁসিয়ারী জানাল। বাঘিনীটা হয়তো ডানদিকের ঘাসে ঢাকা পাহাড়টায় আছে। আমি তাকে দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি গাঁয়ের একজন লোক সেই উঁচু জায়গাটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই তারা হাত নাড়িয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়তে লাগলাম। একটু গিয়েই দেখলাম তাজা রক্ত। জানোয়ারের চামড়া ছিলে থাকে। যখন তারা স্থির হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় গুলি খায় তখন যদি পুরো বেগে ছুটতে থাকে তবে, তার চামড়ার ফুটো আর মাংসের ফুটোটা আর এক লাইনে থাকে না। তাই দৌড়নোর সময় তার আঘাত থেকে কম রক্ত ঝরে পড়ে। তবে সে যখন থেমে যায় তখনই রক্ত ঝরতে থাকে। যত সে আস্তে আস্তে চলতে থাকে ততই তার রক্ত ঝরা বাড়তে থাকে।

আমি তার রক্তের ছিটে দেখেই বুঝলাম সে তখনও ছুটছে। তাই আমিও জোরে দৌড়তে লাগলাম। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে সরু একটা রাস্তার ওপর থেকে খাড়া ভাবে পড়ে গেলাম। দশ পনের ফুট নীচে একটা রডোড্রেভন গাছের চারায় নিজেকে সামলে নিয়ে নরম মাটির ওপর পা ঠুকে দাঁড়ালাম। বাঘিনীকে ধরার সুযোগ চলে গেলেও বুঝলাম এবার স্পষ্ট রক্তের দাগ ধরে এগোতে পারব।

পায়ে চলা রাস্তাটা এবার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের উত্তর ধার ধরে পশ্চিম মুখী হয়ে চলেছে। এই পথ ধরে দুশগজ এগিয়ে আমি খুব সাবধানে সমতল জায়গার দিকে এগোতে লাগলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আহত বাঘিনীটা আমাকে দেখা মাত্রই আক্রমণ করবে। আর তখন আমাকে একটা মাত্র গুলি নিয়েই তার মোকাবিলা করতে হবে। আমি তাই রাইফেলের বেল্টটা খুলে আর একবার ভালো করে কলকাতার ম্যাণ্টল কোম্পানীর কার্টিজটা দেখে নিলাম। আমি গুলিটা ভরে নিয়ে রক্তের দাগ ধরে পাতা বাহারের ঝোপে এগোতে লাগলাম। হয়তো সে কাছেই কোথাও শুয়ে আছে। ঝোপের তিন গজের মধ্যে এসে ডানদিকে রাস্তায় একটু নড়াচড়া দেখে দাঁড়ালাম। বাঘিনীটা লাফ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। যদিও সে আহত এবং ক্ষুধার্ত তবু শিকার করার ক্ষমতা ওর আছে। কুড়ি বছর ধরে সে মানুষ শিকার করছে। তবে তার লাফটা দেওয়া আর হয়নি। কারণ সে উঠে দাঁড়াতেই আমার গুলি তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল আর দ্বিতীয় গুলিতে তার ঘাড় ভাঙল।

দিনের পর দিন খালি পেটে কষ্ট ও পরিশ্রমের পর আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপতে লাগল। বহু কষ্টে আমি সেই বাঁকটার কাছে এসে পড়লাম। রডোড্রেনডনের বীজটা না পড়লে নিচের পাথরে পড়ে আমার প্রাণটাই হয়ত যেত।

আমার লোকজনেরা আর গ্রামের সমস্ত মানুষ তখন দুই পাহাড়ের মাঝে উঁচু জায়গাটায় এসে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের দিকে টুপীটা

সবে তুলেছি নাড়াইও নি অমনি তারা ছেলে বুড়ো সকলে চিৎকার করতে করতে দলে দলে নেবে আসতে লাগল। অভিনন্দনের হিড়িক কমতে বাঘিনীটাকে একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দিল। কুমায়ুনের বেশী গর্বিত ছয়জন গাড়োয়ানী বিজয়গর্বে তল্লাদেশের মানুষখেকোকে বয়ে নিয়ে—তল্লাকোটে এসে পৌঁছল। মেয়ে ও শিশুদের দেখাবার জন্য বাঘিনীটাকে একটা খড়ের বিছানা পেতে শোয়ানো হল। কয়েক সপ্তাহ পর আমি পেট ভরে খেয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। ঘণ্টা খানেক পর আমি বাঘিনীটার ছাল ছাড়াতে শুরু করলাম।

৭ই এপ্রিল যে গুলিটা ছুঁড়েছিলাম সেটা দেখি বাঘিনীর ডান-দিকের কাঁধে জোড়ার মধ্যে শক্ত ভাবে আটকে রয়েছে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় গুলিটা গায়ে লাগেনি। ১২ই এপ্রিলের গুলিটা ম্যাগাভেদ করে গেছে। হাড়ে লাগেনি। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুলিতে সে মারা গেছে। ডান পা ও কাঁধের থেকে আমি প্রায় বিশটা সজারুর কাঁটা বের করলাম। এই কাঁটাগুলো তার পেশীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল আর এগুলোই হল বাঘিনীর মানুষখেকো হওয়ার কারণ।

পরদিন আমি চামড়া গুলোকে শুকোলাম। তিন দিন পর আমার দুর্ভাগ্যের দিনগুলো পিছনে ফেলে আমি নিরাপদে বাড়ি ফিরে এলাম। বেনেশ সহৃদয় হয়ে ডুঙ্গারসিং আর তার ভাইকে ডেকে পাঠালেন এবং আল মোড়ার একটা অনুষ্ঠানে, আমাকে তারা যে সাহায্য করেছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানানো হল এবং তাদের আমার কৃতজ্ঞতার নির্দেশ স্বরূপ উপহার দেওয়া হল।

নৈনিতালে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে স্যার ম্যানকমহেলি কর্ণেল ভিক নামে জনৈক কার্যবিশেষজ্ঞের কাছে আমাকে পাঠালেন। তিনি লাহোরে তাঁর হাসপাতালে তিন মাস ধরে আমার চিকিৎসা করলেন। আমার লোকজনের সঙ্গে সহজেই যাতে মিশতে পারি তার জন্য কানটাকে সেই রকম করেদিলেন। আর আমি এর জন্য আমার পাখীর গান শোনার আনন্দ ফিরে পেলাম।



সম্পূর্ণ শিকার
উপন্যাস

নরখাদকের সন্ধানে

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন—দক্ষিণ ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। বিখ্যাত শিকারী কেনেথ অ্যাণ্ডারসন। হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলের বাঘ, হাতি আর চিতা শিকারের প্রত্যক্ষ ঘটনা নিয়ে লিখেছেন অসাধারণ শিকার সাহিত্য যা পড়লে মনে পড়ে বিচিত্র সুন্দর ভয়ংকর ভয়াল অরণ্যের কথা।

কেনেথকে তাই বলা হয় দাক্ষিণাত্যের জিম করবেট। সেই অসম সাহসী মানুষটির অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বাছাই করা কাহিনী শোনানো হলো।

॥ এক ॥

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চিটুর জেলার উত্তর পূর্ব অংশে ছোট্ট একটি উপত্যকা যেখানে চামালা আপন মহিমায় বিরাজ করছে।

কুদ্দাপ্পা জেলাটি ঠিক এই উপত্যকার উত্তরে। ছোট্ট এই উপত্যকাটি নেহাৎ ছোট নয়। এর মূল অংশ তিন মাইল চওড়া জায়গা নিয়ে সাত মাইল টানা উত্তরে চলে গেছে; এরপর এর অপরিসর দুটো শাখা ইংরেজী Y-এর মত দুদিকে ভাগ হয়ে উত্তর পশ্চিমে একটি এবং উত্তর-পূর্বে চার মাইল মত আরেকটি শাখা চলে গিয়ে কুদ্দাপ্পার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত একটি বিরাট দুরারোহ পর্বতের নীচে অস্ত ঘোষণা করেছে।

কল্যাণী একটা মনোরম নদী, এই উপত্যকার উত্তর-পূর্ব ঘেঁসে গুণ্ডাল পেন্টা ও উম্বাল মেরু নামে দুই অরণ্যরাশি শোভিত উপত্যকার বুক দিয়ে উৎরাইতে এসেছে।

বারোটি মাস, এমনকি গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতপ্ত দিনেও এখানকার জলাশয়গুলোতে হিম শীতল জল বন্দী থাকে।

কল্যাণী এরপর প্রধান উপত্যকা ধরে দক্ষিণগামী হয়ে অবশেষে নাগাপাতলা গ্রামে দৌড় শেষ করেছে।

প্রাচীন একটা হ্রদ আছে এখানে, চন্দ্রগিরির রাজারা এবং তার আরো অনেক পরে টিপু সুলতান প্রচণ্ড গরমকালে খরা কবলিত গ্রামে জল সরবরাহের জন্য চেষ্টা করেছিলেন এই হ্রদে বাঁধ দিতে।

বনবিভাগের পক্ষ থেকে এই হ্রদের দক্ষিণে একটা বাংলো তৈরি হয়। বেশ সুন্দর করে পুরু খড়ের ছাউনি দেওয়া বাংলোটি তৈরী হয় পুরোনো বাঁধটির কোল ঘেঁসে। আরে পল্লী রজম পেট গ্রামটি এই বাংলোর মাইল দেড়েক দূরত্বে। প্রায় আধুনিক কালের বলা যেতে পারে গ্রামটিকে।

চামলা উপত্যকার সম্পূর্ণটাই ঘন জঙ্গল। উপত্যকাটি শিকার সংরক্ষিত এলাকা ছিল বৃটিশ রাজত্বে। পূর্বে তিরুপতি জঙ্গল। এই জঙ্গলের অন্তিম সীমানা নির্দেশিত হয়েছে ভারতের নামকরা তীর্থ স্থান তিরুপতির মন্দিরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আর পশ্চিমে আছে বাখরা পেট বন বিভাগ, দক্ষিণে সুপ্রাচীন চন্দ্রগিরি নগর। এখানে অতীতে গৌরবের মৌন কীর্তি বীর দর্পে ঘোষণা করছে নগরের বহু যুগের প্রাচীন দুর্গ।

একটি মিটার গেজ রেলপথ চন্দ্রগিরির গা দিয়ে অথচ ছোঁয়া বাঁচিয়ে তিরুপতি ও রেনিগুণ্টার দিকে এগিয়ে গিয়ে মিশেছে মাদ্রাজ-বোম্বাই ব্রডগেজ লাইনে। দীর্ঘ দিন ধরে গরুর গাড়ি চলার জন্য, আপনা আপনি একটা একটা অপ্রশস্থ রাস্তা চন্দ্রগিরি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল মত গিয়ে রঙ্গমপেট-এ এসে একটু দাঁড়িয়ে, আবার দেড় মাইল উত্তরে ঘুরে নাগাপাতলা পর্যন্ত। আবার আরো উত্তরে আরো সাত মাইল লম্বা লম্বা পা ফেলে পুলিবন্ধু নামে একটা জায়গায় এসে বিনা নোটিশে দাড়িয়ে গেছে। এই সাত মাইল পথকে বনবিভাগের দপ্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই দপ্তর থেকেই ছটো স্কোয়ার জায়গায় কনক্রিট দিয়ে বেশ মজবুত করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে এখানে তাবু খাটানো যায়। এছাড়া একটা কূপ ও খনন করা হয়েছে যাতে অতিথিরা বারো মাস জল পায়।

এই উপত্যকা ও তার প্রতিটি শাখা প্রশাখাগুলো এত সুন্দর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আঠারো বছর আগে যখন আমি প্রথম আসি তখন মনে হয়েছিল এগুলো শিকারীদের প্রমোদ কানন।

প্রধান উপত্যকার বুকে চড়ে বেড়াত ছোট-ছোট ডোরা কাটা হরিণ, কত চিতল। ঐ হরিণদের মধ্যে কয়েকটা এমন সুন্দর শিঙ্গাল হরিণ দেখেছিলাম যাদের মত সারা দক্ষিণ ভারতে আর কোথাও নজরে আসেনি।

পশ্চিমে রাখরাটে পর্বতের মিছিল। পূবে তিরুপটি পর্বতের সংসার আর উত্তরের সম্পূর্ণ দুরারোহ অঞ্চলটি পর্যন্ত যে ঢাল পাহাড়ে জমি বিছিয়ে আছে তার সবটাই ছিল এককালে ঐ সুন্দর অপূর্ব শিঙাল হরিণদের ভ্রমণস্থান।

কালো ভালুক এখানকার সব জায়গাতেই নজরে আসতো। দুরারোহ পর্বতের ছায়াতলে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে এই ভালুকগুলো ছিল যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি অগনিত।

আর বাঘেদের ভ্রমণোদ্যান ছিল প্রধান উপত্যকা ও তার উত্তর পূব অংশে। বাখরাপেট পর্ব্বতশ্রেণী থেকে বিদায় নিয়ে উপত্যকা ডিঙিয়ে গভীর বনাঞ্চল পেছনে ফেলে কুদাপ্পার জঙ্গল উপেক্ষা করে মামা দুরের অন্তঃস্থল দিয়ে সেটিগুন্টার পথে চলে আসতো এই বাঘের দল। এই অঞ্চলের সব জায়গাতেই চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যেত। ছাই রঙা বন মুরগি, স্পার-ফাউল, পী ফাউল বিশেষ করে প্রথমটি বেশী সমেত সব পাওয়া যেত।

শুধু মাত্র দক্ষিণ ভারতের এই স্থানেই আমার প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা বাদেও প্রতি দুপুরে, মাঝ রাতে, ও ভোর রাতে বন-মুরগির ডাক কানে এসেছে।

তখন ১৯৩৬ সালের প্রথমদিকের কথা বলছি। সুন্দর শান্তিপূর্ণ এই এলাকায় হঠাৎ আবির্ভাব হলো একটা ডোরা কাটা বাঘের। যাকে নিয়ে আমি আজ কলম ধরছি। বাঘটা নেহাৎ ছোট খাট নয়, তার থাবার দাগ দেখে বোঝা যায় সে কম শক্তি সম্পন্ন নয়, এবং শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করত মানুষের ওপর ....কখন যে কোথা থেকে হঠাৎ উপস্থিত হতো কেউ জানত না, এবং কাছে পিঠের বা দূর কোন বনাঞ্চল থেকে মানুষখেকো বাঘের কোন উপদ্রবের গুজবও আগে থেকে কেউ ছড়াত না বা ছড়ানোর মত ঘটনা ঘটত না। কিন্তু তবুও একদিন চারিদিকে খবর রটে গেল যে, এই উপত্যকায় একটা মানুষ খেকো বাঘ ঢুকেছে। একজন বাঁশ টাশ কাটছিল

গুওাল পেণ্টার জলার ধারে, হঠাৎ বাঘটা এসে তার বাঁশকাটা চির জীবনের মত ঘুচিয়ে দিয়েছে। ঠিক তিন দিন পরেই আবার দেখা গেল একজন পথিককে সাবার করেছে নাগাপাতলা পলিবমু বন পথের চার নম্বর মাইল পোষ্টের কাছে। তারপর থেকেই পাশাপাশি উপত্যকা তিনটেতে বাঘটা যখন তখন অত্যাচার চালাতে থাকে. এবং ছমাসের মধ্যে দেখা গেল মোট সাতজনকে হয় সম্পূর্ণ খেয়েছে নয় কিছুটা খেয়ে ফেলে গেছে।

একদিন নাগাপাতলার বন বাংলোর দিকে বন পরিদর্শন করতে চলেছেন বাখরাপেট বন বিভাগের কর্মচারী, তাঁর এলাকায় চামালা উপত্যকা, গরুর গাড়ী বোঝাই প্রায় পনের দিনের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

বিকাল তখন পাঁচটা. দু-মাইল আর এগোলেই তাঁর গন্তব্যস্থান। হঠাৎ একটা বাঘ গাড়ির সামনে পথের উপর এসে দাঁড়ায়

সামনে বাঘ, গাড়োয়ান দিল গাড়ি থামিয়ে, ভিতরে ছিল বন-বিভাগের কর্মচারী ও পাহারাদার। তারা বাঘটাকে দেখতে পায় নি, গাড়োয়ান ডাকতেই তারা মুখ বাড়িয়ে বাঘটাকে দেখেই গাড়োয়ান সমেত তিনজনে চিৎকার সুরু করে দেয়, আর বাঘটা কি ভেবে পথের পাশে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখন পাহারাদারের কি যে বুদ্ধি হলো, বাঘটা যাতে পালিয়ে যায় এই ভেবে গাড়ি থেকে নেমে প্রচণ্ড ভাবে হাত পা নাড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু বাঘটা পালানো দূরে থাক, পাহারাদারের মুখ থেকে কয়েকটা আওয়াজ বেরোতেই, বাঘটা যেন ধমক দিয়ে তেড়ে এলো। তারপর তাকে মুখে তুলে কয়েকটা লাফে গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হলো। সম্পূর্ণ ঘটনাটা এমন অভাবনীয় ও নিমেষের মধ্যে হলো যে ভদ্রলোক কিছুই করার সুযোগ পেলেন না। অবশ্য করার মত কোন হাতিয়ারও তো কাছে ছিল না। নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি নাগাপাতলার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায়

সেদিন আর লোকজনের অভাবে পাহারাদারটিকে খোঁজা সম্ভব হয়নি,

পরদিন সকালে দলবল সহ সশস্ত্র হয়ে যখন লোকটিকে খুঁজতে বেরিয়ে ঘটনাস্থলে এসে তার থেকে এক ফার্লং মত দূরে একটা খাদে লোকটিকে পাওয়া গেল. তখন দেখা গেল,. হতভাগ্য লোকটার হাত পা দুখানি ও মাথাটা মাত্র পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল তার সবুজ পাগড়ি সহ খাকি পোষাকটা।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি দেশের সমস্ত কাগজে ছাপা হলো। কর্তৃপক্ষরা চিন্তিত হলেন। সরকার বাঘটাকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করায় মাদ্রাজ শহর ও স্থানীয় কয়েকজন বাঘটাকে শায়েস্তা করার জন্য উপস্থিত হলেন চামালায়।

কিন্তু বাঘটা যেন বুঝতে পারল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়ে তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাই কিছু দিনের জন্য সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা ভাবল—এ যাত্রায় রক্ষে হলো. বাঘটা হয়ত এলাকা ছেড়ে উত্তরে কুন্দাপ্পা কিংবা বাথরাপেট বা তিরুপটির বনবিভাগের দিকে চলে গেছে। তবুও সবাই সতর্ক রইল যদি এতটুকু গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু না, বাঘটার কোন সন্ধানই মিলল না।

চামালা উপত্যকার মাইল আঠারো উত্তর পূবে মাদ্রাজ-বোম্বাই ব্রডগেজ রেল লাইনের উপরে চারিদিকে পাহার ঘেরা ও ঘনো জঙ্গলে আবৃত অঞ্চলে মামান্দুর রেল স্টেশনটি দাড়িয়ে।

স্টেশনের কাছে কর্মরত এক পাহারাদার একদিন তার টহলের শেষ সীমানায় আসতে পারল না। পর পর দুদিন সে অনুপস্থিত। সামান্য কারণে প্রাচ্যদেশে বাড়ি না ফেরাটা কেউ অস্বাভাবিক মনে করে না। কিন্তু তার পরেও যখন লোকটা এল না, তখন সবাই শঙ্কিত হলো। এবং একটা অনুসন্ধানী দলকে পাঠানো হলো তার খোঁজের জন্য।

অনুসন্ধানীরা রেলপথ ধরে অনুসন্ধান কালে তার ভাগ্য সম্বন্ধে প্রথম সূত্র পেল একটা হাতুড়ি। তপ্ত রৌদ্র শক্ত মাটি, ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। তবে সামান্য দূরে একটা বাঁধের ধারে এক জায়গায় দেখতে পেল একটা রক্তধারার দাগ কাছে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। দাগ ধরে এগোতে একটা চটি নজরে এলো, এবং সেই সাথে তারা দেখতে পেল আশে পাশের ঝোপের পাতা রক্তে ভরা। আরো খানিকটা এগিয়ে একটু নরম বালুময় স্থান অতিক্রম করতেই তারা স্পষ্ট দেখতে পেল বাঘের পায়ের চিহ্ন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজির পরেও লোকটার দেহাবশেষের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

সবাই সিদ্ধান্ত নিলো লোকটাকে বাঘেই নিয়েছে। কেননা প্রমান হাতে। তাছাড়া বেশ কয়েকমাস থেকে চামালার মানুষ-খেকোর কথা অনেক দূরাঞ্চলেও প্রচার হয়। ফলে সবাই এই দুর্ঘটনার জন্য এই বাঘটাকেই দায়ী করে।

এরপর কয়েক মাসের মধ্যেই আরো দুটো মানুষ বাঘের কবলে প্রাণ হারায়, একটা উস্কালমেরুতে আরেকটা মামান্দুর উত্তর পশ্চিমে এগারো মাইল দূরে অবস্থিত সেটিগণ্টায়।

ঠিক এই সময় এক ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে মাদ্রাজে আসতে হয়। এই সুযোগে স্থানীয় বেআইনি শিকারীদের শিকারের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যে অনুযোগ করেছিলাম সেই নিয়ে বনবিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করলাম।

কথায় কথায় তিনি এই বাঘটির উপদ্রবের কথা উল্লেখ করে। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার অনুরোধ করেন।

আমার হাতে তখন আগের বছরের কয়েক মাস ছুটি পাওনা আছে। ঠিক করলাম সেই ছুটি কাজে লাগিয়ে বাঘটার পিছনে ধাওয়া করব।

॥ দুই ॥

ফিরে এলাম ব্যাঙ্গালোর। তারপর কয়েকদিন কাটল সবকিছু গোছ-গাছ করতে। এবং এর দশদিন পরেই আমি উপস্থিত হলাম নাগাপাত্তলার বন-বাংলোয়, এবং এই বাংলোকেই চামালার ব্যাঘ্র নিধনের হেড অফিস করব ঠিক করলাম।

প্রথমে কর্ম্মসূচী ঠিক করলাম, অর্থাৎ যুদ্ধের আগে পরিকল্পনা যাকে বলে—প্রথমে স্থানীয় খবরগুলো হাতে নেওয়া। পরে হত্যা-কাণ্ডের জায়গাগুলি পরিদর্শন করা যদি সম্ভব হয় যে সব জায়গায় এই হত্যাগুলি হয়েছে সেই সেই জায়গায় লক্ষ করে বাঘের যে সব বিভিন্ন পথে আসাযাওয়া করবে সে সম্বন্ধে একটা ধারনা গড়ে তোলা।

আমাকে কিন্তু সেখানে হতাশ হতে হল। কেননা লক্ষ্য করলাম বাঘটা কখনো এক জায়গায় থাকে না...... আজ এখানে কাল সেখানে। আজ যদি চামালাতে মানুষ মারল, কালকেই আবার পাহার ডিঙিয়ে চলে গেল কুদ্দাপ্পা কিংবা মামান্দুরে।

বেশ কষ্টে চারটে মোষের বাচ্চা যোগার করলাম। এবার সেগুলো টোপ হিসেবে উম্বাল মেরুতে একটা, একটা গুগ্গাল পেন্টায় আরেকটা নাগাপাতলা-পুলিবন্নুর জঙ্গল পথের চার নম্বর মাইল ষ্টোনের কাছে, আর শেষটা কল্যাণীর নদীর শাখা রগিমান কোনরের উৎপত্তির মুখে।

পরের দিন দেখলাম চার নম্বর মাইলষ্টোনের কাছের টোপটা সাবাড় হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখলাম, এটা আদৌ সেই বাঘটার কাজ নয়, এটা কোন বড় ধরনের চিতাবাঘ অথবা হায়েনার কাজ।

একেই টোপের দাম প্রচুর, তায় এগুলো ওই চিতাবাঘ নষ্ট করে

তাহলে আমার পক্ষে বার বার টোপ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই চিতা বাঘটা মারার জন্য মাইলস্টোনের কাছে নরসিংহ চেরুতে জলাশয়ের ধারে আত্মগোপন করে রইলাম। জানতাম বাঘটা তার শিকারকে সম্পূর্ণ খেতে আবার আসবে এলোও তাই আমিও আমার শত্রুকে নিধন করলাম। নতুন একটা টোপ কিনে ঐ জায়গায় আবার রাখলাম।

পরের সপ্তাহটা ঘুরে ফিরেই কেটে গেল। সকালের দিকে জঙ্গলের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। যদি বাঘটার দর্শন মেলে।

ন দিনের দিন আমি আমার ছোট্ট স্টুডিবেকারে চেপে পুলি-বন্নুর দিকে যাচ্ছি সেখান থেকে আবার জঙ্গলের এদিক ওদিক বেড়াব।

হঠাৎ নজরে এলো ছ নম্বর মাইলপোষ্টের কাছে একটা বাঘের থাবা পথে উঠে ঠিক মাজ বরাবর পুলিবন্নু অতিক্রম করে চলে গেছে।

বাঘটার চলার মধ্যে বৈশিষ্ট্য নেই। তাই ঠিক ধরতে পারলাম না, এটা কি আমার মানুষখেকো না অন্য কোন বাঘের থাবার দাগ।

পথের ধারে নরম মাটিতে কয়েক জায়গায় দাগটা বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখাছিল। ফলে ভাল ভাবে পরীক্ষা করতে পেরেছিলাম।

কিন্তু পরীক্ষা করে জানা গেল এটা কোন সাধারণ পুরুষ বাঘের থাবা। এছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য পেলাম না।

এবার একটু হঁটলাম। পুলিবন্নুতে গাড়ি রেখে উত্তর পুর্বের উপত্যকা ধরে এগিয়ে চললাম। জঙ্গলের পথটা বহুবার কল্যাণী নদীর এপার ওপার হয়েছে। কিছুটা এগিয়ে বুঝতে পারলাম বাঘটা কিছুক্ষণ আগে এই পথে সামনে গেছে।

অনেক আশা নিয়ে গুণ্ডালপেণ্টা আর উম্বালমেরুর টোপ দুটো দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হতাশ হলাম, দেখলাম মোষের বাচ্চা দুটো পরম নিশ্চিন্তে ওদের জন্য রাখা খড়গুলো চিবোচ্ছে।

দুপুরের আহার পর্ব সেরে আবার ওই বাঘের থাবার দাগ দেখে জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোন কাজ হলো না, কেননা নদীর দু-ধারে ঘন বাঁশবনে সেই দাগগুলো হারিয়ে গেল।

বেলা তখন অনেক পুলিবন্দুর পথে এবার। আধ মাইল মত গিয়েছি···বাঁশের বনের এলাকা তখন সঙ্গে চলেছে। হঠাৎ একটা স্লথ ভালুককে দেখলাম। এই সময় ভালুক দেখা পাওয়া একটু অস্বাভাবিক, কেননা তারা সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় বেরোয়. দেখি বিরাট একটা উইঢিবির গর্তে নাক আর মুখটা ঠেকিয়ে প্রচণ্ড নিশ্বাসে হাঁ করে মুখের মধ্যে উইগুলোকে টেনে নিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হলো যেন একটা কালো লোমশ মানুষ উইঢিবির কাছে দাঁড়িয়ে। উইগুলো মুখে নেবার সময় লক্ষ লক্ষ মৌমাছি গুন গুন করার মত অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।

ভালুকটা উই খাবার আনন্দে এতই বিভোর যে, আমার কাছে এগিয়ে যাওয়াতেও সে টের পেল না। আরো কাছে এগোবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ফল হতো অন্য রকম, আমাকে কাছে পেয়ে হয়ত আক্রমন করতে তেড়ে আসতো···হয়তো তখন আমি গুলি ছুঁড়ে বসতাম। ফলে সেই গুলির শব্দে হয়ত বাঘটাই পালিয়ে যেত. তাই ইচ্ছে করে প্রায় ৭০।৮০ হাত পিছিয়ে এসে জোরে কাশির শব্দ করলাম শব্দ শুনেই ভালুকটা উই খাওয়া বন্ধ করে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। তার মুখের ভাবটা এমন দেখাচ্ছিল যে, আমার প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল।

ভালুকটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে আরো উঁচু হয়ে আমায় এমন ভাবে দেখতে লাগল, মনে হলো এখনি যেন আমায় তেড়ে আসবে···আক্রমন করার সময় সচরাচর ওরা যা করে।

কিন্তু ভালুকটার মনে হয় সুবোধ ছিল। সে পরক্ষনেই ঘুরে চার হাতে পায়ে এমন ভাবে ছুট মারল যেন একটা কালো বল ছিটকে এগিয়ে গেল।

পরদিন সকালে আবার পরিবস্থ। সেখানে কোন ফিরে আসা বাঘের খাবার দাগ দেখা গেল, তাই সিদ্ধান্ত নিতে হল ভালুকটা উত্তর পূব উপত্যকায় কোথাও লুকিয়ে আছে। নয় এ জঙ্গল থেকে চলে গেছে।

গুণ্ডালপেন্টার টোপটা তখনও বহাল তবিয়তে অরণ্যশোভা দর্শনে বিভোর।

কিন্তু উম্বালমেরুর টোপটা যথাস্থানে দেখা গেল না। পরীক্ষার ফলে বলে দিল কোন শক্তিমান বাঘ টোপটাকে মেরে, শক্ত দড়ি ছিঁড়ে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গেছে। কেননা টেনে নেবার দাগটি স্পষ্টই ছিল। প্রায় দু-শো হাত যাবার পর গাছের ডালে একটা কাকের দৃষ্টি লক্ষ করলাম। কাকটা একটা ডালে বসে কোন কিছুর সন্ধানে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হয় হয়ত নিচে কোন শিকার আছে কিন্তু কোন প্রতিবন্ধক থাকায় শিকার গ্রহণ করতে পারছে না।

কাকটা যে ডালটায় বসে ছিল সেখান লক্ষ করা যায় বড় বড় ঘাসজমি নিচের দিকে নেমে গেছে। সেখানে একটা ঝোপ, আর সেই ঝোপের আড়ালেই ব্যাঘ্র মশাই তার শিকার নিয়ে ভোজে বসেছেন।

ঠিক করলাম সোজাসুজি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না, হয়ত শব্দ পেলে বাঘটা সরে পরতে পারে। তাছাড়া বাঘটা যদি মানুষ খেকো হয় তবে আমায় আক্রমন করলে ওই ঘনো শরবনের মাঝে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই শ খানিক হাত পিছিয়ে এসে খুঁজতে লাগলাম এমন কোন স্থান, যেখানে বাঘটাকে দেখা সহজ হয়, এবং বাঘটাও যাতে আমর সাড়া না পায়।

সৌভাগ্যবশতঃ একটা নালা আমার নজরে এল। নালাটা মোটামুটি উত্তর পশ্চিম থেকে উত্তর পূবে কল্যাণী নদীর দিকে এগিয়ে গেছে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে নিঃশব্দে কিছুটা

এগিয়ে যেতে মনে হলো আমি সেই ঝোপের কাছে চলে এসেছি। কয়েক হাত তফাতে সামনে একটা তেঁতুল গাছ, আমি গুটি গুটি এসে তেঁতুলের ডালের আড়ালে নিজেকে আত্মগোপন করলাম। উঠে গেলাম কিছুটা উপরে যাতে ঝোপটা ভালভাবে দেখা যায়। কিন্তু বৃথাই সব। কিছুই দেখতে পেলাম না এমন কি বাঘটি যে নিচু ডালে বসে ছিল সেটাও না কেননা সেটা ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তাই বুঝতে পারলাম না বাঘটা আছে না নেই।

যদি বনের অন্যান্য জন্তুদের চলা ফেরা থেকে বোঝা যায় বাঘটা বেরিয়েছে কিনা। এই আশায় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

সূর্য এখন অনেকটা উপরে, তাই ভাবলাম বাঘটা তার গুরু ভোজনের পর নিশ্চই উম্বালমেরুর কোন জলাশয়ে জল খেতে যাবে— –হঠাৎ একটা লঙ্গুর বানর চিৎকার করে ওঠে———এল-খা খা—আ-আঘ———খার———খার———এটা একটা সাবধানী ডাক। প্রায় শ-খানেক গজ দূরে। সাথে আবার স্ত্রী লঙ্গুর চি-চিক—চি, চিক্।

বোঝা গেল বাঘটা বেরিয়েছে। আর ওই পাহারাদার বাঁদরটার চোখে সেই বাঘটা নজরে এসেছে।

॥ তিন ॥

যে সব পাঠক ভারতীয় জঙ্গলের সাথে পরিচিত, তাঁরা নিশ্চই জানেন, এই লঙ্গুর বানরের কি রকম বুদ্ধি——যাঁদের জানা নেই, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি বানর গাছের ডালে ডালে বিচরমান এই কালো কালো মুখ, লম্বা লেজ বিশিষ্ট ছাই রঙের বিরাট জন্তুগুলো দল বেঁধে জঙ্গলে থাকে তাদের খাদ্য বলতে কয়েক রকম গাছের পাতা আর বুনো ফল ছাড়াও এদের প্রিয় কয়েক রকমের পোকা মাকড়। বাঁনরদের মাংস বাঘ চিতাদের খুব প্রিয়। তাই এই বানররা সব সময় গাছের উঁচু ডালে বসে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখে।

এদের কাছে মানুষের সতর্ক হওয়ার শিক্ষা নিলে ভাল হয়।

কেননা এরা যতক্ষণ পাহারা দেয় ততক্ষণ এরা খাওয়া দাওয়া পরোয়া করে না। এবং নজর সব সময় পাহারার কাজে। এক একজন ভাগ করে এই কাজে নিযুক্ত। তারা জানে তার উপর নির্ভর করছে দলের অন্য সব বাচ্চা ও মেয়েরা। তাই তাকে দেখা যাবে সবচেয়ে বড় গাছের মগডালে বসে চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ রাখছে। সামান্য কিছুও তার দৃষ্টি থেকে এড়াবার উপায় নেই। আরেকজন এসে যতক্ষণ না তাকে রিলিফ দিচ্ছে, তখন সে খাওয়া দাওয়া মায় নিজের কথা পর্য্যন্ত ভুলে যায়।

যখন এরা খেলা করে তখন এরা বহুবার হুম্প—হুম্প করে ডেকে ওঠে কিন্তু বিপদে এদের ডাক বদলে যায়। সবাই তখন সতর্ক হয়, আর গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে যায়।

এদিকে বাঘেরাও তখন বিকল্প পন্থা নেয়। কেননা ওকে তো খাদ্য বাঁচাতে হবে। বাঘ যখন বুঝলো ওরা সতর্কের ধ্বনি করছে তখন যে সবচেয়ে কাছে গাছের কাছে ছুটে যায়, যাতে কিছু বানররা আশ্রয় নিয়েছে। কাছে গিয়ে বিরাট গর্জন আর লম্ফ-ঝম্ফ করতে থাকে।

বানররা ভাবে এই বুঝি গাছে উঠে এলো——ওরা যদি চুপচাপ সেই উঁচুডালে বসে থাকে তাহলে কিছু হয় না, কিন্তু তা না করে অকল্পিত ভাবনা ভয় নিয়ে——আরো উঁচু কিংবা অন্য গাছে যাবার জন্য ঘাবড়িয়ে গিয়ে লাফালাফি করতে থাকে ফলে দুয়েকটি ডাল ফসকে নিচে——আর তখনই বাঘ বা চিতারা তাদের সদব্যবহার করতে বিলম্ব করে না।

যাই হোক আমি প্রসঙ্গ ছেড়ে এসেছি আবার ফিরে যাই তেতুঁল গাছের কাছে।

গাছ থেকে নেমে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে যেদিক থেকে বানরের চিৎকার আসছিল। সেদিকে কোণাকুনি ভাবে এগিয়ে গেলাম।

বাঘটার ভোজনটা ভালই হয়েছিল তাই সে লঙ্গুর বানরের দিকে থাবা বাড়াবে না। এখন হয়ত জলাশয়ের দিকে যাবে বা গেছে যা দেখে বানরটা চিৎকার করে উঠেছিল।

আমি এগোচ্ছিলাম কিন্তু কাঁটা ঝোপের জন্য আমার গতি শ্লথ হয়ে পড়ছিল—

তবুও আধ ফার্লং মত এগিয়ে গেলাম একটা বুনো তুলো গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে লঙ্গুরটাকে দেখলাম। সেও আমাকে দেখল। হয়ত ভাবছে এখন তাকে দুটো শত্রুর দিকে নজর রাখতে হবে। আমি জানি ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করলেই বাঘের অবস্থিতিটা জানতে পারবো। তাই বানরটাকে জ্বালাতন না করে লম্বা ঘন ঘাস বনে নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লঙ্গুরটা সত্যিই দুটো শত্রুকে লক্ষ রাখছে, তার মধ্যে আমিও ——মাঝে মাঝে সেই সাবধানী চিৎকার——ওর দৃষ্টি থেকে বুঝলাম বাঘটা শ দুয়েক হাত দূরে আছে।

পায়েঁ ভর করে দেহটা অর্ধেক দুমড়ে আন্দাজ করে বাঘ যেদিকে আছে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

এতে লঙ্গুরটা পড়ল ফ্যাসাদে, সে বুঝতে পাড়ল না আমি বাঘটাকে

আক্রমণ করতে যাচ্ছি না অন্য কোন দলের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ফলে তার সাবধানী চিৎকার আরো চৌ-গুণ হল।

চিৎকারে বিরক্ত হলাম, কেননা বাঘটাও হয়তো সে ডাক শুনছে—হয়তো, এ থেকে সেও ধরে নেবে—কোন নূতন ঘটনা ঘটতে চলেছে, যা নিজের ও বানরগুলোর পক্ষেও বিপজ্জনক।

যা আন্দাজ করলাম তাই ঘটল। তাই যত শীঘ্র পারি দ্রুত এগিয়ে গেলাম তৃশ হাত। তারপর আরো পঞ্চাশ হাত হিসাব করে এগিয়ে দেখলাম মনে হচ্ছে আমি বাঘটির বেশ কাছেই এসে গেছি। আমায় আরো সাবধান হতে হবে। চকিতে একবার বানরটার দিকে তাকালাম, দেখলাম তার দৃষ্টি এক জায়গায় নিবদ্ধ—অর্থাৎ আমি ও বাঘ প্রায় একই কেন্দ্র বিন্দুতে।

আমি নিশ্চল অবস্থায় চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। যতদুর চোখ যায় শুধু কাঁটাঝোপ আর তিন চার ফুট লম্বা সর বন হাত ত্রিশেক দূরে একটু বাঁয়ে হঠাৎ ঘাস নড়ে উঠল। একটু ভালো ভাবে দেখব বলে যেই একটু মাথাটা তুলেছি অমনি বাঘটা আমায় দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি গম্ভীর অথচ অনুচ্চ শব্দ করে দু লাফে বনের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

তাকে অনুসরণ করা বৃথা এবং বিপজ্জনক। একবার যখন ও আমায় দেখেছে এবং অনুসরণ করছি জেনেছে, পিছন থেকে আকস্মিক আক্রমণ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ করে গুড়ি মেরে ঝোপের দিকে এগোলাম। আমি জানি শিকারটা এখানেই আছে। যা ভেবেছি ঠিক তাই। সম্পূর্ণটা যায়নি। লতা পাতার আড়ালে এমন ভাবে আছে যাতে শকুনের দৃষ্টি না পড়ে। আমার সৌভাগ্য বাঘটা যেখানে আছে, তার আগে একটা আমগাছ সেখান থেকে স্পষ্ট নজরে আসে।

এবার আমায় স্থির করতে হবে আমার কর্তব্য। আমাকে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও বাঘটা হয়তো ফিরে আসবে তার শিকারের

কাছে ; সুতরাং তারজন্য আমি যদি প্রস্তুত না থাকি। তবে সুযোগটি নষ্ট হতে পারে।

এদিকে রাত জাগার কোন উপযোগী ব্যবস্থাও নেই। টর্চ কম্বল কিংবা রাতের খাবার কিছু নেই। আবার যোগাড় করতে গেলেও সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা চাঁদ বিহীন আকাশ পথকে করেছে অন্ধকার। আর সেই নিকষ কালো অন্ধকারে পথ চিনে আমার গাড়ি যেখানে অর্থাৎ পুলিবস্তুতে যাওয়া অসম্ভব। এছাড়া বাঘের কবলে পড়ারও ভয় আছে। আবার রয়ে গেলে রাত্রে বাস বনে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার কোন পোষাকও নেই।

একবার ভাবলাম যাই জিনিষগুলো গাড়ি থেকে নিয়ে আসি। কিন্তু চার/চার মাইল আসা যাওয়া পথে হয়ত বাঘটা তার শিকার নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে।

অবশেষে ঠিক করলাম হোক গে গাছে থেকেই যাবো। গাছে অন্য একটি ডালে চেপে বসলাম কোনের ডালটায় ভর দিয়ে আরামে বসা যাবে। জুতোটি খুলে ভারতীয়দের মত পা দুটো মুড়ে সামনের একটি ডালের উপর রাইফেলটি ভর রেখে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। এখান থেকে শিকারটি ভাল ভাবেই দেখা যাবে। পরে একটা ডাল বাধা সৃষ্টি করছে। তারপরে আরেকটি ডালের বাধা। তারপর আমার ডান কাঁধের উপরে সামান্য ফাঁক দিয়ে একটু দেখা যাচ্ছে বটে ; কিন্তু সেই ফাঁক দিয়ে গুলি করা যায় না। পরের ডালটা যেটাতে হেলান দিয়ে বসেছি ফলে পেছনে কিছুই দেখতে পারছি না।

অবশ্য পনেরো ফুট মাটি থেকে উঁচুতে যেখানে বসে আছি। বাঘ সেখানে লাফ দিয়ে ছুঁতে পারবে না। এছাড়া আমার কাছে পৌঁছুতে গেলে তাকে গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটি পার হতে হবে। আর তখনই সে আমার বন্দুকের নলের সামনে পড়বে।

আমি যখন পাহারায় বসলাম তখন বেলা সাড়ে বারোটা। মনে হল শিকারী জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর প্রহরায় নিযুক্ত হলাম।

সন্ধ্যে পর্যন্ত যে ভাবে কাটল ভাবনার নয়।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটা। পাখিরা ফিরে গেল তাদের নীড়ে। আর ওই বানরগুলো মানুষ ও বাঘ দুই শত্রুর সান্নিধ্য থেকে অনেক আগেই চলে গেছে।

এক আমি, মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির ডাক ---অন্ধকার আরো গভীর হয়। নিচে কোথাও থেকে একটি পাখি বসে কু-কু করে ডেকে চলেছে।

ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। যারা ভারতের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তারাই এমন অভিজ্ঞতা কখনও কখনও পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন ভাবে ও বুনো লোকদের কাছে জেনেছি, বিশেষ বিশেষ কোন কোন স্থানে বাঘেরা পুরুষ সম্বরের ডাক নকল করে ডাকে। যাতে অন্য কোন সম্বর বিশেষ করে স্ত্রী সম্বর নিকটে আসে।

প্রথমে গল্প মনে করে অবিশ্বাস করতাম, তাছাড়া সেরকম কোন অভিজ্ঞতাও লাভ করিনি।

সেদিন সন্ধ্যা পৌনে সাতটা হবে, একটি সম্বরের ডাক শোনা গেল। যে ঝোপটি থেকে শব্দটি আসছে সেই ঝোপটি তখনও অন্ধকারে মিলিয়ে যায় নি। ডাকটি একটি ঘণ্টা বেশীর মত শোনাতে থাকে।

যে ডালটির উপর রাইফেলটা ভর করে রেখেছি সেই ডাল আর তার ঠিক ডান দিকের ডাল এই দুটির মধ্যে সেই জায়গা—হঠাৎ বাঘটাকে দেখা গেল। একই ঝোপে বাঘ আর সম্বর—অসম্ভব! তেমন যদি হতো একটা পালানর শব্দ শোনা যেত। বাঘটি যখন ঝোপ থেকে ফাঁকায় বেরিয়ে এলো তখন একবারের জন্যই ডাকটি শোনা গিয়েছিল। সুতরাং ওটা যে বাঘটিই করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অমন ভাবে শব্দ করতে গেল কেন? এটা একটা রহস্য। কেননা বাঘটি তখন কোন শিকারের খোঁজে ছিল না, সকালের

দিকে সামান্য খাবার পর আবার এখন খেতেই এসেছে। সুতরাং সম্বরের ডাক নকল করে শিকার ডেকে আনারই ফন্দি ছিলনা। কিন্তু ব্যাপারটি কি ঘটলো এবং আমি কি দেখলাম সেটাই শুধু আমি ব্যক্ত করছি।

যে ঝোপটা থেকে বাঘটি বেরিয়ে এল, সেখানে কোন সম্বর ছিল না। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। বাকিটুকু পাঠকরা আন্দাজ করে নিন। আমি শুধু বলব নিজের কানে ঐ ডাক শুনে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম বাঘের অনুকরণ ক্ষমতা আছে।

বাঘটি এগিয়ে গেল টোপের কাছে। সামনের ডালের আড়াল থেকেই আমি সেই সুযোগে রাইফেলটি তাক করলাম।

বাঘটি আবার আমার বাঁদিকে এল। টোপটিকে মুখে তুলল— আমার প্রথম গুলি বিদ্ধ হলো তার বাঁ কাধের পেছনে .. বাঘটি পাক খেতে দ্বিতীয় গুলিটি বিদ্ধ হল তার ঘাড়ে। ব্যাস ··সুরু হলো··· ছটপটানি তারপর ধীরে ধীরে সে নির্জীব হয়ে পরল।

বাঘটি মারা গেছে, অতএব এখন হেঁটে মোটর গাড়ি পর্যন্ত যেতে কোন ভয় নেই, কিন্তু অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাব ত। মনের মধ্যে অনেক সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন উঠল। গাছের উপর এই ভাবে ঠাণ্ডায় খালি পেটে বসে থাকার চেয়ে নেমে যাওয়াই বুদ্ধি মানের কাজ।

নেমেও গেলাম গাছ থেকে। বাঘটির কাছে পরে গেলাম, শুরু করলাম কল্যাণী নদীর দিকে যেতে···যাতে আরো অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পৌছে যেতে পারি; আমার বিশ্বাস শুকনো নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতেও আমি আমার গন্তব্যস্থানে পৌছুতে পারব। অবশ্য নদীর আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছ-ছটা মাইল পেরোতে হবে আমার গাড়ীর কাছে যেতে। অন্য পথে কম সময়ে যেতে গেলে, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে পারি। ফলে সারাটা রাত হয়ত বনেই কাটাতে হবে।

নীরস পাথুরে বুকটি মেলে দিয়ে কল্যাণী। এই অন্ধকারে তার উপর দিয়ে চলা একটি দুঃস্বপ্নের সামিল....ছড়ানো নুড়িগুলো কতবার যে আমার পায়ের তলায় গড়িয়ে গেল···কতবার যে অদৃশ্য গাছের গুড়িতে লেগে হাঁটুর নিচেটা ছড়ে গেল···একবার ত পাটি মচকাতে মচকাতে বেঁচে গেল। একটি পাথর থেকে আরেকটি পাথরে লাফাতে গিয়ে একটুর জন্য পাটা বেঁচে গেল। বন্দুকটিকে বাঁচাবার জন্য সেটি উঁচু করে ধরে চলতে গিয়ে দুবার আছাড়ও খেলাম। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চলতে হচ্ছে। এই ভাবে প্রায় রাত সোয়া এগারটা নাগাদ পুলিবমুর গাড়িতে উঠে বসলাম। প্রায় চার-চারটি ঘণ্টা ও কল্যানীর বুকের পাথর আর গুঁড়ির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

সবাই ভাবছেন ঐ নরখাদকটাকে হত্যা করে আমি খুব গর্বিত। কিন্তু সেটা ভুল; কেননা কতকগুলো ব্যাপার আমার মনে জমতে জমতে ঐ সাফল্য সম্বন্ধে সন্ধিহান করে তুলল। এক নরখাদকটি আমার টোপ খেয়েছে। দুই ওকে দেখতে পাবার পরেও ও টোপটার উপরে আটার মত লেগে ছিল। পরে যখন ও সরে যায়, আমি তার পেছনে লাগি। তিন. আমার অস্তিত্ব জানতে পেরেই ও পালায়। চার. কিন্তু আবার সে ফিরে আসে। শেষ পাঁচ নম্বর, নিখুঁত ভাবে সে সম্বরের ডাক ডেকে ওঠে।

সব ঘটনাগুলো এক সাথে নিয়ে আলাদা অলাদা ভাবে বিচার করলে, দেখা যাবে যে, নরখাদক বা মানুষখেকো বাঘ নয়, বরং তাকে সাধারণ শিকারী বাঘ বললেই ভাল হয়। এই যত চিন্তা করি, সন্দেহটা ততই প্রবল হয়ে ওঠে মনে।

কল্যাণীর বুকের ওপর দিয়ে চারিদিকে দেখে শুনে চলার পথে অন্য চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। আদৌ আমার মনে হয় নি, আমি এখন আসল মানুষ খেকোর আওতায়। অবশ্য তাতে ভালই হয়েছে। কেননা ওই চলার পথে অখণ্ড মনোযোগটা ব্যাহত হত।

পরদিন লোকজন নিয়ে গিয়ে বাঘটাকে তুলে নিয়ে এলাম।

তার চামড়া ছাড়িয়ে নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, বাঘটি পূর্ণ বয়স্ক, নিখুঁত গড়ন। সুন্দর তার চামড়া——সবাই যখন মানুষ খেকোর অবসানে নৃত্যরত, আমি তখন ভাবছি আসল মানুষ খেকোর কথা। সে তো বহাল তবিয়তেই আছে।

ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে সেদিন সন্ধ্যায় রওনা হয়ে চিত্তুরের কালেক্টরের বাড়িতে রাতটা কাটালাম। আমার সন্দেহের কথা তাকে জানিয়ে বললাম যদি কোন মানুষ তার কবলে পড়ে, তবে আমাকে যেন টেলিগ্রাম করা হয়।

টেলিগ্রাম এলও ঠিক এগারো দিনে ঘটনাস্থান, নাগাপাতলা থেকে মাইল খানেকের মধ্যে চামালা উপত্যকার কাছেই একটা জঙ্গলের ধার। একটা মেয়ে ঘাস কাটছিল। তাকে বাঘটি নিয়ে গেছে।

তাই আমি নিঃসন্দেহ হলাম, মানুষ খেকো বাঘটা এখনও জীবিত।

পরদিন সকালেই যাত্রা করলাম নাগাপাতলায়। বন বাঙলোতে এলাম সন্ধ্যে নাগাদ।

পরদিন গেলাম ঘটনাস্থলে। মেয়েটিকে যেখান থেকে বাঘটা উঠিয়ে নিয়ে গেছে সেখানে তখনও অনেক কাটা ঘাস পড়ে ছিল। ——হয়ত বেঁধে নেবে সেই মুহূর্তে বাঘটা এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে——মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে—হুশো হাত দূরে আরেকটি মেয়ে ঘাস কাটছিল, হঠাৎ চিৎকার শুনে সেদিকে তাকাতেই দেখল বাঘটি তার সঙ্গীকে মুখে করে বনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে গেল নাগাপাতলায় খবর দিতে। দেখতে দেখতে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল রঙ্গমপেট থেকে চন্দ্রগিরি ——সেখান থেকে আবার চিত্তুরের কালেক্টরের কাছে। তার টেলিগ্রাম পেয়েই আমরা ছুটে আসব।

মেয়েলোকটাকে বাঘে নিয়ে যাবার পর তিন দিনের মধ্যে কোন খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেন নি।

কঠিন মাটিতে কোন থাবার দাগও দেখা গেল না। অর্ধবৃত্তাকারে আমরা অনুসন্ধান করতে করতে কিছুটা এগিয়ে তার শাড়িটা পেলাম, সেটা দেহ থেকে খসে গিয়ে পড়ে ছিল প্রায় সিকি মাইল দূরে।

রক্তের কোন দাগ পেলাম না। তাতেই অনুমান করা গেল বাঘটি তার টুঁটি কামড়ে ধরে ছিল—সে কামড় একটুও আলগা হয়নি, কেননা সেই প্রথম আর্ত চিৎকারের পর তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয়নি। অনেক খুঁজেও দেহের কোন অংশের দেখা পাইনি।

ফিরে এলাম গ্রামে। মোষ তিনটেকে নিয়ে প্রথমটিকে রাখলাম চার নম্বর মাইলষ্টোনের কাছে দ্বিতীয়টিকে পুলিবন্নুতে তৃতীয়টিকে নাগাপাত্তলার মাইল দুই দূরে সেই কল্যাণী নদীর বুকে যেখান থেকে চাষ আবাদের জমি সুরু হয়েছে।

কিন্তু সকালে গিয়ে দেখলাম, তিনটে মোষের এতটুকু গায়ে আঁচড় লাগেনি। কিন্তু পুলিবন্নুর জঙ্গলের পথে বাঘের থাবার দাগ দেখা গেল তিন নম্বর মাইলষ্টোনের কাছে এসে বাঘটি পথে উঠেছে, পরে চার নম্বর মাইল ষ্টোনের কাছে রাখা মোষটাকে এড়িয়ে ছয়মাইল ষ্টোনের বরাবর পুলিবন্নুর কিছুটা আগেই পথ ছেড়ে পূর্ব দিকে ঘুড়ে পাথুরে পাহাড়ের দিকে হাঁটা দিয়েছে অথচ মোষটাকে সে এতটুকু স্পর্শ করেনি।

থাবার দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটা মোষটার খুব কাছ দিয়ে গেছে, বাঘটির থাবার দাগ ও গভীরতা দেখে বোঝা গেল সে যথার্থই সুস্থ ও সবল।

এরকম ব্যবহার মানুষ খেকোর বাঘেরই স্বাভাবিক। তাই আমি নিশ্চিত ও আনন্দিত হলাম যে, আমি শেষ পর্যন্ত আসল বাঘটারই সন্ধান পেতে চলেছি।

বাঘটি বাঁদর পাহাড়ের দিকে গেছে। অর্থাৎ হয় সে জঙ্গলের কোন ঢালুতে লুকিয়ে আছে নচেৎ সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে

গুণ্ডালপেণ্ট। আর উম্বালমেরুর পথে আরো অনেক দূরে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

অর্থাৎ বাঘটি যেদিকেই যাক, রাত্রে যে ফিরে আসবে সে বিষয়ে কোন সম্ভাবনা নেই।

সামনে পূর্ণিমা আসছে, অতএব আকাশে চাঁদের রূপালী আলো মর্ত্তের মাটিতে পড়বে।

ঠিক করলাম বাঘটাকে এই পথের উপরেই আক্রমন করব।

চার নম্বর মাইলষ্টোনের থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি বিরাট সেগুন গাছ ছিল। গুঁড়িটা আরও সাধারণ গাছের মতোই সোজা বেস খানিকটা উঠে গিয়ে তবে ডাল পালা মেলেছে। সে গুঁড়ি বেয়ে গাছে ওঠা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু গাছটির গুড়িতে হেলান দিয়ে বসলে টোপসহ পথের চারিদিকে একশ গজ বৃত্তাকারে নজরের মধ্যে আসে। কেননা বছর খানেক আগে হঠাৎ এক অগ্নি কাণ্ডে এ অঞ্চলের অনেক ঝোপঝাড় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আমি বেলা পাঁচটা নাগাদ যথাস্থানে ঘাঁটি স্থাপন করলাম।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। পূর্বের গাছপালার উপরে রূপালী চাঁদের আলো ঠিকরে পড়লো!

দিনের বেলাতে মনে হয়েছিল ঘাঁটিটা নিরাপদ। কিন্তু রাত্রি হতেই একটা ভীতি এসে আমায় আঁকড়ে ধরল! বার বার মনে হতে লাগল এই বুঝি বাঘটি এসে আমায় আক্রমণ করল - শুরু হলো বুদ্ধির যুদ্ধ। বুদ্ধির জয় হলো। ভেবে দেখলাম ওরকমভাবে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, যদি ধরে নিই বাঘটি আমায় দেখতে পায়নি।

বাঘের কোন ঘ্রাণশক্তি নেই। কিন্তু শব্দেতে ওরা সর্তক হয়। তাই নিজেকে নিঃশব্দ নিস্পন্দ করে বসে রইলাম। ধূমপান করাও না। শেষ রাতে যাতে ঠাণ্ডা লাগে তার প্রস্তুতি ও আজ নিয়ে চলবে এসেছিলাম।

পরে মনে হল বাঘটি কাছে পিঠে কোথাও নেই। কেননা বনটি সেদিন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ভরা ছিল।

যা ভাবলাম তাই, শেষ রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল। তেমনি প্রচণ্ড শিশির পড়ার ফলে জামাকাপড় গুলোও ভিজে গিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল বন্দুকের নল দিয়েও গড়াতে লাগল শিশির।

মোষের বাচ্চাটিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম সে কেমন ভাবে পরিস্থিতিটাকে নিচ্ছে। ওর জন্য রাখা ঘাসগুলো চিবিয়েই ও রাতটা কাটিয়ে দিল। কিন্তু রাতের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সে মাটীতে শরীর এলিয়ে দিল। হয়ত ঠাণ্ডার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য।

ভোর হতেই চার মাইল দূরে নাগাপতলার দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে স্নান সেরে প্রাতঃরাশ পব সেরে নিলাম। তারপর লম্বা একটা ঘুম. ঘুম যখন ভাঙল শরীরে তখন এতটুকু ক্লান্তি নেই এবার আমি নতুন প্রাণ শক্তিতে ভরপুর।

গাড়ি করে পুলিবন্নুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি. মাড-গার্ডের উপর তুজন গাইড চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে করতে চলেছে। কিন্তু দেখলাম গতরাত্রে বাঘটা এপথে পা মাড়ায় নি।

পুলিবন্নু গিয়ে আমরা কল্যাণীর তুধারেও বেশ কিছুটা দেখলাম, পুলের উত্তর পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব দিকে মাইল খানেক দেখলাম, কিন্তু কোন খাবার দাগ দেখতে পেলাম না।

তুপুরবেলা আবার পুলিবন্নুতে ফিরে বনের ইঁদারার গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে আগামী কর্মসূচী ঠিক করলাম

আমি যেখানে বসে আছি. কল্যাণীর অপর পারেই সিকি মাইল দূরে একটা তেঁতুল গাছ। গাছটার কাছ থেকে জঙ্গলের রাস্তাটা. তুভাগ হয়ে গেছে, জায়গাটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। একটা রাস্তা গেছে পুলিবন্নুর দিকে। আরেকটা উত্তর-পূবে উদ্বালমেরুর দিকে।

লোক মুখে শুনেছি এই গাছটা থেকে নাকি ইতিমধ্যে অনেক বাঘকে যমের দুয়ারে পাঠান হয়েছে। আর আমিও দেড় বছর আগে এই গাছে চড়েই একটা চিতা মেরেছিলাম।

অবশেষে ঠিক করলাম যে কটাদিন চাঁদের আলো পাওয়া যাবে, এই গাছের উপর বসেই কাটাব। মাটীতে থেকে অযথা বিপদের ঝুঁকি ডেকে এনে লাভ নেই।

মতলবটা মনে আসতেই, দুজন লোককে সেই ডালটায় একটা মাচা বানাতে বললাম, যে ডালটায় এর আগে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

ওরা মাচা তৈরীর কাজে লেগে গেল, আমি সেই অবসরে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। তিরিশ মিনিট পরে ওরা আমায় জাগিয়ে দিয়ে বাকি কাজটা শেষ করল।

আমার ষ্টুডিবেকারের মধ্যে একটা ভাঁজ করা চারপাই সবসময় রেখে দিতাম। কেননা ভাল মাচা তৈরী করতে বেশ সুবিধে।

জিনিসটা বেশ হালকা। অথচ বেশ মজবুত নড়লে চড়লে কোন শব্দ হয় না। ব্যবহার করতেও বেশ আরামপ্রদ। সবচেয়ে যেটা সুবিধার সেটা হচ্ছে যে কোন গাছের ডালে সহজেই পাতার আড়ালে লুকিয়ে ফেলা যায়।

সেই চারপাইটাকে দুটো ডালের উপর বেশ শক্ত করে বেঁধে ডাল পালা দিয়ে ভাল করে আড়াল করে দেওয়া হল। যাতে আমাকে দেখা না যায়। একটু ফাঁক রাখা হলো যাতে নিচে যেখানে রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়েছে সেখানে এবং পুলিবন্দু ও উম্বাল মেরুর দুদিকে একশ গজ পর্যন্ত ভালভাবে দেখা যায়। কোন দিকেও একটা ফাঁক রাখলাম যেখান থেকে নাগাপতলার পথের দু-শো গজ লক্ষ করা যায়।

ব্যবস্থাটা ভালভাবে নিরীক্ষণ করে ওদের নিয়ে নাগাপাত্তলায় ফিরে এলাম।

বেশ ভালভাবে খাওয়া দাওয়া সেরে বিকাল চারটে পর্যন্ত একটা ঘুম দিয়ে নিলাম।

॥ চার ॥

ঘুম ভাঙতে বন্দুক টর্চ জলের বোতল কম্বল কিছু স্যাণ্ডউইচ আর ফ্লাস্কে চা ভর্তি করে পুলিবন্নতে ফিরে চললাম। ইঁদারার পাশে একটা ঝোপের ধারে গাড়িটা রেখে ছটার আগেই মাচায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

বেশ শান্ত ভাবেই কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল।

রাত এখন এগারটা। উম্বালমেরুর দিক থেকে একটা চিতা-বাঘের করাত ঘষার শব্দ কানে এলো। শব্দটি এমন ঠিক কেউ যেন করাত দিয়ে কাঠ চিরছে। যা চিতার ডাকের সাথে হুবহু মিলে যায়।

পথটা যেখানটায় বেঁকে গেছে। সেখানটায় চিতাটাকে দেখা গেল। বিরাট চিতাটার গায়ে ডোরাগুলো চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল।

সে এগিয়ে এল গাছটার কাছে। তারপর পথটি পার হয়ে অপর পারের বনের মধ্যে অদৃশ্য হল।

আমি শুধু চেয়ে রইলাম, পাছে গুলি ছুঁড়লে শব্দে আসল বাঘটি পালিয়ে যায়।

এছাড়া সে রাত্রে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না।

পরের রাত্রিটাও একবারে মামুলি ধরণের, না কোন শব্দ না কোন কিছুর অস্তিত্ব।

এর পরদিন নাগাপাতলায় ফিরে এসে সবে একটু ঘুমিয়েছি, এমন সময় তখন বেলা দশটা নাগাদ হবে, একজন এসে খবর দিল যে মাত্র আধঘণ্টা আগে বাঘটি একটি রাখাল ছেলেকে হত্যা করেছে।

দেরী না করে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে, শোকার্ত ভাই আর কিছু লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পুলিবন্থুর রাস্তায় পেছনে একঘণ্টা চলার পর ডান দিকে ঘুরে কিছুটা এগোতেই কল্যাণীনদীর ধারে উপস্থিত হলাম।

এর কাছাকাছিই রাখালটা মোষ চরাচ্ছিল। বাঘটি ঝোপের ভিতর থেকে তার ওপর লাফ দিতেই রাখালটা চিৎকার করে ওঠে। ওর ভাই কাছাকাছিই অন্যান্য মোষদের তদারকি করছিল। তার ভাই স্পষ্ট দেখল, বাঘটা তার কাঁধে কামড় দিয়ে ঝোপের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। কাঁধে কামড় বসানতে সে যতক্ষণ পারে চীৎকার করছিল। ভাইটি তখন দৌড়ে যায় খবর দিতে।

ঘটনাস্থলে এসে ঝোপটীর কাছে এগিয়ে গেলাম। লুটিয়ে পড়া গাছগুলো দেখে অনুমান করা গেল কোথা থেকে বাঘটা আবির্ভাব হয়েছিল। আর যে পথে সে রাখালটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে পথটি অনেক বেশি পরিষ্কার।

পাগড়িটি পাওয়া গেল একটী ঝোপের মধ্যে। সেখান থেকে আমরা কল্যাণীর বুকের উপর এলাম।

রাখালটা ছটপট বা বাঁচবার জন্য ধস্তাধস্তি করেছিল। তাই বাঘটা তাকে এখনে রেখে কাঁধ ছেড়ে গলা কামড়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে এখান থেকে একটি রক্তের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাখালটাকে টেনে নিয়ে যাবার সময় তার পাটা মাটিতে ঘষরাতে ঘষরাতে গিয়েছিল। দাগ ধরে ঘন বনের মধ্যে ঢুকে দেখলাম। সেখান থেকে বাঘটি তাকে টেনে নিয়ে কিছু দূরে একটি ঘাস জমিতে পৌছয়। ফলে ঘন ঘাসগুলো মাথা গুলো নুইয়ে পড়েছিল।

এরপর আমরা একটা ছোট টিবির উপর উঠলাম। তার পরেই জায়গাটা বেশ নিচু হয়ে একটি ছোট নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

নদীটি এদিক ওদিক ঘুরে কল্যাণীর সাথেই মিশেছে।

অনুমান করলাম এই নদীরই কোন গুপ্ত খাদে বাঘটা তার

শিকারের সদগতি করছে। তবে দেখলাম এই চিহ্ন ধরে সোজা নদী পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া কোন লাভ নেই। কেননা যত সাবধানেই এগোই না কেন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে গেলে একটু শব্দ হবেই। এবং সেই শব্দে বাঘটি সাবধান হয়ে যাবে।

এই সময় এই মানুষ খেকোর,.আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাছাড়া ওর আত্মগোপন করারও ওখানে পূর্ণ সুযোগ আছে। ও যদি চায় তবে শিকার মুখে নিয়ে পালাতে পারে, আবার শিকারকে পাশে রেখে যুদ্ধ ও করতে পারে।

আবার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পাশ থেকে কিংবা পিছন থেকে লাফিয়ে পড়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

এই অবস্থাটি তাড়াতাড়ি একটু বুঝে নিয়ে ঠিক করলাম; ডান দিকে কোণাকুনিভাবে কিছুটা এগিয়ে কল্যাণীর বুকে নেমে পড়ব। সেখানে নরম জমিতে চলার কোন শব্দ হবে না। এভাবে এগিয়ে গেলে আমি হয়ত হঠাৎ করে বাঘটাকে আহারত অবস্থায় দেখতে পারব। তাই আমি তখন পিছনে সরে এসে ছোট টিপিটা পেরিয়ে খুব সাবধানে নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম। যাতে নালার কাছ থেকে আমায় লক্ষ করা না যায়।

এইভাবে কিছুটা চলে আবার টিবির উপরে এসে নদীর পথ ধরে সিকি মাইল মত এগিয়ে নদীর ধারে এলাম। এখানে নরম জমিতে একটু দম নিয়ে তারপর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে নরম বালির উপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। যতটা পারি দু পাশের ঝোপ ঝাড় এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

সেদিনের সেই পথ চলা আমার আ-জীবন মনে থাকবে। নদী কোথাও আট দশ গজ আবার কোথাও বা ত্রিশ গজ চওড়া। তবে এর বেশি কোথাও নেই।

বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে খুব আস্তে আস্তে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ

দৃষ্টি রেখে দু পাশের সমস্ত ঝোপঝাড় যতটা পারি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুঁটিয়ে দেখে এগিয়ে চলেছি।

কখনও থেমে গিয়ে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছি। কিন্তু বনরাশীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করার মত কোন শব্দই কানে এলো না।

চারিদিকে কেমন একটি গভীর নিস্তব্ধতা কোন মৃত নগরীর স্তব্ধতা মনে করিয়ে দেয়।

সেই মুহূর্তে আমি সামান্য একটু পতঙ্গের গুঞ্জনে, একটি পাখির একটি ডাক বা এতটুকু কোন কিছু শব্দ শোনার জন্য অস্থীর হয়ে উঠলাম কিন্তু আমায় হতাশ হতে হলো।

সমস্ত অরণ্য নগরীর মাঝে শুধু একটী শব্দই কানে আসত। সেটা আমার নিজের পা ফেলার সাবধানি শব্দ।

এভাবে হয়ত কালং অবধি এগিয়ে গেছি। সেই সময় পথটা নদীর বাঁ দিকে মোর নিল। আমি মোন ঘোরার আগেই থেমে গিয়ে কানটাকে আরো সজাগ করলাম।

আর থেমেছিলাম বলেই আমার সৌভাগ্যে স্পষ্ট দেখলাম বাঘটি কোন সাড়া না দিয়ে শিকারটীকে পিঠে নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আমি চমকে উঠলাম, বাঘটীও বাঘটী নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল কেউ তার পিছনে লেগেছে। তাই শিকারটাকে না খেয়ে নদীর রাস্তায় কিছুটা নেমে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল——আর আমি? এত সাবধানে এগোবার পরেও যে বাঘটী আমায় টের পাবে ভাবতে পারিনি।

এক মুহূর্ত উভয়েই নিথর নিস্পন্দ। স্থির হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে উভয় উভয়কে দেখছে।

তারপর বাঘটী তার শিকারকে সামনে রেখে দিয়ে সামনের পা দুটোর মাথাটা, মাথাটী রেখে পেছনের পা দুটো ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ল্যাজটা খাড়া করে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সারা শরীরটা টান টান করে

দাঁড়াল—ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বন্দুকটা মুখর হয়ে উঠল। প্রথম গুলিটা বিদ্ধ হল বাঘটার দু-চোখের মাঝখানের আধ ইঞ্চি নিচে।

এই সামান্য ভুলটা না হলে গুলিটি বাঘটার কপালের মাঝে বিদ্ধ হলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হত।

কিন্তু এর ফলে একটু বিপর্যয়ের সম্মুখিন হতে হল। গুলিটা লাগা মাত্র বাঘটা ঘড় ঘড় গর্জন করতে করতে শিকারটিকে লক্ষ্য করে মাতালের মত টলতে টলতে আমার দিকে প্রচণ্ড বেগে তেড়ে এল।

আমি সতর্কভাবে এক লাফে পাশে সরে গিয়ে তার মসৃণ গায়ে বন্দুকের সবগুলি গুলি নিঃশেষ করলাম।

বাঘটি লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে পড়ে ছটপট করতে থাকে। আর ক্ষতস্থান থেকে ঝরতে থাকে অবিরাম রক্ত ধারা...

কিন্তু সে দৃশ্য মনে হয় আমি বেশিক্ষণ দেখতে পাইনি—আমার মধ্যে কেমন যেন এক প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। সারা শরীরটা কেমন গুলিয়ে যেতে থাকে——অবশ হয়ে আসে দেহের সমস্ত অংশ। আমার মনে হল আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। নেহাৎ শরীরের স্বাস্থ্য মজবুত থাকায় সাথীদের কাছে ফিরে যেতে পেরেছিলাম।

তারা ছিল কল্যাণী নদীর প্রধান ধারার কাছে। বন্দুকের পাঁচটি গুলির শব্দই তারা শুনতে পেয়েছিল। তা থেকেই তারা ধরে নিয়েছিল আমার হাতে বাঘটির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল।

অনেকে হয়ত শুনে অবাক হবেন, গায়ের চামড়াটি ছাড়িয়ে নেবার আগে যখন ভালভাবে বাঘটাকে পরীক্ষা করলাম, তখন তার শরীরে কোথাও এতটুকু বিকৃতি অঙ্গের চিহ্ন খুঁজে পাইনি, যে জন্য ও মানুষ খেকো হয়ে উঠেছিল।

পূর্ণগঠিত মজবুত সুঠাম দেহ, তার সাধারণ খাদ্য বনের বিভিন্ন পশু কিংবা নিজের অভাবে গ্রামের গরু মোষ শিকারের জন্য যে, কোন অসুবিধা আছে তার প্রমাণ পেলাম না। কিন্তু বাঘটি স্বেচ্ছায় সে সব

ছেড়ে দিয়ে মানুষের মাংসের দিকে বিকৃত আসক্তি বা লোভ নিয়ে ছুটে যেত, যার ফলে সেই মানুষের হাতেই তাকে প্রাণ দিতে হল।

আমিও অবশ্য সামান্য একটুর জন্য প্রাণটি খুইয়ে বসেছিলাম।

বাঘটি কোন অঞ্চল থেকে আবির্ভাব হয়েছিল তার কোন সন্ধান পাইনি।

সে যাই হোক, এরপর আমরা আশস্থ হলাম এই জেনে যে সেই উপত্যকার জঙ্গলে সে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছে, সে আর কোন দিন উঠে আসবে না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আর একটি রোমহর্ষক কাহিনী। এখন সেটা শোনাবো বলে কলম ধরেছি।

এরও পটভূমি দাক্ষিণাত্যের নন্দন কানন .....

পাঁচ

হলালকেরে।

চিতল দ্রুগ জেলার দ্বিতীয় শহর। যার অবস্থিতি মহীশূর রাজ্যের উত্তর সীমান্তে। এই জেলার উত্তর পূর্বে মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত বেল্যারি বিভাগের আর উত্তর পশ্চিমে বোম্বাই এর সীমান্তে।

অনেকদিন ধরেই এখানে যে ভাবে মানুষখোকো বাঘের উপদ্রব চলে আসছে, তাতে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই অঞ্চলে এমন এক শ্রেণীর বাঘের রাজ্য যারা বংশানুক্রমে মানুষ সংহারে লিপ্ত।

প্রায় দশ বছর আগে এই অঞ্চলে বহু মানুষ এই বাঘের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। যার ফলে মহীশূর সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই অঞ্চলে বাঘ শিকার করতে কোনরকম ছাড় পত্রের প্রয়োজন হবে না।

ব্যাঙ্গালোরে এই সময় এক শিকারী দম্পত্তি থাকতেন। তাঁদের শিকারের প্রতি যেমন ঝোঁক তেমনি উৎসাহ। বিশেষ করে এই মানুষ খেকো বাঘ শিকারে।

অ্যাঙ্গাস ম্যাক্টাভিশ এবং তার স্ত্রী একদিন আমাকে প্রস্তাব করলেন, চলুন না মাসখানেকের জন্য তিনজন মিলে একটু বাঘের পিছনে লাগ : যদি ভাগ্যের জোরে দু একটির দেখা পাই।"

ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের তিনজনের ছোট দলটা ম্যাক্টাভিশের মোটরে করে চিতলক্রুগের প্রধান শহর চিতলক্রুগে এলাম।

প্রথমেই ওই জেলার ফরেস্ট অফিসারের সাথে সাক্ষাত করে বিগত নরহত্যার একটি বিশদ বিবরণ নোট করলাম।

আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন তিনি। তিনি জানালেন মানুষখেকোটি চিতলক্রুগ শহরের সীমানা থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ন-দশ মাইল দূরের শহর নেকাফের পর্যন্ত, আবার সেখান থেকে দক্ষিণে মাইল কয়েক দূরের ছোট একটা গ্রাম হুসদুর্গ পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে।

এই হুস দুর্গতেই কিছুদিন আগে দুটো মানুষ হত্যা করেছে।

মারিকানেভে একটি জলাশয়, বিরাট সেই জলাশয়টি হুসদুর্গ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

বাঘটি নাকি সে পথেও ঘোরাফেরা করে এই জলাশয়ে মাছগুলো বেশ বড় রকমের এমনকি কুমিরও আছে।

বাঘটা এই জলাশয় ঘুরে আবার উত্তর মুখো হয়ে চিতলক্রুগ শহর পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

যোগীমঠ নামে একটি ছোট পাহাড় এই শহরের শেষ প্রান্তে, এর ধারে আছে একটা পুরোনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ; বাঘটাকে নাকি এর কাছাকাছিও দেখা গেছে। এটা ফরেস্ট অফিসারের মন্তব্য।

আমি জানতাম এই দুর্গের আশপাশের অঞ্চলে কচ্চিৎ কখনো চিতাবাঘ বা ভালুকের খবর মিলত—বাঘ যে একদম আসত না তা নয়।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে ঠিক হল, আগে আমরা হলালকেরে ও হসচুর্গায় যাত্রা করব। তারপর আশেপাশের মানুষদের সাথে কথা বলে অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, কোথায় আস্তানা গড়লে আমাদের সবদিক থেকে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে।

পরদিন সকালবেলাতেই হলালকেরে এসে পৌছুলাম। আশেপাশে মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হলে যে রকম একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এখানেও সেই উত্তেজনার ছায়া দেখলাম। কিছু গল্পও শুনলাম। তার মধ্যে কিছু আবার পরস্পর বিরোধী। সবকিছু জেনে শুনে এইটুকু সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মানুষখেকোটা ভয়ানক চালাক এবং সর্বত্র তার গতিবিধি, আর ক্ষমতাও তার অদ্ভুত। ঠিক যেখানে মানুষের সন্দেহ কম সেখানেই তার আবির্ভাব হয়।

আরেকটা গুজব শুনলাম। সেটা হচ্ছে হলালকেরে থেকে হসচ্যারি পথের দুধারে যে বিস্তীর্ণ এলাকা খেজুর গাছ আর ল্যাণ্টানার ঘন ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ এই অঞ্চলেও বাঘটাকে নাকি প্রায়ই দেখা যায়।

হলালকেরের সামানা থেকে খেজুরের চাষ শুরু হয়েছে। এও শুনলাম বাঘটার পায়ের দাগ রোজই প্রায় ঐ পথের ওপর দেখা যায়, এবং দু জায়গার মধ্যবর্তী ন-মাইল রাস্তায় যদি আমরা কিছুদিন সারারাত ধরে বাঘটার সন্ধান করি, তাহলে হয়ত আমাদের সাথে তার দেখা হওয়াটা অস্বাভাবিক হবে না।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা সেদিন ওদের কথামত রওনা হলাম। হলালকেরে থেকে এক মাইল মত আসতে খেজুর বনের লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলো চোখে পড়ল। খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো ল্যাণ্টানার ঘন ঝোপে ঢাকা। আমরা এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ফ্ল্যাস লাইটটা ফেলছি আর হেডলাইটের তীব্র আলো সামনের পথটা ভরিয়ে চলেছে।

এইভাবে আধমাইল মত এগিয়ে যাবার পর মনে হল যেন, একটা খুব কালো আর রোমস মানুষ আমাদের ডানদিকে পনেরো ষোলো ফুট লম্বা গাছে উঠে ছোট ছোট আধপাকা খেজুরগুলো মনের সুখে খাচ্ছে।

কাছে গিয়ে গাড়িটা থামাতেই সে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামতে লাগল। খানিকটা নেমেই আমাদের দিকে তাকাতেই আমরা দেখলাম সেটা একটা স্লথ ভালুক।

আমি আগেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ওরা নিজে থেকে জানুক এটাই চাইছিলাম।

মিসেস ম্যাক্টাভিস তার ৩০০৫ স্প্রিংফীল্ড বন্দুকটার একটা গুলিতে সুনিপুণ ভাবে ভালুকটার ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ভালুকটা গাছের মাঝ থেকে ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

তারপর হসদুর্গা পর্যন্ত যেতে আর কিছুর দেখা পাই নি। আবার হসদুর্গায় ফিরে আরো দুই-দুই চারবার ঐ পথ পরিক্রমা করলাম। শেষে দেখলাম একটা হায়না সেই ভালুকটার মাংস ভক্ষণ করে চলেছে।

ভালুকটা ফেলে গেলে পাছে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই অনেক কষ্টে তিনজন মিলে মৃত ভালুকটাকে ম্যাকের গাড়ির সামনের মাডগার্ড আর এঞ্জিনের মাঝখানে শোয়ালাম।

ভালুকটার লোমগুলো খুব বড় বড় হলে কী হবে সে লোম কিন্তু বড্ড পিচ্ছিল। যার ফলে ওর শরীরের কোন জায়গাই কায়দা করে ধরতে পারছিলাম না।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর হলালকেরে ট্র্যাভলার্স বাংলোতে বসে মিসেস ম্যাক্টাভিসের নিজের সুপটু হাতে তৈরি গরম পরিজ আর বেকন ওডিম দিয়ে প্রাতঃরাশ সারলাম।

তারপর ভালুকটার ছাল ছাড়িয়ে ঠিক করলাম এবার হসদুর্গায় রওনা হব।

প্রথম যে দুটো মানুষ মারা গেছে তার একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ চাই।

খেজুর বাগানের ধার দিয়ে দিনের আলোয় যেতে যেতে দেখলাম চতুর্দিকে কি ভয়ানক দুর্ভেদ্য জঙ্গল। রাত্রে আমরা ল্যাণ্টানার এই ঘন ঝোপের কোন আভাসই পাইনি।

এই রকম জায়গায় বাঘটাকে খোঁজা আর তাকে মারা যে বেশ দুরূহ ব্যাপার বুঝতে অসুবিধা হল না।

হুসদুর্গাতে প্রথম দুটো মানুষ হত্যার বিবরণ নিলাম।

প্রথম হত্যাটা হয়েছিল তিন সপ্তাহ আগে। এগার বারো বয়সের একটি মেয়ে। সে কিনা আবার এই তালুকের আমিলদারের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তার বাবা মায়ের সাথে এই গ্রামেই থাকত। রাত আটটা নাগাদ সে বোধ হয় পায়খানা করতে বাইরে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই বেরোনর পর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। কেননা এমন কোন সাড়া শব্দ ও কেউ পায় নি। যারা যারা কেউ তার পরিণতির সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে। এমনকি কোন টানা হিঁচড়ানোর চিহ্নও পাওয়া যায় নি।

মেয়েটাকে ফিরতে না দেখে তার বাবা মা লণ্ঠন নিয়ে খোঁজ করতে বেরোলেন কোন মাটিতে কোন চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। তখন তারা ভয় পেয়ে গ্রামের লোকজনদের ডাকলেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রায় জন পঞ্চাশ লোক লণ্ঠন দা কাটারি দুটো গাদা বন্দুক নিয়ে মেয়েটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বেরালেন।

কিন্তু রাতের ঘন অন্ধকারে মেয়েটার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

শুধু মাইলআধ দূরে একটা কাঁটা ঝোপের মাঝে তার কিছু অন্তর্বাসের ছেঁড়া টুকরো পাওয়া গেল। কিন্তু দেহের কোন অংশ কেউ খুঁজে পেল না।

আর দ্বিতীয় হত্যাটা হয়েছিল বারো দিন আগে। মারিকানাতে

সরোবর মাইল পাঁচেক দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত। সরোবরের পথে অর্দ্ধেকটা গেলে একটা ছোট নদী দেখতে পাওয়া যায়। সেই নদীর জল এসে জমা হয়ে পথের ধারে একটা জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। জলাশয়টা ছোট হলেও বেশ গভীর।

এখানে কাপড় কাচা সুবিধা বলে গ্রাম থেকে দুই ধোপা ভাই কাপড় কাচতে আসত। কাপড় চোপড় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনটি গাধা রেখেছিল।

ঘটনার দিন বেলা পাঁচটা নাগাদ কাপড় কেচে গাধাদের পিঠে সেগুলো চাপিয়ে একজন সামনে একজন পিছনে গাধাগুলোকে আগলে এগিয়ে চলেছে।

ধোপা ভাই দুটো যখন হুসদুর্গার এক মাইলের মধ্যে, হঠাৎ একটা বাঘ আচমকা তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ে সামনের ভাইটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। বেচারা একটু শব্দ করারও ফুরসত পায় নি। পেছনের ভাইটা ব্যাপার স্যাপার দেখে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আবার উল্টো পথে ছুটতে আরম্ভ করল।

এদিকে রাত আটটার মধ্যেও যখন দুভাই ফিরে এলোনা সাথে সেই গাধা তিনটেও, তখন তাদের দুই বউ ভীত হয়ে সারা গ্রামে চ্যাঁচামেচি আরম্ভ করল।

রাতদশটা নাগাদ প্রায় ৫০।৬০ জনের একটা দল লণ্ঠন লাঠি সোঁটা দা আর সেই গাদা বন্দুক দুটো নিয়ে তাদের খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল।

ওরা দেখতে পেল গাধা তিনটে পিঠে তেমনি মাল বাঁধা অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে পথে শুয়ে আছে।

আরো খানিকটা গিয়ে জলাশয়ের এক কার্লং এর মধ্যে এসে সেই পালানো ভাইটাকে দেখতে পেল বেচারা ভয়ে মরার মত জলের মধ্যে একলা পড়ে আছে চোখগুলো কপালে উঠে গেছে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ওর জ্ঞান ফেরাতেই কেটে গেল। তারপর একটু জ্ঞান ফিরলে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে ঘটনার বিবৃতি দিল।

তারপর তাকে নিয়ে এলোমেলোভাবে অনেক খোঁজাখুজি হলো। কিন্তু অপর ভাইটিকে পাওয়া গেল না। ঠিক করল আবার সকালে সবাই খুঁজতে বেরোবে।

কথামত সকালে খুঁজতে বেরিয়ে বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর খানিকটা রক্তের দাগ আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া গেল। রক্তের দাগ অনুসরণ করে তারা অবশেষে হতভাগ্য ভাইটার ভোক্তাবশেষ দেহের সন্ধান পাওয়া গেল। শরীরের চার ভাগের তিন ভাগই প্রায় রাত্রে বাঘটা খেয়েছে। বাকি ছিল শুধু মাথাটা দুটো হাত আর গোটা একটা পা। সেগুলোকে সযত্নে সংগ্রহ করে সৎকারের জন্য হসদুর্গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল।

এই সময় একটা অতিরিক্ত সংবাদ পেলাম। দিন চারেক আগে একটা গরুর গাড়ি হলালকেরের দিকে আসছিল। হলালকের তখন মাইল তিনেক দূরে, হঠাৎ একটা বাঘ আচমকা গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিকেল তিনটা হবে তখন। গাড়োয়ান বেচারা গাড়ি ছেড়ে ছুটল প্রাণ বাঁচাতে। সোজা পথে না গিয়ে অনেক ঘুর পথে ঝোপ জঙ্গল কাটিয়ে সে গ্রামে আসে।

তার পরের দিন যখন ঘটনাস্থলে সবাই গেল। দেখল দুটো বলদের মধ্যে একটা ভোক্তাবশেষ গাড়ির কাছ থেকে শ খানেক হাত দূরে পড়ে আছে। আরেকটা তখনও জোয়ালে বাঁধা রয়েছে।

এই সংবাদের পর আরেকটা সংবাদ হল যে আরো দুজন শিকারী দল, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ট্র্যাভলার্স বাংলোতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় দিন পাঁচেক হল তারাও মোটরে করে সেখানে এসেছে।

এতে মুসকিল হল এই যে, তারা যখন অনেক আগে থেকে এসেছে, তখন আমাদের পক্ষে বাঘটাকে মারা ভাল হবে না।

কেননা শিকার একটা শিকারী অনেক। ফলে শিকার হয়ত ভয়েই পালিয়ে যাবে।

বেলা তখন দশটা। সব খবর শুনে আমরা ভাবছি হুলালকেরেতে এখন থাকা কি উচিত হবে। ঠিক সেই সময় উক্ত অল্প বয়েসি শিকারী তুজন উপস্থিত। তাদের অভিজ্ঞতাও কম তবুও প্রচণ্ড আগ্রহ। এই বাঘ শিকার করে।

তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে অনেক ঘটনার কথা জানাল। যা আমরা ইতি পূর্ব্বেই শুনেছি। তারা আরো জানালো, যেখানে ধোপাটাকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে তুদিন হল একটা মোষকে টোপ হিসেবে রেখে এসেছে। প্রথম রাত্রে কিছুই হয় নি। আজ সকালে তাদের লোকেরা সেই টোপের খবর আনতে গেছে।

ওদের গুড লাক জানিয়ে, ওদের বাধা দেবনা ভেবে হুলালকেরে ফিরে যেতে চাইলাম। ওরা কিন্তু ছাড়তে রাজি হলো না। অতি ভদ্রভাবে অনুরোধ করল ওদের সাথে পরদিন সকাল পর্যন্ত কাটাই। নচেৎ ওরা নিজেদের অপরাধী ভাববে। তার পরের দিন ওরা যেখান থেকে এসেছে সেই বেলারি চলে যাবে।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে ওদের লোকেরা এসে খবর দিল, গত রাত্রে টোপটা ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ বাঘ আক্রমণ করে তার অর্ধেকটা দেহ উদরস্থ করেছে।

যুবক তুজন সত্যিই ভদ্র ও বিনয়ী তারা অনুরোধ করল আমরা যেন ঐ টোপটাকে টোপ রূপে ব্যবহার করে বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মন সায় দিল না।

তুপুরের আহার এক সঙ্গেই সমাধা করে আমরা সবাই মিলে টোপটাকে দেখতে গেলাম। যদি কোন সাহায্যে আসি।

কিন্তু টোপটার কাছে গিয়ে দেখলাম টোপটা ওরা যেখানে বেঁধেছিল সেখানটায় বাঁধা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা এই অঞ্চলে এখানে ওখানে অনেক উঁচু ঢিপি ঢিপি রয়েছে। এমনকি টোপের মোষটাকে তেমন শক্ত করেও বাঁধেনি ফলে বাঘটা মোষের দড়ি

ছিঁড়ে টানতে টানতে পাহাড়ের পিছন দিকে টেনে নিয়ে নিয়েছে। তারা যে গাছে মাচা বানাবে ঠিক করেছিল সে গাছ থেকে ঐ জায়গা একবারে দৃষ্টির বাইরে।

বাঘটার পক্ষে দু-দিক দিয়েই টোপটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য বাঘটা যদি মানুষখেকো হয়। প্রথমতঃ ধোপাটাকে যেখানে হত্যা করেছিল সেই দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ ধোপাটাকে যেখানে হত্যা করেছে সেখান থেকে সিকি মাইল দক্ষিন-পুবে ছোট একটা পাহাড়ের দিক থেকে।

এদিক ওদিক ছড়ান পাথরের টুকরোর মধ্যে সুবিধামত স্থানে দুটো পাথর নজরে এল, এদের এক-একটার উপর উঠলেই বাঘটার দুটো পথ চোখের সামনে।

নবীন দুই শিকারী ঠিক করল ঐ দুটো পাথরের পেছনে আত্ম-গোপন করে শিকার করবে।

আমি জানালাম, বাঘটা মানুষখেকো হলে বিপদ হতে পারে, তার চেয়ে পাথরের উপরে উঠে বসাই শ্রেয়। তাহলে বাঘটা হয়ত ঝোপের আড়াল থেকে তাদের দেখতে পারে না।

শিকারী দুজন তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল—আমরা পাথরের দিকে পিঠ দিয়ে শিকারের প্রতিক্ষায় থাকব।

তখন তারা কিছু কাঁটা ঝোপ কেটে নিয়ে এসে সামনে একটা মোটামুটি আড়াল সৃষ্টি করল।

আমরা ফেরার পথে পা বাড়ালাম বেলা চারটে নাগাদ। ওদের জন্য একটু চিন্তা হচ্ছিল পাছে ওরা কোন বিপদে পড়ে। ইচ্ছা হচ্ছিল কাছে পিঠে কোথাও আত্মগোপন করি যাতে ওদের কোন বিপদ এলে সাহায্য করতে পারি।

অবশেষে কিন্তু সেই ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেলতে হল। কেননা ভেবে দেখলাম, আমার উপস্থিতিতে বাঘটা হয়ত ভয়ে পালাতে পারে, আর তাছাড়া ওরাও আমাদের ভুল বুঝতে পারে।

কিন্তু তখন কি আদৌ ভেবেছিলাম: ওদের দুজনের মধ্যে একজনের সাথে এটাই আমাদের শেষ দেখা?

॥ ছয় ॥

বাংলোর চারপাশে সন্ধ্যে নেমে গেছে। চা পর্বের সাথে গল্প চলছে, আলোচনা চলছে…রাত হতে চলল। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। নবীন শিকারী দুজন এখান থেকে প্রায় সোয়া মাইল মত দূরে। ওদের গুলির আওয়াজও আমরা শুনতে পাবো না।

রাত্রের খাওয়া সেরে মিসেস ম্যাক্টাভিস বিছানায় দেহ এলিয়ে দিলেন।

আমার কিন্তু ঘুম এল না। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, জঙ্গলের মধ্য থেকে যদি কোন সাড়া আসে।

এদিকে রাত আরো বেড়ে চলে, গ্রামটাও নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘরে, ভাবছি এবার শুয়ে পড়ব।

হঠাৎ একটা শব্দে সচকিত হলাম। মনে হল কে যেন উর্দ্ধশ্বাসে এদিকেই দৌড়ে আসছে।

বাতাসে যেন বিপদের গন্ধ ভেসে এল দেরী না করে বন্দুক আর টর্চটা নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম।

সামান্য একটু গিয়েই দেখি শিকারীদের মধ্যে বড় জনটি মাতালের মত টলতে টলতে বার বার পিছনে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে…সারা শরীর ভেজা…জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন…চোখে মুখে উৎকণ্ঠা…মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

আমি ধরে ফেললাম জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি তোমার অপর সঙ্গীটি কোথায় ?

কিন্তু ওর তখন যা অবস্থা কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। তবুও কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল · ওদের একজনকে

বাঘে ধরেছে···তারপর আর কিছু বলতে পারল না—বাচ্চা ছেলের মত আমার কাঁধে লুটিয়ে পড়ে হু হু করে কাঁদতে সুরু করল।

আমি তাকে ধরে ধরে বাংলোতে নিয়ে এলাম, ম্যাক্টাভিস ও তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুললাম। তারপর প্রথমেই ওকে এক পেগ কড়া ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দুটো কম্বল চাপা দিলাম।

ও তখনও ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে চলেছে। মিসেস ম্যাক্টাভিস ওর সুশ্রূষায় লেগে গেলেন। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম ওর মুখ থেকে প্রকৃত ঘটনা শোনার জন্য।

ও যা জানাল তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। ও নিজে রাস্তার দিকে মুখ করে পাথরটার আড়ালে বসেছিল। অপর সাথী টড ছিল অন্য পাথরটার আড়ালে পাহাড়টার দিকে মুখ করে।

অন্ধকার হব হব করছে। হঠাৎ আমার মনে হল টড যেখানে বসে আছে তার ওদিকে কিছুটা দূরে ঝোপটায় যেখানে ছোট পাহাড়টা ক্রমে নিচের দিকে নেমে গেছে সেখানে লম্বা লাল মত কি যেন একটা নড়তে দেখলাম।

শব্দ হবার ভয়ে আমি টডকে কিছু বলতে পারলাম না। এদিকে টডের এতটুকু নজর নেই। কেননা টডের কাছ থেকে ওখানটা দেখা যায় না।

অগত্যা আমাকে দৃষ্টি রাখতে হলো। কিন্তু পরে আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এক-একটা ঘণ্টা যেন একটা একটা যুগ···এরকম ভাবে রাত প্রায় দশটার ঘর অতিক্রম করে গেল।

অন্ধকারে আমাদের মৃত মোষের টোপটাকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আকাশে গুটি কয়েক নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোতে আমি শুধু আমার চারপাশটা সামান্য দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ কানে একটা শব্দ এল। প্রথমে ঝপ্ করে একটা শব্দ—তারপর কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার সামান্য শব্দ—কিয়ৎক্ষণ পরে মট্ মট্ শব্দ—মনে হল কেউ যেন হাড় চিবোচ্ছে, আমার সন্দেহ রইল না. বাঘটা এসে মৃত মোষটার বাকিটা সদব্যবহার করছে।

আমি কিন্তু গুলি চালালাম না। আমি চাইছিলাম টডই প্রথমে গুলি চালাক। কেননা টোপাটা থেকে টডের দূরত্ব আমার থেকে কম। আমার মত সেও নিশ্চই হাড় চিবোনোর শব্দ শুনেছে।

এদিকে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু টডের কোন সাড়া নেই। আমার মনে হল ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ঠিক করলাম আমিই গুলি করব। বন্দুকটা বাগিয়ে বন্দুক-টর্চটা জ্বালতেই দেখলাম বাঘটা মোষটাকে খেয়ে চলেছে।···এক মুহূর্তও কাটে নি হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার · সঙ্গে টডের জায়গাটা থেকে একটা চাপা গর্জন···একটু ধস্তাধস্তি···একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ ··তারপরেই সব যেন কেমন নিস্তব্ধ।

আমি টর্চটা টডের দিকে ফেললাম. বাঘটাকে তার আগের মুহূর্তে মোষটার কাছ থেকে লাফাতে দেখেছিলাম। সে তখন ঝোপের দিকে লাফ দিয়েছিল।

কিন্তু কোথা টড আমি নাম ধরে ডাকলাম উত্তর পেলাম না মনটা দোলা দিয়ে উঠল—অন্ধের মত টডের কাছে ছুটে গেলাম, টড নেই, তার জায়গায় পড়ে আছে শুধু তার বন্দুকটা জলের বোতল আর আধ খাওয়া স্যাণ্ড উইচ।

বুঝতে পারলাম টড এখন বাঘের কবলে। আমি ক্ষোভে দুঃখে আত্মহারা হয়ে উন্মাদের মত তাকে খুঁজতে জঙ্গলের মাঝে ছোটাছুটি করতে করতে নিজেই পথ হারিয়ে বসলাম। কিন্তু টডের সন্ধান পেলাম না ·:সৌভাগ্যবশত সেই সময় কখন যে আমি হুসহুর্গার পথে এসে গেছি খেয়াল নেই। আর সেই পথ দিয়েই আমি এখানে···। ইন্দ্রের বক্তব্য শেষ হল।

আমি ধৈর্য ধরে সব শুনে বুঝলাম, বাঘ একটা নয় ছুটো। একটা গরু মোষ হত্যা করছে। একটা করছে মানুষ হত্যা এক জোড়া বাঘ হয়ত স্ত্রী ও পুরুষ বাঘ হতে পারে, কিংবা তাও নয়··· যাই হোক আমাদের যে এখন এক জোড়া বাঘের সাথে মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইন্স যে রকম বলল তাতে মনে হয়—যদিও মোষখেকোটাকে সে দেখেছে। মানুষ খেকোটাকে এখন কেউ দেখেনি, তাতে বাঘটা ছুটো পূর্ণবয়স্ক সুস্থ সবল বাঘ বলেই মনে হয়।

মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তুলে তাদের মধ্যে জন কুড়িকে প্রায় জোর করে দলে ভিড়িয়ে, দা, কাটারি-লাঠি লণ্ঠন মায় সেই গাদা বন্দুকওয়ালা দুজনকে নিয়ে টডের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস ম্যাক্টাভিস ও টড যদিও টড মানসিক ক্লান্ত তবুও তারা সঙ্গে গেল। ম্যাক্টাভিস আমার পাশে।

আমরা টডের পাথরটার কাছে এলাম। এদিক ওদিক তাকাতে টডের বাঁ পায়ের রবার সোলের জুতোটা পেলাম। জুতোটা যেখানে পাওয়া গেল তাতে মনে হল যে ছোট পাহাড়টা দিয়ে বাঘটা নেমে এসেছিল সেদিকেই সে আবার শিকারটা নিয়ে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ী আমরা আরেকটা জায়গায় এগিয়ে গেলাম, যেখানে বাঘটা তার শিকারকে প্রথম নামিয়েছিল।

তারপর ইন্সের চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ির শব্দে ভয় পেয়ে আবার চলতে শুরু করে দিলাম। এখান থেকেই পাওয়া গেল রক্তের দাগ।

সেই দাগ অনুসরণ করে আমরা পাহাড়টার পাদদেশে হাজির হলাম। তারপর চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলাম ডান দিকে।

যাতে হঠাৎ কোন আক্রমণ না হয় তার জন্য সবাই খুব কাছাকাছিই আছি।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন

আমরা হতভাগ্য টডের দেহটার সন্ধান পেলাম। যার অর্দ্ধেকটাই বাঘটা ইতিমধ্যে উদরস্থ করেছে।

ওঃ সে কি বীভৎস দৃশ্য! ইন্দ তো তা দেখেই একবারে অজ্ঞান হয়ে যায়।

একদিকে ইন্দের অসুস্থ দেহ অপরদিকে টডের দেহাবশেষ নিয়ে যাত্রা শুরু করতে ভোর হয়ে গেল।

টডের দেহাবশেষ ম্যাক্টাভিসের গাড়িতে নেওয়া হল। আর ইন্দের সম্পূর্ণ অসুস্থ দেহটাকে নিয়ে আমি টডের গাড়িতে চেপে বসলাম।

নটা নাগাদ চিত্তরঞ্জনে লোক্যাল ফাণ্ড হাসপাতালে এসে পৌঁছুলাম। এখানে ইন্দকে ভর্তি করে দিলাম। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে যে সব জবাবদিহির সম্মুখিন হতে হয় সেই সব বিরক্তিকর জবাবদিহি সেরে যখন আমরা হসন্দুর্গায় ফিরে এলাম তখন সূর্য অস্ত যেতে চলেছে।

শান্ত নিস্তব্ধ ট্রাভলার্স বাংলোতে টডের স্মৃতিগুলো যেন আরো গভীর বেদনার সামিল হল।

আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম এর প্রতিশোধ নেবোই।

॥ সাত ॥

পরদিন ভোরে আবার আমরা ঘটনাস্থলে এলাম। প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরে সমস্ত প্রমাণ সাক্ষ থেকে একটা ঘটনা পরম্পরা দাঁড় করালাম।

কয়েক সপ্তাহ কোন বৃষ্টি না হওয়ায় মাটি বেশ শক্ত, যার ফলে কোন পায়ের দাগ পেলাম না। যা দেখে আমরা বুঝতে পারি বাঘটার আকৃতি প্রকৃতি।

ইন্সের বর্ণনানুযায়ী মোষ খেকোটা যদি পুরুষ হয় তবে মানুষ খেকোটা নিশ্চই স্ত্রী বাঘ। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও আমরা নিশ্চিত নই।

কাছে পিঠে আর কিছু দেখতে না পেয়ে, যেখানে টডের দেহটা পাওয়া গিয়েছিল সেখানে এলাম। কিন্তু কোথাও বাঘটার থাবার দাগ লক্ষ করা গেল না। অনেক চেষ্টা করেও এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। জানতে পারলাম না বাঘটা স্ত্রী না পুরুষ।

ওদিকে আমরা চলে যাওয়াতে এক পাল শকুন মোষটাকে নিয়ে ভোজ শুরু করেছে।

আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম। আরেকটা ভিন্ন মোষের টোপ ধোপাটার হত্যার স্থানে বাঁধতে হবে। ম্যাক্টাভিস থাকবে সেখানে।

আমি থাকব টডের জায়গায়টার কাছে একটা পাথরের উপরে।

আমাদের মতলবটা ছিল বাঘ দুটো যদি একসঙ্গে আসে তাহলে যেটা মোষ খেকো, সেটা মোষটাকে আক্রমণ করবে। আর মানুষ খেকোটা.........

ম্যাক তখন গুলি করবে। যদি মোষ খেকোটা মোষটাকে আক্রমণ না করে, তবে সে কাছে পিঠেই কোথাও থাকবে। আর আমি যে পাথরটার উপরে থাকব তখন যে পাহাড়ের দিক থেকে বাঘটা এসেছিল সে দিকে নজর রাখতে পারব। আর কাছে আসলেতো কথাই নেই।

ম্যাকের জায়গায় আত্মগোপন করার কোন গাছ পাথর নেই। তাই সেখানে একটা গর্ত করে একটা বিরাট কড়াই উল্টো করে ঢাকা দিয়ে ম্যাকের গর্তে থাকার নিরাপত্তা সৃষ্টি করা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনছয়েক লোক একটা বড় কড়াই নিয়ে এল। ম্যাকের গাড়িতে একটা সতরঞ্চি মত ছিল রাত জাগার সরঞ্জাম হিসেবে সেটাকে নিয়ে আসা হল।

কড়াইটা এমন ভাবে রাখা হল যাতে মাটি থেকে উপরে কিছুটা ফাঁক থাকে, এক সেখান থেকে যাতে গুলি করা যায়, কড়াইটার উপর সতরঞ্চিটা চাপিয়ে কিছু কাঁটাঝোপ চাপিয়ে দেওয়া হল, যাতে কিছু বোঝা না যায়। দূর থেকে সেটাকে দেখে মনে হল একটা ঢিবি মত।

এদিকে একটা ঝামেলা উপস্থিত হল। মিসেস ম্যাক জিদ ধরলেন তিনিও তাঁর স্বামীর সাথে গর্তে থাকবেন। অনেক বোঝানো সত্বেও তিনি জিদ ছাড়লেন না অগত্যা তাঁকেও সেই কড়াইটা উঁচু করে গর্তে নামিয়ে দিয়ে আবার জায়গাটাকে স্বাভাবিক করা হল।

বিকাল পাঁচটার মধ্যে যে যার জায়গায় আস্তানা নিলাম। সারাদিনের রোদে আমার পাথরটা তখন বেশ গরম কিন্তু উপায় নেই।

নিস্তব্ধ ভাবে একের পর একটা ঘণ্টা এগিয়ে যায়—কোন সাড়া নেই সারা বনাঞ্চলে মনে হলো সারা জঙ্গলে যেন কোন প্রাণীই বাস করে না। না একটা পাখির ডাক না কিছু। আকাশের টুকরো টুকরো রূপালী নক্ষত্রগুলোও একটা ভুতুড়ে স্তব্ধতা নিয়ে এক এক করে দেখা দিচ্ছে। ভীষণভাবে টডের কথা মনে হচ্ছিল।

এইভাবে প্রায় অর্দ্ধেকটা রাত কেটে গেল। কোন কিছুই ঘটল না।

এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম ম্যাকের সংকেত। কেননা আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম কোন কিছু ঘটলে শিস দিয়ে যেন সঙ্কেত করা হয়।

ওদের দেখতে টর্চ জেলে অতি সন্তর্পণে কৃত্রিম ঢিবিটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম টোপটার কোন ক্ষতিই হয় নি। এবং ম্যাক দম্পতি সেই টোপটার কাছে দাঁড়িয়ে—ব্যাপার কি?

—"আর বলো না মিসেস ছিল আমার দিকে পিছন ফিরে

মোষটার দিকে পথ করে। মাঝ রাত্রি পর্যন্ত কিছুই নজরে এল না। কিন্তু মিসেস হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দে সজাগ হল। সেদিকে লক্ষ্য করে কড়াইয়ের নিচে সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রথমে কিছু নজরে এল। একটু ভাল ভাবেই লক্ষ্য করতেই মনে হল···কড়াই এর কাছ থেকে মাত্র ছ-ফুট দূরে··· আরেকটা ঢিবি ...যা সন্ধ্যেবেলা আদৌ সেখানে ছিল না।

কথাটা মনে আসতেই বুঝতে পারল শিকার সামনে....ভাল ভাবে তাকাতে দেখা গেল একটা বাঘ উবুড় হয়ে সামনের দিকে পা দুটো এগিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। আর তার দৃষ্টি এই কড়াই এর ফাঁকের দিকে। মিসেস কিছুটা ভয় পেলো। কিন্তু ঘাবড়িয়ে না গিয়ে আমাকে দেখাবার চেষ্টা করল, আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে পেছনটা কিছু দেখার উপায় নেই।

মিসেস শব্দের ভয়ে মুখে কিছু বলতে পারে না···ফলে ইঙ্গিতে আমাকে সজাগ করতেই বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। আমি সেই দিকে ফেরার জন্য অতি সন্তর্পণে যখন বন্দুকটা যাতে কড়াইএর গায়ে না লাগে সেই ভাবে ঘুরিয়ে পেছন ফিরছি···ঠিক তখন নলটা কড়াই-এর গায়ে লেগে গিয়ে একটা ধাতর শব্দ হয়··সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে একটা শব্দ। বুঝলাম এই ভাবে আর আত্মগোপন করার কোন অর্থ নেই কেননা আমরা ধরা পড়ে গেছি।"

অগত্যা ম্যাক দম্পতিকে নিয়ে বাংলোতে ফিরতে হল। টোপটা ওখানেই বাঁধা রইল। যতদিন না আবার কোন বিকল্প উপায় বার না করি।

কিন্তু আশ্চর্য পরদিন লোক মুখে শুনলাম, টোপটার সদগতি হয়ে গেছে। খবর পেয়েই ছুটলাম সেখানে। গিয়ে দেখলাম মোষটার কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু মাথাটা আর পায়ের শক্ত খুরগুলো ছড়িয়ে আছে।

জায়গাটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম একটা নয় দুটো বাঘ

মিলে মোষটাকে পরমানন্দে আহার করেছে। পাশের কৃত্রিম ঢিবিটা একটুও তাদের ভীতির সঞ্চার করে নি।

অতএব বোঝা গেল প্রয়োজনে মানুষ খেকোটা গরু মোষও খেয়ে থাকে। আর তা যদি না হয়, তবে মানুষ খেকোটা কোন তৃতীয় ব্যাঘ্রমশাই।

পরদিনের ব্যবস্থাটা একই রকম হল। শুধু স্থানটা একটু পরিবর্তন হল। আগের দিনের জায়গা থেকে সিকি মাইল দূরে বেশ বড় ধরণের একটা গর্ত করা হল। আনা হলো আরো বড় ধরণের একটা কড়াই। একটা নতুন মোষ সেখানে রাখা হল। সব কিছুই সব আগের মত স্বাভাবিক করা হল। তবে এইবার গর্তে আর মিসেস ম্যাক নেই। তাকে আমি প্রায় জোর করেই বাংলোতে থাকতে বললাম। গর্তে রহিলাম আমি আর ম্যাক। ফাঁকটাও একটু বড় করা হল, যাতে গুলি ছুড়তে অসুবিধা না হয়। দুজন দুদিকে পিঠ লাগিয়ে বসে—হাতে উদ্যত বন্দুক নিয়ে শিকারের অপেক্ষায় রইলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তিনটি রাত বৃথাই কাটল। চারদিনের দিন বাংলোতে এসে একটু ঘুম লাগাচ্ছি। এমন সময় একজন এসে খবর দিল যেখানে আমরা ক'দিন আগে ভালুকটাকে মেরেছিলাম ঠিক সেই খেজুর গাছে আরেটা মানুষ বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

ছুটলাম সেখানে। কিন্তু আমরা যাবার আগেই দেখি মৃতদেহ সৎকারের জন্য তার আত্মীয় স্বজনরা লোকটাকে নিয়ে চলে গেছে। একটু বিরক্ত হলাম, ভেবেছিলাম ওটাকেই এবার না হয় টোপ হিসেবে ব্যবহার করব।

নিরুপায় হয়ে একটা নতুন মোষ কিনে এনে ঘটনাস্থল থেকে শখানেক হাত দূরে টোপ হিসেবে বাঁধলাম।

কাছেই একটা গাছ ছিল। তাতে মাচান বেঁধে পর পর চার

রাত্রি জেগে কাটালাম। এদিকে ম্যাকের শরীরটা একটু অসুস্থ মনে হল তাই তাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে আমি একাই জেগে কাটালাম।

কিন্তু এবারও হতাশ হতে হল। বাধ্য হয়ে একরাশ বিরক্তি নিয়ে সকালে বাংলোতে ফিরে এসে টোপটাকে খুলে আনার জন্য লোক পাঠালাম।

আশ্চর্য লোকগুলো কিছুক্ষণের 'মধ্যেই ফিরে এসে জানাল— যেই তারা মোষটাকে খুলতে গেছে অমনি জঙ্গলের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েক গজের ভেতরে বাঘটা হুঙ্কার দিয়েছে। তাই তারা মোষটাকে না খুলেই পালিয়ে এসেছে।

দেরী করলাম না গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম—গিয়ে দেখি মোষটা অক্ষতই আছে। আমি ভেবেছিলাম মানুষগুলো পালিয়ে যেতেই বাঘটা হয়ত মোষটাকে হত্যা করবে। কিন্তু—যাই হোক ভাগ্যের নামে ম্যাককে ফেরত পাঠিয়ে আমি মাচায় গিয়ে উঠলাম, যদিও জানি বাঘটা এখন আর ফিরবে না তবুও আশা—

দুপুর হতে চলল তবু কিন্তু কিছু ঘটল না। এদিকে অনিদ্রায় আর খিদের চোটে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। তাই মাচা থেকে নেমে মোষটাকে খুলে নিয়ে বাংলোর দিকে এগোলাম।

রাত্রে আবার ফিরে এসে মোষটাকে সেখানে বেঁধে মাচায় উঠলাম।

ম্যাক দম্পতি গেল হস দুর্গায় সেই পুরোণো টোপের কাছে। যে জায়গাটায় আমি আর ম্যাক আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই বড় গর্তটার ভিতরে তারা দুজনে আশ্রয় নিল।

কিন্তু এবারেও কিছু ঘটল না। ফিরে এলাম বাংলোতে।

দুপুরের আহার সেরে একটু ঘুমিয়েছি। ঠিক বিকেল চারটের সময় একটা গণ্ডগোলে ঘুমটা ভেঙে গেল।

বারান্দায় দেখলাম বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে সরগোল

করছে, ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করতে ওদের মধ্যে থেকে একজন জানাল।

বারো জন লোক গরু চরিয়ে চিতলক্রুগের বাজারের দিকে যাচ্ছিল। মাইল তিনেক আসতে একটা গরু দল ছাড়া হয়ে বড় রাস্তায় পঁচিশ গজ মত সরে এসেছিল। অন্য একটা লোক তাকে দলে ফিরিয়ে আনার জন্য যেই রাস্তা থেকে গরুটার কাছে গেছে অমনি বাঘটা তার ওপর লাফিয়ে পড়ে। সম্ভবত বাঘটা রাস্তার ঝোপের আড়ালে তকে তকে দলটার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটলো, অথচ লোকগুলো একসাথে থাকা সত্বেও কোন কিছু করতে পারল না।

অনুসন্ধান করে বুঝতে পারলাম বাঘটা লোকটাকে নিয়ে পাহাড়ের উপর গিয়ে ওঠে—ওঠার সময় লোকটা মাথার উপরের একটা গাছের ডাল হাতে পেয়ে গিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরে, ঝুলে পড়ে। বাঘটা তখন তার উরুতে এক থাবা বসায়। লোকটা তবু প্রাণপণে ডালটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বাঘটা তখন রেগে গিয়ে উরুর চামড়া থাবায় আটকে নিয়ে মাটিতে ঝুলে পড়ল। ফলে লোকটার উরু থেকে কলার খোসার মত চামড়াটা ঝুলতে থাকে।

বাঘটা আরো রেগে যায়। তার উপর আবার উরু থেকে অবিরাম রক্তধারা দেখে রাগে উন্মত্ত হয়ে দুই থাবা দিয়ে লোকটার শরীর আঁকড়ে ধরে অতি সহজেই গাছ থেকে ছাড়িয়ে ঘাড়ে কামড় দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়।

অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে গিয়ে দেখলাম লোকটা কি চেষ্টাই না করেছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্য। গাছের ডাল ভাঙা সেই ডালে আঁকড়ে ধরা নখ বসে যাওয়ার চিহ্ন। চামড়ার টুকরো—চাপ—চাপ রক্ত। সেই রক্তের ধারা চিহ্ন হয়ে চলে গিয়েছে। যে পথে বাঘটা লোকটাকে নিয়ে গেছে। আমরা এগিয়ে চললাম সেই পথ ধরে। এক সময় আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে ঢুকলাম।

বেলা তখন পাঁচটা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তার আগেই লোকটাকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিছুটা গিয়ে ছিন্নভিন্ন পোষাকের টুকরো খুঁজে পেলাম—একটু দূরে অনেকখানি চাপ চাপ রক্ত।

এতে বোঝা গেল বাঘটা এখানে লোকটাকে কিছুক্ষণের জন্য নামিয়েছিল। তারপর সে গভীর উপত্যকার দিকে চলে গেছে।

আরো পৌণে এক মাইল মত এগিয়ে গিয়ে একটা পাথুরে জায়গায় এসে পড়লাম। আশে পাশে দুয়েকটা ঝোপঝাড়। বেশ নির্জন শান্ত। বাঘটা কিন্তু তবু এখানে বসে আহার শুরু করেনি। কথাটা মনে হতে না হতেই একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে একটা বিকট গর্জন কানে এল। তারপর কয়েকটা ছোটখাট পাথরের টুকরো সরে যাওয়ার শব্দ।

আমাদের দৃষ্টির মাঝে ধরা পড়ার আগেই লাফিয়ে যাবার আগে ওই নুড়ি পাথর সরে যাওয়ার শব্দ।

বাঘটা সেখান থেকে লাফ মেরে ফিরে যেতেই আমরা লোকটার মৃতদেহ দেখতে পেলাম। প্রায় তিন ভাগটাই খাওয়া হয়ে গেছে। বাকিটুকু একরাশ ঘন লাল রক্তের মাঝে পড়ে আছে।

॥ আট ॥

রৌদ্রের তাপ কমে আসছে। বসবার মত কাছেপিঠে কোন গাছ নেই। আশেপাশে ছড়ান পাথরের মধ্যে শুধু একটা বারো ফুট উঁচু পাথর নজরে এল।

পাথরটার তিন দিক বেশ খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। বাঘ সেখানে সহজে আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু অপর দিকটা বেশ ঢালু। দুঃখের বিষয় মৃতদেহটা সেই দিকে পড়ে নেই।

এদিকটার প্রায় নব্বই ডিগ্রিরও বেশি একপাশে ঘেঁষে মৃতদেহটা পড়ে আছে।

অর্থাৎ এই পাথরের উপর আশ্রয় নিতে হলে দু-দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত নিচে বাঁদিকে যেদিকে লোকটার মৃতদেহ সেইদিকে, দ্বিতীয়ত আমার ডানদিকে ঢালু জায়গাটার দিকে। নাহলে বাঘটার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে।

তাই ঠিক করলাম খাড়াই দিকে পিছন ফিরে থাকব। কেননা ওদিকটা বাঘটার লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। কারণ আঁকড়ে ধরার মত কোন অংশ নেই। সেক্ষেত্রে তাকে নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে। আর তখনই আমি তাকে গুলি করার সুযোগ পাবো। কিন্তু এখন অনিশ্চিত লাফের ঝুঁকি বাঘটা নেবে কি?

আরো কয়েকটা পাথরের টুকরো সংগ্রহ করে সাথে কিছু ঝোপঝাড় দিয়ে ঢালুর দিকটা আড়াল করে পাথরটার উপর উঠে বসলাম। মিঃ ম্যাক ও মিসেস ম্যাককে বললাম, তারা যেন হুস দুর্গা ও হলালকেরের পথে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যদি বাঘটা এই শিকারের কাছে না ফিরে আসতে চায়। তবে ঐ পথে বাঘটার দেখা মিললেও মিলতে পারে।

সবাই চলে গেল। আমি ওই আধ খাওয়া মানুষটার সাথে একা রইলাম।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে থাকে। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ডানদিকে ঢালুর দিকে। সামনের বন দৃষ্টির অন্তরালে একটা আবছা সীমানার মত দেখা যায়, তার আড়ালে একটা হাতিরও দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। মৃতদেহটাও অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

রাত দশটা প্রায়। মাইলখানেক দূর থেকে হঠাৎ একটা সম্বর ডেকে উঠল। তারপরেই একটা বাঘের ডাক। প্রত্যুত্তরে আরেকটা বাঘের ডাক। এ ডাকটা এলো সেদিক থেকে, যেদিক থেকে আমরা এসেছি।

চুপচাপ বসে চিন্তা করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল। আমি ভাবছি অন্ততঃ দুটো বাঘ তো নিশ্চই এ অঞ্চলে আছে। আবার তিনটিও হতে পারে।

এদের মধ্যে একটা দুঃসাহসী ধূর্ত নরখাদক, দ্বিতীয়টাও সমান দুঃসাহসী মোষ খেকো। গো-খাদক আর নরখাদক মানে এই নয় যে, যে যার প্রিয় খাদ্য ছাড়া খায় না।

আর তৃতীয় যেটা সেটা গো-কিম্বা নরখাদক দুই হতে পারে।

এখন শুকনো আবহাওয়ার দরুণ শুকনো মাটিতে তাদের পায়ের ছাপ না পাওয়ায় জানতে পারিনি তাদের স্বভাব চরিত্র।

ইতিমধ্যে বাঘগুলোর গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকা আর কখনো কখনো প্যাঁচার ডাক ছাড়া আর কোন জন্তুর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। তবে বেশ প্রবল হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো নুইয়ে পড়ছে।

সাত পাঁচ ভাবছি। এমন সময় পেছনে ভারি কিছু পতনের শব্দে চমকে উঠলাম। বুঝলাম মক্কেল এসেছেন। কিন্তু ঘুরে সেদিকে তাকাবার আগেই মক্কেল হাওয়া।

আমি তার লাফানোর সম্বন্ধে এতক্ষণ ভাবতে পারিনি।

বাঘটা কিন্তু আমার উপস্থিতি জানতে পেরে ঠিক করেছিল একবারে এক লাফে আমাকে ধরে আমার ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

কিন্তু আমার সৌভাগ্য মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য আমি বেঁচে গেলাম।

বাকি রাতটা তাই খুব সজাগ দৃষ্টিতে সতর্কভাবে জেগে কাটালাম। কিন্তু কোন ঘটনার সম্মুখীন হলাম না।

সকাল হলো। বেলাও বাড়ল। ভয় হচ্ছিল পাথর থেকে নামতে পাছে বাঘটা এখনও আমার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে।

কিন্তু তবুও সাহসে ভর করে নেমে এসে সৌভাগ্যবশতই নিরাপদে রাস্তা পর্যন্ত এলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যাকও গাড়ি নিয়ে হাজির। সে জানাল তাদের হসত্বর্গা আর হলালকেরের পথে টহল দেওয়াটা বৃথা হয়েছে।

বাংলোতে এসে একদল লোককে পাঠালাম মৃতদেহটাকে ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখে আসতে যাতে শকুনির দৃষ্টি না পড়ে। কেননা ওই টোপ দিয়েই আজ রাত্রে আমি আবার প্যাহারায় বসব।

লোকগুলি রওনা হবার মুহূর্তে ঐ লোকটার আত্মীয়েরা এসে সৎকারের জন্য মৃতদেহের দাবি জানাল।

অনেক চেষ্টা করলাম ওদের বোঝাতে। কিন্তু ওরা কোন যুক্তির ধারে কাছে গেল না। ফলে বাঘটাকে মারার বাও একটা সুযোগ পেয়েছিলাম তাও হারাতে হল।

এদিকে ঘণ্টা দুই পরে হসত্বর্গা থেকে খবর এল আমাদের কৃত্রিম টিবির কাছের মোষটাকে হত্যা করা হয়েছে।

ম্যাক আর আমি সন্ধ্যে নাগাদ সেখানে এসে সেই গর্তে আশ্রয় নিলাম।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। কড়াইটার চারপাশে বাঘের চলাফেরার আর চাপা আওয়াজের শব্দ কানে এল।

আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শিকারের ওপর কখন বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। বাঘটা তবু টোপটার চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে।

আমার মনে হল বাঘটা মনে হয় আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে।

হঠাৎ ম্যাকের মাথায় এক দুঃসাহসী বুদ্ধি এসে ভর করল। বুদ্ধিটা হল, ম্যাক গর্ত থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন এমনি একটা ভাব দেখাবেন যাতে বাঘটা টোপটাকে সদব্যবহার করতে পারে। আর তখনি আমি তাকে গুলি করব।

বুদ্ধিটা কাজে লাগতে পারে। কেননা এর আগের বারের ঘটনাটা ঠিক এমনই ঘটেছিল। কিন্তু তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। হতে পারে ঐ বাঘটাই মানুষ খেকো। সেটা একা কিংবা তার সঙ্গীর সাথে আগেরবার এসেছিল। আমার মন সায় দিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল সেই বুদ্ধি ওর মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য। ওকে বোঝালাম গর্ত থেকে বেরোনা মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। বাঘটা কিন্তু এখনও সমানে টোপটার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভোর হব হব ঠিক সেই সময় বাঘটা টোপ ত্যাগ করে অদৃশ্য হল

এইভাবে আরো একটা রাত্রি এমন হতাশার মধ্যে কাটালাম।

দ্বিতীয় রাত্রিতে আমরা হসদুর্গা, হলালকেরে আর চিত্তলদ্রুগের পথে টর্চ জ্বেলে গাড়ি নিয়ে ঘুরলাম, যদি বাঘের দেখা পাই, কিন্তু তাও বৃথা হল।

তৃতীয় দিনে সকালেই একটা খবর পাওয়া গেল। খবরটা হলো·· ···

একদল লুম্বানি কাঠুরে মাইল চারেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় রাত কাটিয়েছিল। যাতে বন্য জন্তুর আক্রমণ না হয় সেই ভয়ে ওরা আগুন জ্বেলে ওদের পাঁচটা গরুর গাড়ি সহ গরুগুলোকে গাড়ির বেড়ার আড়াল করে আগুনটা বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছিল।

তখন মধ্যরাত্রি, আগুন প্রায় নিভু নিভু, এমন সময় একটা বাঘ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে গাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে একটা বলদকে কামড়ে ধরে। বাকি বলদগুলো তখন ভয় পেয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। লোকগুলোর ঘুম ভেঙে যায়। জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ওরা বাঘটাকে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারে। বাঘটা তার আহার সেখানেই ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বলদটার গলায় বাঘের দাঁত বসে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় ছড়েও গিয়েছিল। কিন্তু তবু বলদটা প্রাণে বেঁচে গেল।

সকাল হতে ওরা চারটে গাড়ি আর আহত বলদ নিয়ে হসদুর্গার পথে রওনা হয়। আহত বলদটার পক্ষে গাড়ি টেনে নেওয়া সম্ভব নয়, ফলে একটা গাড়ি তারা সেখানেই ফেলে রেখে এসেছে।

এই লুম্বানি কাঠুরেদের মধ্যে একটা লোক ছোটবেলা থেকেই এই অঞ্চলে বাস করে আসছে। তার নখদর্পনে এই সমগ্র বনটা। সে জানাল মাইল ছয় দূরে বনের মাঝে একটা ছোট নদী আছে। নদীটা পাহাড় ঘেরা জায়গায় গিয়ে একটা স্বচ্ছ সরোবরের সৃষ্টি করেছে। এখন গরমকাল, তাই তারা প্রখর দুপুরে এই সরোবরের কাছে শীতল জায়গায় বিশ্রাম নেয়। এছাড়া সন্ধ্যায় শিকারে বেরোবার আগে ও ভোরে শিকার করে ফিরে ওদের কেউ না কেউ এই সরোবরে জল খেতে আসবেই।

লোকটা যে এই অঞ্চলের অনেক খবরই রাখে তার প্রমাণ পেলাম তার আরো অনেক কথায়।

ওর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম ও যে শুধু বেআইনি ভাবে শিকার করে তা নয়, সাথে বাবুল গাছের ছাল থেকে আরক নামে এক রকম কড়া মাদক ও এই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে তৈরি করে, তা বিক্রী করে, টাকা পয়সা বেশ কিছু করেছে।

এ অঞ্চলে এই রকম খবর অনেকেই জানে না। যারা জানে তারা বাঘের ভয়ে এ অঞ্চলে আসতে চায় না।

লোকজনের সাথে কথা বলে আমি ও ম্যাক ঠিক করলাম সেদিন দুপুরের পর ওর সাথে ওখানে গিয়ে রাত কাটাব এবং যাবো সন্ধ্যার আগেই।

আমরা সেখানে পৌঁছলাম বেলা তিনটে নাগাদ।

সত্যি, বাঘের পক্ষে এমন উপযুক্ত মনোরম স্থান আর হয় না। ছোট সরোবরটা ঘিরে রয়েছে ঢালু পাহাড়ের সারি আর যে ছোট

নদীটার জল জমে এই সরোবর সৃষ্টি হয়েছে সেই নদীর দুই ধারে স্পষ্ট বাঘের যাওয়া আসা থাকার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

এক চিহ্ন দেখে মনে হল বাঘটা বেশ বড়সড় পূর্ণ বয়স্ক। অন্যটা এক বাঘিনীর।

মোষখেকোটা শুনেছি বেশ বড়সড় সুতরাং বড় ছাপটা সেই মোষখেকোটারই হবে। আর অন্য ছাপটা সম্ভবত আমাদের মানুষখেকোটার। অবশ্য তৃতীয় বাঘের যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে।

॥ নয় ॥

সরোবরে যেখানে নদীটা এসে মিশেছে ঠিক তার কাছেই একটা বুনো আমগাছ নজরে এল। এর নিচের একটা ডাল মাটি থেকে প্রায় পনের ফুট উচুতে। সেখানে আমরা মাচান বাঁধলাম।

চারটের পরে আমরা তিনজনে সেই মাচানের ওপর উঠে বসলাম। লুম্বানিটাকে যেতে দিইনি পাছে একলা ফেরার পথে সে বাঘের কবলে পড়ে।

ভোর হয়ে আসছে, এমন সময় একটা ক্ষীণ কান্নার রব বা একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। আর সাথে সাথেই ঝরা পাতার গালিচাতে একটা ভারি পায়ের শব্দ। শব্দটা আসছে আমাদের সামনে ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন সরোবরে জল চেটে খাচ্ছে......চটাত্ চটাত্ শব্দ।

বুঝলাম, আমাদের অতিথি এসে গেছেন। কথামত ম্যাককে প্রথম গুলি করার ইঙ্গিত করলাম, আমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে রইলাম যদি প্রয়োজন হয় তবে আমার বন্দুক কাজে লাগাবে।

ম্যাক সোজা বাঘটার চোখ বরাবর টর্চের আলোটা ফেলল। সেই আলোয় দেখলাম দুটো গনগনে আগুনের ভাটার মত দুটো লাল চোখ...ম্যাকের বন্দুক গর্জন করে উঠল। সাথে সাথে বাঘটাও একটা বিকট গর্জন করে শূন্যে লাফিয়ে উঠে একটা ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে উন্মত্তের মত ঘরঘর শব্দ করতে করতে ছটপট করতে করতে মাটি আঁচড়াতে লাগলো ম্যাকের বন্দুক থেকে আরো দুটো গুলি ছুটে গেল বাঘটার দিকে। বাঘটা পুরো উল্টে গিয়ে অর্ধেক দেহটা জলে পড়ল—তারপর কয়েকটা মোচর দিয়েই চির-কালের মত নির্জীব হয়ে গেল আর কোন দিন সে গর্জন করবে না।

সকাল হতে আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। দেখলাম দলের পুরুষ বাঘটাই ম্যাকের গুলিতে মরেছে।

বাঘটার আকৃতি প্রকাণ্ড। নিখুঁত দেহ। আমরা কিন্তু তবু হতাশ হলাম, কেননা এটা সেই মানুষ খেকো বাঘটা নয়।

প্রথম গুলিটা বাঘটার নাকের ডগায় বিদ্ধ হয়ে উপরের চোয়াল দিয়ে গলায় চলে গেছে। সেই জন্যই আমরা ওর ঘরঘর আওয়াজ শুনে ছিলাম। দ্বিতীয় গুলিটা বিদ্ধ হয়েছে তার কাঁধ দিয়ে তলপেটে। আর তৃতীয়টা হাওয়ায়।

এরপর চারদিন আর কোন ঘটনা ঘটেনি। সবাই ভাবল আমরা মানুষ খেকোটাকে মেরেছি তাই তারা সবাই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। কিন্তু আমরা তো জানি তা আসলে নয়। তাই আমরা তখনও বাংলো ছেড়ে যেতে পারলাম না। কেননা আমরা জানতাম খুব তাড়াতাড়িই আমরা কোন নতুন মানুষ খেকোর খবর পাবো। অবশ্য বাঘটা যদি তার সাথীর মৃত্যুর পর এই অঞ্চল ছেড়ে না যায়।

চারটে দিন আমরা চিতলদ্রুগ পর্যন্ত সমস্ত পথ আর আশেপাশের সমস্ত জঙ্গলের সমস্ত পথগুলো সারারাত ধরে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম।

আমাদের আকাঙ্খিত খবর এল পাঁচ দিনের দিন। সেদিন দুপুর বেলা চিত্তলদ্রুগের তামিলদারের তিনজন লোক এসে খবর দিল, আগের দিন সন্ধ্যার একটু বাদে একটা চোদ্দবছরের ছেলে বাঘের কবলে পড়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটাকে যোগীমঠ পাহাড়ের দক্ষিণ গাঁয়ের একটা কুঁড়ে ঘর থেকে! পাঠককে আগেই জানিয়েছি চিত্তলদ্রুগ সহরের কাছে এই যোগীমঠ, তার মাথায় একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত কেল্লা আছে।

আমরা গাড়ি করে সেই কুঁড়ের কাছে এলাম। কুঁড়ের দরজার সামনে থেকেই গতকাল ছেলেটা বাঘের মুখে গেছে। বলতে গেলে কুঁড়ের দক্ষিণ দিকটা একরকম ফাঁকাই ছিল।

গ্রামবাসীদের ধারণা বাঘটা সেদিক থেকে এসে ছেলেটাকে পাহাড়ের উপরে টেনে নিয়ে গেছে।

তাদের ধারণা যদি সত্যি হয় তবে আমার মনে হল এখনও সে ওই কেল্লার ধ্বংসাবশেষের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাই জন-ছয়েক লোক নিয়ে আমরা পাহাড়বেয়ে উঠতে লাগলাম। জিন্দায়াড়া ছেলেটার দেহাবশেষ তখনও অনুসন্ধান করা হয়নি। আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, এদিকে দিন শেষ হতে হাতে রয়েছে মাত্র চার ঘণ্টা।

খানিকটা ওঠার পর বুঝতে পারলাম, বাঘটা শিকারকে পাহাড়ের যে প্রধান পথ সে নিয়ে যায় নি। কেননা আমরা প্রায় অর্ধেকটা পথ উঠে এসেছি, তবু ছেলেটার কোন ছেঁড়া পোষাকের টুকরো খুঁজে পাইনি।

আমরা ঝোপ জঙ্গল ভেঙে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, সবাইকে সতর্ক করে দিলাম, তারা যেন চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যায়।

এইভাবে প্রায় পাহাড়ের তিন ভাগ উঠে গেছি। এমন সময়

একজন খবর দিল, আমাদের বাঁ দিকে সিকি মাইল মত তফাতে এক জায়গায় বেশ কিছু শকুনকে গাছের উপর বসে থাকতে দেখা গেছে।

ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে ছেলেটার মৃতদেহ দেখতে পেলাম। তার সবটাই প্রায় ইতিমধ্যে শকুনের পেটে চলে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু কটা হাড়। আমার অভিজ্ঞতায় ওই হাড় চিবোতে বাঘ মশাই এদিকে পা মাড়াবে না।

তা সত্ত্বেও ম্যাক তুজনকে সাথে নিয়ে যে গাছটায় শকুনগুলো বসেছিল সে গাছটায় একটা মাচা তৈরী করল।

আমি দেখলাম হাতে যা সময় আছে তাতে কেল্লার ধ্বংসাবশেষটা সামান্য চোখ বুলিয়ে নিতে পারব।

অতএব আবার পাহাড়ের প্রধান পথে ফিরে এসে কেল্লার দিকে অগ্রসর হলাম।

কেল্লার ধ্বংসাবশেষের মাঝে যখন এলাম্ ঘড়ির কাঁটা তখন পাঁচটার ঘরে।

কেল্লার পাঁচিলগুলো প্রায় নেই বললেই চলে, সারা অঞ্চলটা কাঁটাগাছ আর ল্যণ্ঠানার ঝোপে আচ্ছন্ন।

এখানে পৌঁছে আমার চারজন বন্ধু মনস্থ করল তারা বাইরে একটা ডুমুর গাছের উঁচু ডালে বসে আমার জন্য প্রতীক্ষা করবে।

আমি অতি সাবধানে ভাঙা পাঁচিল বেয়ে এগিয়ে গেলাম যাতে পাঁচিলের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিক ভালভাবে দেখতে পারি।

এগিয়ে চলেছি চারিদিকের ঝোপ জঙ্গল ভেঙে, এগিয়ে যাওয়াটা যেমন কষ্ট সাধ্য তেমনি পরিশ্রমজনক।

অবশেষে আমি যখন তুর্গের অপর অংশে এসে উপস্থিত হলাম। তখন আমি রীতিমত হাঁফাচ্ছি। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে গেছে। সিঁদুরে রাঙা সূর্যটা এমন পশ্চিমের আকাশটাকে ম্লান করে পাটে

যেতে বসেছে। আমি সেই অস্তগামী সূর্যের দিকে ফিরে দাঁড়ালাম।

এর আগে বেশ কয়েক বছর আগে আমি একবার কেল্লায় এসেছিলাম। আমার জ্ঞানের ভাণ্ডারে জানা ছিল, অতীতের কোন এক সময় এখানেই ছিল এই কেল্লার কয়েদখানা। চারিদিকে সব ঘর বাড়ির ঠাসা. তাই পাঁচিল ঘেরে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল।

চারিদিকে ল্যান্টানার ঝোপ, তার মধ্যেও নামার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এগিয়ে যেতে গেলে ঐ ঝোপের মধ্যে নামতেই হবে তাছাড়া আমকে তখনও প্রায় দুশো হাত অতিক্রম করতে হবে এদিকে সময়ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।

তাই বাধ্য হয়ে ঐ ল্যান্টানার ঝোপেই আমায় ঝাপ দিতে হল। তবুও যথাসম্ভব নিঃশব্দে ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকি! কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে বুঝলাম এ রকম ভাবে এগোনো দুঃসাধ্য। প্রতি পদক্ষেপে যে ভাবে কাঁটা ঝোপগুলো জামা কাপড় আঁকড়ে ধরছে তাতে সেই সব ভেঙে এগোতে গেলে অনেক আওয়াজ হবে।

আমি জানতাম এই মুহূর্তে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেই জায়গাটা প্রাচীন কয়েদখানার ধ্বংসাবশেষ এর কাছাকাছি। বাঘ যদি লুকোতে চায় তবে এরাই সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।

কথাটা ভাবতেই আমার অন্তর আত্মা সামান্য কেঁপে উঠল। আমাকে যেন আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পূর্বাভাস জানিয়ে দিল, বাঘটা আমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে আর সুযোগ খুঁজছে কখন আমার ঘাড় মটকে ধরবে।

আমার মনে হল আমি যদি এই ঝোঁপ থেকে না বেরোতে পারি তবে সেই সুযোগেই বাঘটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এ রকম বিপদের গন্ধ এর আগেও বহুবার পেরেছি। তাই বাংলোটাকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না, তাই আরো বেশি সতর্কতা

নিয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে উঁচু জমিটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। এগোচ্ছি . এগোচ্ছি .

আর মাত্র ত্রিশ গজ....এগোচ্ছি....মাত্র কুড়ি গজ...আর সামান্য ....মাত্র পনেরো গজ হঠাৎ....হঠাৎ দেখলাম বাঘটা মুখ ভাঁজ করল... সারা মুখে একটা হিংস্রতার ছায়া। আক্রমণের পূর্বমুহূর্ত...কান দুটো পিছনে গুটিয়ে গেছে....হাঁকরা মুখের ভিতর ধারাল দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝক করছে—

আমিও তৈরী—বাঘটা সামনে ঝুঁকে লাফ দেবার আগেই. আমার বন্দুকের গুলিটা তার হাঁ এর ঠিক মাঝখানে বিদ্ধ হল।

আমি অন্ধের মত, উন্মত্তের মত ঝোঁপকাঁটা ভেঙে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম, উঠতে গিয়ে আমার সারা শরীর কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল, সামান্য একটুর জন্য আমার চোখ দুটো বেঁচে গেল। আমার পেছনে এখন এক নারকিয় কাণ্ড ঘটে চলেছে। মাথার পেছনটা গুলিতে থেঁতলে যাওয়া সত্বেও বাঘটা আমাকে ধরার জন্য টলতে টলতে যেন পাহাড় দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। সে মাত্র আর দুগজের মধ্যে ততক্ষণে আমি পনেরো গজ পেরিয়ে এসেছি। পিছন ফিরে দেখি ওর মাথাটা রক্তে রক্তাকার।

আমি আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে পর পর পাগলের মত আরো তিনটে গুলি ওর গায়ে ছুঁড়ে মারলাম।

বাঘটা, পাহাড়টা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে লুঠিয়ে পড়ল।

আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি বলা যায়· ·একটা ভাঙা কুঠুরির আড়ালে বসে প্রচণ্ড কেঁপে চলেছি। এইভাবে পুরো দশটা মিনিট লাগল আমার সামলে উঠতে।

প্রকৃতস্থ হয়ে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য এড়িয়ে ফিরে এলাম সেই ডুমুর গাছটার কাছে।

বাঘের আর্তনাদ আর তার আগে গুলির আওয়াজ শুনে ওরা ধরে নিয়েছিল আমি বোধহয় বাঘের হাতে ধরা পড়েছি ; ওরা তাই

পরামর্শ করছিল রাতটা গাছেই কাটাবে না গ্রামে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে।

আমাকে ওরা স্ব-শরীরে উপস্থিত হতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

ওদের কে নিয়ে আমি আস্তানায় ফিরে চললাম। এক ফার্লং যেতে না যেতেই দুই সাথী সহ ম্যাককে দেখতে পেলাম।

ম্যাক ও আমার গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে তাই তাড়াতাড়ি আমার দিকে ছুটে আসছিলেন সাহায্য করতে।

সামনে এসে আমার সারা শরীর রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্ন ভিন্ন পোষাক দেখে তাঁর মুখ একবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

তারপর একটু বিশ্রামের জন্য সেইখানেই বসে একটু ধূমপান করতে করতে সমস্ত ব্যাপারটা যখন জানালাম তখন ম্যাক আমায় প্রভূত প্রশংসা করল।

একটা কথা না বলে পারছি না। যে মুহূর্তে বাঘটা হাঁ করে·· হিংস্রতার সম্পূর্ণ ছাপ মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তখন আমি আদৌ ভাবিনি যে আবার এমন ভাবে আমার মুখে তামাকের পাইপ তুলতে পারব।

বাঘটাকে নিয়ে গাড়িতে তুলে যখন চিতলদ্রুগে রওনা হলাম রাত তখন অনেক। আমার সন্দেহটাই ঠিক—এটা বাঘ নয়, বাঘিনী—সেই মানুষ খেকোটা। এই বাঘিনীটাই গতকাল ছেলেটাকে হত্যা করে আজ আবার আমাকে পরপারে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল।

সকালে যখন আমরা বাঘটার ছাল ছাড়াচ্ছি ঠিক তখন জামিলদার এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, তাঁর আত্মীয় হুনদুর্গায় সেই ছোট মেয়েটার হত্যাকারী শয়তানটাকে দেখতে এসেছেন।

এছাড়া ইতিমধ্যে শত শত গ্রামবাসীরাও এসে উপস্থিত হলো।

জেলার ফরেস্ট অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীরাও ব্যাঘ্র দর্শনে সমবেত হলেন।

বাঘ দুটোর ছাল ছাড়িয়ে ওখান থেকে ব্যাঙ্গালোর রওনা হতে সন্ধ্যা উতরে গেল।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যপার লক্ষ করলাম যেটা, সেটা হচ্ছে, একই সাথে দুটো বাঘ ঘুরে বেড়াত। অথচ একটা হল গো-খাদক আরেকটা হল নর খাদক।

আরো বলি। বাঘিনীটার ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে এতটুকু বুঝতে পারলাম না কি কারণে বাঘিনী এমন ভয়ঙ্কর নর-খাদকে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাঠকদের ইতিপূর্বে জানিয়েছি। এই জেলায় নরখাদকের কাহিনী বহুদিন ধরেই বংশানুক্রমে চলে আসছে।

আমার ধারণা নর-খাদক পূর্বপুরুষের থেকেই এই বাঘের মানুষের নরম মাংসের প্রতি তীব্র লোভ।

ঠিক একই কারণে ম্যাকের হাতে যে বাঘটা মারা যায় সে গরু মোষ খেয়েই আনন্দ পেত।

এই নভেম্বর থেকে জানুয়ারীর সময়টা হলো ওদের মিলনের সময়। তাই ওরা একসাথে ঘোরাফেরা করত।

এই সময় যদি ওদের মিলন হতে পারত, তবে পুরুষ বাঘটার মধ্যে স্ত্রী বাঘটার নর মাংস লোলুপতা সংক্রমিত হত।

এর ফলে যে বাচ্চা পৃথিবীর মাটিতে আসত। সেও হয়ে উঠত অমনি নর মাংস লোভী।

আর এইভাবেই এই জেলায় বংশানুক্রমে একটার পর একটা মানুষ খেকো বাঘ বৃদ্ধি পেত।

আমরা যে তৃতীয় বাঘটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনা করেছিলাম, অবশেষে দেখা গেল সেটা সম্পূর্ণ অমূলক।

তবুও আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে ফিরে যাবার সময় বলে

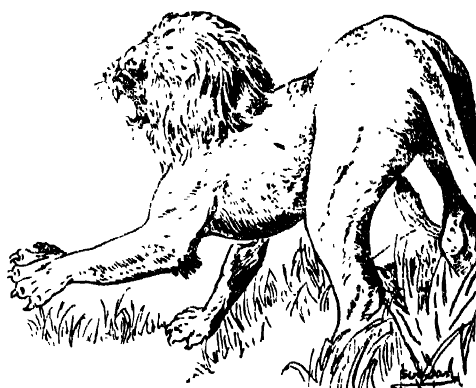
গিয়েছিলাম আবার যদি কোন মানুষ বাঘের কবলে পড়ে তবে আমাদের যেন খবর দেওয়া হয় বাস্তবিক তারপর আর সেই অঞ্চল থেকে আর কোন নর-হত্যার খবর পাইনি।

ফ্রেড টড ও অন্যান্য যে সব ব্যক্তি বাঘের আক্রমণে মারা গিয়েছিল তাদের হয়ে যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছিলাম, সেই প্রতিশোধ নিয়ে আমাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন রাখলাম।

সম্পূর্ণ শিকার উপন্যাস

আফ্রিকান সফারী

জে. এ. হান্টার



জে. এ. হান্টার—অন্ধকারের মহাদেশ আফ্রিকা। সাহারা আর কালাহাণ্ডির অভিশাপ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার অন্তরে আদিম অরণ্যের বন্য সঙ্গীত, তার সর্বত্র নরখাদকদের বেপরোয়া আনাগোনা।

এই রহস্যময় আফ্রিকার বুকে দুঃসাহসী পদক্ষেপে শিকারী জে. এ. হান্টার অসংখ্য প্রাণী শিকার করেছেন আর দুর্দান্ত ঘটনার মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ করেছেন। হান্টারের শিকার তালিকায় আছে বন্য হাতী, ভয়ংকর চিতা, দুরন্ত ময়াল, হিংস্র বাঘ আর রক্তলোলুপ সিংহ।

তাঁর লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সুলেখক ও শিকারী ডেনিয়েল ম্যাকিনস এই পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যে উনি কেনিয়াতে যান, অরণ্যের বাস্তবতা দেখতে।

হান্টারের শ্রেষ্ঠ শিকার কাহিনী—আফ্রিকান সফারী।

এক

১৯২৫ খৃঃ মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে কোন একদিন কেনিয়া শিকার-বিভাগে আমার ডাক পড়ল, ঐ বিভাগের অধিকর্ত্তা ক্যাপ্টেন এ. টি. এ. রিচি, ও. বি ই এম-সির দপ্তরে। ক্যাপ্টেন এমন একটা আকর্ষণীয় প্রস্তাব আমাকে উপহার দিলেন, সেটা মনে হয় ইতিপূর্বে কোন শিকারীর পক্ষে কল্পনারও বাইরে।

ক্যাপ্টেনের এই প্রস্তাবের অর্থ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে কলোনির ঐ স্থানের সেই সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থাটা ভালো করে জানা দরকার।

কেনিয়ার মধ্যবর্ত্তী জায়গায় একটা চওড়া উপত্যকা আছে, সেখানে 'মাসাই' নামে একটা বীর জাতি বাস করে। তীর-ধনুক তাদের চোখে অবজ্ঞার সামগ্রী, কারণ, তাদের মতে, তীরধনুক হোল কাপুরুষের অস্ত্র,—তারা বলে, শত্রুর মুখোমুখি হতে যারা ভয় পায়, তারাই ঐ অস্ত্রের ব্যবহার করে। মাসাইদের যারা তরুণ যোদ্ধা, যাদের নাম হোল ওদের ভাষায় মোরান—তাদের প্রধান খাদ্য হোল দুধ আর তাজা রক্ত। কারণ, তারা মনে করে, যোদ্ধাদের খাদ্য এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এদের চারপাশে আর যেসব জাতি বাস করত, তারা এদের ভয় করত কারণ এদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো শক্তি ও সাহস তাদের কারোরই ছিল না। ওরা বল্লম দিয়ে সিংহ শিকার করে ফেলত,—যারা এ ব্যাপারটা নিজের চোখে না দেখেছে, তারা এ ব্যাপারটাকে একদম অস্বাভাবিক বলেই মনে করবে—এবং এটাই হোল স্বাভাবিক। হিংস্র জন্তু যেমন-নিরীহ ব্যক্তির ওপর অত্যাচার চালায়, প্রাচীনকালে এই মাসাইরাও তেমনি অন্যান্য জাতির ওপর ভর করে নিশ্চিত হয়ে জীবন-যাপন করত।

এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় যে. যে সমস্ত শিকারী প্রাণী—যেমন বাজ পাখি বা বুনো কুকুর এদের কোন শত্রু না থাকায় তাদের, সংখ্যার যে বেশী বৃদ্ধি হয় তা নয়, কারণ, বাঁচবার জন্য এদের এতোই কষ্ট করতে হয় যে তারা বেশীদিন বাঁচে না। এছাড়াও, এদের শক্তি বা

তেজ যতোই থাক না কেন, আসলে এদের শরীর আশ্চর্য-রকমের নরম, —উপরন্তু তাদের শিকার করা প্রাণীর দেহ তাদের চেয়ে শক্ত। এই উক্তি মানুষের পক্ষেও প্রয়োগ করা চলে। উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম করা যখন ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দিলেন, তখন যে সমস্ত উপজাতিরা মাসাইদের আশে-পাশে বাস করত তাদের সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি এক বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি-করল। অন্যদিকে, জীবনের নিয়মধারা সম্পূর্ণরকম পাল্টে যাওয়ার ফলে তখন মাসাই জাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছিল। জীবনধারণের জন্য বেশি করে গরু-মোষ পালনে বাধ্য হোল। এদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে সমস্ত মেলার মধ্যে মারাত্মক মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। হাজার হাজার গরু মোষ মরে গিয়ে, মাত্র কিছু তাদের পরিচয় বহনের জন্য টিকে গেল।

এর সঙ্গে সঙ্গে সিংহের দল নোংরা জিনিষ পরিষ্কার করার ভার নিল। মরা গরু বাছুর খেয়ে সিংহের পাল বেশি রকমের বেড়ে গেল। সাধারণ অবস্থায় যেসব অসুস্থ সিংহ-শিশুরা অসময়ে মারা যেত তারাও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। খুব কম সময়ের মধ্যেই সিংহের পালে সমস্ত মাসাই দেশটা ভরে গেল। এদিকে মহামারীর প্রচণ্ড শক্তি যখন স্তিমিত হয়ে গেল তখন পথে ঘাটে মরা গরু মোষ দুর্লভ হয়ে ওঠায় জ্যান্ত গরু বা মোষের দিকে সিংহের দৃষ্টি পড়ল। তখন অবশিষ্ট গরু-মোষদের সিংহের কবল থেকে রক্ষার জন্য মাসাইরা ঢাল বল্লম নিয়ে প্রস্তুত হোল। কিন্তু দুজন মোরান বা তরুণ বীর যোদ্ধা আহত হওয়ার পরিবর্তে একটা সিংহ মারা পড়ে, আর সিংহের আঘাতে আহত প্রাণী আবার প্রায়শ রক্ত দূষিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কারণ, সিংহের শিকার করা প্রাণীর মাংসের টুকরো সিংহের নখে জমে গিয়ে পচে যায়। এর জন্য নখের সামান্য আঘাতেও নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। এই রকম করে বড় বড় বীরেরা মারা গেলে দলের প্রধানেরা

বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হোল। আগে এরকম হলে অন্য উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মেয়েদের আর গরু মোষ জোর করে কেড়ে নিয়ে মাসাইরা এই ক্ষতির খানিকটা পূরণ করত, কিন্তু এখন সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

আর পেলথর্প নামে একজন কমবয়সী ভদ্রলোক ছিলেন মাসাই রিজার্ভের জেল কমিশনার। তিনি সিংহের-সংখ্যা কমাবার উদ্দেশ্যে একটা ম্যাগাজিন রাইফেল নিয়ে বের হলেন। আমার মনে হয়, ম্যাগাজিন রাইফেল ঘনজঙ্গলের মধ্যে সামনাসামনি যুদ্ধ করার জন্য ঠিক উপযুক্ত অস্ত্র নয়, কারণ একবার গুলি করার পর আবার গুলি করতে দু-সেকেণ্ডের মতো সময় লাগে, আর সম্ভবতঃ এ সময়টাই হোল বিপজ্জনক। আমি অবশ্য লুকোনো জায়গা থেকে বা ফাঁকা জায়গায় ম্যাগাজিন রাইফেলই ব্যবহার করি, কিন্তু ঝোপে-ঝাড়ে দো-নলা বন্দুক ব্যবহারেই অভ্যস্ত। দোনলায় দুটো গুলি ছোঁড়া যায়, এছাড়া প্রয়োজনে একই সঙ্গে প্রায় দুটো ঘোড়াই কাজ করে। প্রথমের গুলিটা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় গুলিটা ছোঁড়া যেতে পারে। আক্রমণাত্মক জন্তুর সামনেই অস্ত্রটি বিশেষ উপযোগী।

বেশীর ভাগ সিংহই বাস করে ঘন ঝোপের মধ্যে, তাই সিংহকে বিনাশ করতে হলে ঘন ঝোপের মধ্যে-ঢোকা দরকার। এ পর্যন্ত মিঃ পেলথর্প ফাঁকা জায়গাতেই কেবল শখের খাতিরেই সিংহ মেরেছেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এবার তিনি একটা সিংহীকে গুলি করলেন। কিন্তু আর একটা গুলি বন্দুকে ভরে নেবার আগেই আহত সিংহী তাঁকে আক্রমণ করে বসল। তাঁকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ধরে ফেলল। একজন স্থানীয় পুলিস ঠিক সেই সময়ে সিংহীটাকে গুলি করে তাঁকে রক্ষা করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। মিঃ পেলথর্প কিন্তু এই সামান্যতেই বেশ আহত হন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ক্যাপ্টেন রিচি বললেন, 'পেলথর্পের অভিজ্ঞতার পর সাধারণ

শিকারীর হাতে আর এ ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় না। এ কাজ অভিজ্ঞ শিকারীর। দীর্ঘ আলোচনার পর তুমিই এ কাজের উপযুক্ত বলে শিকার-বিভাগ কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। সিংহের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, ওদের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস করে ফেলতে হবে তিনমাসের মধ্যেই। ওদের চামড়াগুলো মাইনে হিসেবে তোমার।'

সব-সেরা কালো-কেশরী সিংহের চামড়া এক-একটা কুড়ি পাউণ্ড করে, আর তিন পাউণ্ড করে সিংহীর চামড়া তখন বিক্রি হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, এতে বিপদের সম্ভাবনাও প্রচুর, কিন্তু এতে করে সংসারেও প্রচুর টাকা আসবে। এরই মধ্যে চারটি সন্তান হয়েছে আমাদের, কেনিয়ার মত জায়গায় ছেলেপুলে মানুষ করতে যে এতো খরচ হয়, তা আমার চিন্তারও অতীত ছিল —আশ্চর্য!

হিলডার কাছে সন্ধ্যাবেলা কথাটা পাড়লাম! কোন অভিজ্ঞ শিকারীর কাছে ঝোপের মধ্যে দশটা কি তার বেশী কুড়িটা সিংহ মারা এমন একটা কিছু মারাত্মক বিষয় নয়; কিন্তু কম অথচ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একশোটা সিংহ মারতে গেলে যে কোন সময়ে বিপজ্জনকভাবে আহত হতে পারেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হিলডারের মাথায় একটা সুন্দর পরিকল্পনা জন্ম নিল। সে বলল, 'মনে আছে, ঙরোঙরায় সিংহশিকারের সময় ক্যাপ্টেন হার্স্টের কুকুরের পালের কথা? তোমার খুব কাছে তো তারা এসেছিল। কুকুরের সাহায্য এ ব্যাপারেও নিয়ে দেখতে পার।'

মতলবটার চমৎকারিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্স্টের ভাই তো তাঁর কুকুরগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন, এরকম ভালো জাতের এক পাল কুকুর আর কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না। শেষ পর্যন্ত নানা জায়গায় ভালো কুকুরের বৃথা খোঁজ করার পর নাইরোবির কুকুরের ঘাঁটিতে গেলাম। কাজের অভাবে নানা জাতের বাইশটা কুকুর অকর্মণ্য হয়ে প্রায় মরতে বসেছে।

এদের জাতের বিভিন্নতার সাথে সাথে এদের আকার এবং চেহারাও আলাদা। আমার কাছে তারা বেঁচে যেতে পারে এই মনে করে প্রত্যেকটার জন্য দশ শিলিং খরচ করে সব কুকুরগুলোই কিনলাম। হিলডার যখন দেখল সিংহ শিকারের কুকুর এগুলো তখন তার মুখটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল—আবার এর ওপর দেখা গেল এটুকু শিক্ষাও তাদের নেই, যেটুকু শিক্ষা অন্ততঃ বাড়ির কুকুরগুলোরও থাকে। সমস্ত দিন ধরে ঘেউ-ঘেউ করছে আর বীভৎস রকমের চেঁচাচ্ছে সমস্ত রাত ধরে, সদাসর্বদা পরস্পরে মারামারি কামড়া-কামড়ি করছে। সে যা হোক, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওদের মোটামুটি সুসংবদ্ধ করে ফেললাম, এবার মাসাই রিজার্ভে যাওয়া যেতে পারে বলে মনে হোল।

বনের বিভিন্ন জায়গায় টোপ বহন করার জন্য সরকার থেকে ছ'টা বলদ দেওয়া হোল। আমি বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে রইল কুকুরের পাল, এই মন্থরগতি জানোয়ার আর কতকগুলো স্থানীয় কুলি নিয়ে।

নাইরোবি থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কন্‌চা পর্যন্ত প্রধান রাজপথ ধরে গেলাম। তারপর সেখান থেকে পশ্চিম দিকে। ক্রমান্বয়ে একদিন চলবার পর বন ক্রমে পাতলা হয়ে এল, আমরা এলুম একটা সমান জায়গায়। কিকুয়ুদের বাড়ী আর প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এই কিকুয়ুরা কৃষিকার্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, দীর্ঘদিন ধরেই এই মাসাই জাতি এদের ওপর নানারকম অত্যাচার করেছে, লুটপাটও করেছে। পেছনে পড়ে রইল চাষের ক্ষেত, এখন সামনে খালি ঘাসে ঢাকা চওড়া জমি, এর এখানে ওখানে প্রচুর শিকার ছড়ানো রয়েছে, ঘুরে বেড়ানোর পথে এই স্থান উপযুক্ত। সেই কোন প্রাচীন কাল থেকে ওই জায়গায় জেব্রা আর অন্যান্য বুনো জন্তুদের পাশাপাশি মাসাইরা তাদের গরু মোষ চরাত। এখানকার বায়ু শান্ত এবং বিশুদ্ধ; শ্বাস, প্রশ্বাসের পক্ষে আনন্দদায়ক। এই প্রশস্ত রাস্তার সামনে কোন বাড়ি বা কোন রাস্তা বাধাদান করেনি। রিজার্ভের বন্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চলছি।

হিলডা সঙ্গে না থাকলে নাইরোবিতে ফেরার জন্য আমার কোন চিন্তাই থাকত না, কারণ এই আফ্রিকা হোল ঈশ্বরের আদিমসৃষ্টির অনুরূপ। শ্বেতাঙ্গ মানুষের দ্বারা গ্রাম আর গোলাবাড়ি তৈরী করার মাধ্যমে এর সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার আগের রূপ। যেখানে থামতে হোত সেখানে রাত্রি যাপন করতাম, আর ভোরের বেলা পাহাড়ের বুকে সূর্য ওঠার আগেই আবার বেরিয়ে পড়তাম, অনির্দেশপথে কুলীর হাত ধরে চলতাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ তাঁবুর চারদিকে সিংহের গর্জন শোনা গেল, তখন আমরা রিজার্ভের মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছি। তাদের গভীর অথচ টানা টানা উচ্চারণে বোঝা গেল যে তারা পুরুষ সিংহ। পরের দিন সকালবেলায় আমি প্রথম মাসাইদের দেখতে পেলাম। তারা তাঁবুর কাছে এগিয়ে এসে বল্লমের ওপর ভর করে খুব সাহসের সঙ্গে আমার দিকে তাকাতে লাগল। এতদিন আমার চোখে দেখা আদিবাসীদের থেকে এরা একেবারে স্বতন্ত্র—বেশ লম্বা এদের শরীর, অথচ এদের নরম ও সুন্দর মুখ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে এদের সুন্দর করেছে। এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে বা এই মাসাইদের উত্তর পুরুষ হোল প্রাচীনকালের মিশরীয়রা সেই কালে কোন এক অজানিত কারণে তারা বাধ্য হয়েছিল দলে দলে জঙ্গল অভিমুখে চলে আসতে। এই তরুণ শিকারী বা মোরানদের মুখ লালরঙে বিচিত্র শোভায় শোভিত, হাঁড় গুঁড়ো করা খড়ি দিয়ে আঁকা হয়েছে সেই ছবির সীমারেখা। তাদের পরনে মাত্র এক টুকরো কাপড়,—আর একটা কম্বল কোনরকমে শরীরটাকে জড়িয়ে কাঁধের কাছে গেরো করে বাঁধা আছে।

ওরা যখন শুনল যে আমি সিংহ শিকারের জন্য এসেছি এখানে, তখন মনে হল একটা মজার কথা শুনছে। তারা বলল বা, খালি বন্দুক নিয়ে সিংহ শিকার করতে গেলে আমি বিপদে পড়ব,—তাদের মতে, সিংহ শিকারের পথে বল্লম হোল উপযুক্ত হাতিয়ার।

বন্দুক তাদের চোখে আড়ম্বর বস্তু,—প্রাচীনকালে তারা একবার, আরব বাসী ব্যবসায়ীদের সহজেই পরাস্ত করেছিল, সেই থেকেই তাদের এইরকম মনোভাব। এই আরবের সঙ্গে প্রাচীন কালেই সেই গাদা বন্দুক ছিল।

বোধ হয়, আমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই, এদের একজন বলল, তাঁবু থেকে কিছু দূরেই অবস্থান করে, এমন দুটো সিংহের সংবাদ সে জানে। ওর সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে ওর কথা সমর্থন করল, সে বলল, সিংহ দুটো খুবই সুন্দর এবং সে খুব খুশীও হবে যদি সিংহ দুটোকে শিকার করতে আমার সঙ্গ লাভ করে। এরকম খুঁতখুঁতে লোকের সামনে প্রথম সিংহ শিকারে প্রবৃত্ত হতে আমার ইচ্ছে হোল না। প্রথমকথা, আমার কুকুর গুলো অনুশীলনে মার্জিত নয়, তাছাড়া এও আমার জানা নেই যে সিংহ দুটোর অবস্থান ঝোপ না ফাঁকা জায়গায়।

যেভাবে ওরা আমার দিকে অবজ্ঞার সঙ্গে তাকাচ্ছিল তার জন্য বাধ্য হয়েই আমি সম্মত হলাম ওদের সঙ্গে যেতে। ওদের পথ নির্দেশের আজ্ঞা দিয়ে কুকুরগুলোকে খুলে দেবার জন্য কুলিকে বললাম।

মাসাইদেব পেছন পেছন একটা শুষ্ক নালাব সামনে এসে উপস্থিত হলাম,—বর্ষাকালে এখানে প্রচণ্ড বেগে জলের স্রোত বইত। পায়ের নীচেব বালিতে সেখানে সিংহেব পায়ের ছাপ পড়েছে, তাই দেখে দেখে মাসাইরা তাড়াতাড়ি কোন কষ্ট না করেই এগোতে লাগল। সন্দেহের সঙ্গে এই অজানা গন্ধ পরীক্ষার সঙ্গে শুঁকতে শুঁকতে কুকুরগুলোও এগোতে লাগল।

এঁকেবেঁকে চলবার সময় একটা মোড় অতিক্রম করতেই দেখা গেল বালির উপর দুটো সিংহ বিরাট দুটো বিড়ালের মতো সোজা হয়ে শুয়ে আছে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে তারা তীক্ষ্ণ ভাবে রাগী চোখে তাকাতে লাগল। তাদের এতকালের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুকে সামনে একবার দেখেই প্রায় সব কুকুরগুলোই চীৎকার

করতে করতে ছুটে পালাল। কখনো তারা সিংহ দেখেনি, ভাবতেও পারে নি এমন কোন পশু থাকতে পারে। কিন্তু চারটে যে এয়ারডোন কুকুর ছিল, তারা সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল।

কি আমার, কি মাসাইদের, তখন আর চিন্তা করারও অবকাশ নেই। দুজন মাসাই বল্লম তুলে আক্রমণের অপেক্ষায় থাকল—সে দৃশ্য চমৎকার! তাড়াতাড়ি আমি গুলি করলাম বড় সিংহটার বুক লক্ষ্য করে। গুলি লেগে সিংহটা পেছিয়ে গেল। তারপর রাগের সঙ্গে গর্জন করে আওয়াজ তুলে একপাশে কাত হয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে যেটা ছিল সেটা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল নালার বাম দিকে অবস্থিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই মরা সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এয়ারডোন কুকুরগুলো কামড়াতে লাগল। প্রাণের আনন্দে তারা টানাটানি শুরু করল মরা সিংহটার কেশর। আমি কোন বাধা দিইনি, তারপর যখন দলের অন্যান্য কুকুরগুলোও ভয়ে ভয়ে ফিরে এল, আমিও তখন তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলাম।

অবশিষ্ট যে দুটো কুকুর যারা সাহসের পরীক্ষায় খানিকটা উত্তীর্ণ হয়েছিল,—আমার মনে হোল বোধহয় আমি এই ছটা কুকুরকে উপযুক্ত করে ফেলব সিংহ শিকারের পূর্বে।

কুকুরগুলোর আক্রোশ যখন স্তিমিত হয়ে এলো মরা সিংহটার ওপর থেকে, তখন আমি তাদের সেই ঝোপের কাছে নিয়ে গেলাম যেখানে অন্য সিংহটা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। তার কাছে যেতেই সিংহটা চাপা নিম্নস্বরে গর্জন করে সতর্ক করে দিল। এয়ারডোন আর বাকী কুকুরগুলো রাগে চেঁচাতে চেঁচাতে তেড়ে গেল ঝোপটার সামনে আর অন্য কুকুরগুলো ঝোপটাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে চেঁচাতে লাগল, কিন্তু সাহস করল না সামনে এগোতে। একটা মাসাই একটা বল্লম মারতেই খানিকটা এগিয়ে এল সিংহটা; একটা এয়ারডোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভাব দেখাতে লাগল সিংহটা, আর আমার গুলি করার সুযোগের আগেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বের জায়গায় ফিরে গেল।

এর মধ্যেই কুকুরগুলোর সাহস বেড়েই চলল। ঝোপের ওপরের দিকের শাখার আন্দোলন থেকে সিংহের নির্দিষ্ট অবস্থানটা অনুভব করতে পারছি। যে সমস্ত কুকুর বেশী সাহসী ছিল তারা গুঁড়ি মেরে ঝোপের ভেতর কিছুটা ঢুকে চেঁচাতে চেঁচাতে সিংহটাকে বাইরে বের করে আনার চেষ্টা করতে লাগল। সিংহটা অল্প সময়ের মধ্যেই যে বেরিয়ে আসবে তা বুঝতে পারলাম; তাই আমিও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলাম।

আচমকা ঝোপঝাড়গুলো ভীষণভাবে দুলে উঠল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিংহটা ভয়ঙ্কর ভাবে তেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। দুটো কান তার পেছন দিকে হেলে রয়েছে—পৃষ্ঠদেশ বঙ্কিম আকার ধারণ করেছে,—মনে হোল একটা জ্যান্ত আগুনের গোলা আমার দিকে তেড়ে এলো। সে যেন ঝাঁপিয়ে ওপর দিয়ে উড়ে এলো। একটা এয়ারডোন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে একেবারে ওর সম্মুখে এগিয়ে এলো, অতিকায় সিংহটার গলা কামড়ে ধরতে সচেষ্ট হোল। শিশু যেমন অনায়াসেই তার খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সিংহটাও তেমনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গতির বেগ অব্যাহত রেখে সে ধাবিত হোল আমার দিকে,—আর যারা চীৎকার করে তাকে বিরক্ত করছিল তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

আমি গুলি করলাম দশ গজের মধ্যে এসে পড়তেই। ঠিক দুচোখের মাঝখানে গুলিটা বিঁধে গেল আর একটুও নড়াচড়া না করে সিংহটা মাটিতে পড়ে গেল। সকালের ঠাণ্ডা শান্ত বাতাসে ছোট্ট গুলির গর্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ধোঁয়াটা পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

মাসাইরা আনন্দের চোটে যুদ্ধের নাচ নাচতে আরম্ভ করে দিল। একদিকে যুদ্ধের উত্তেজনা, তার ওপর আবার ঐ দুটো সিংহের মরা দেহ—নিজেরাই নিজেদের দখলের বাইরে চলে গেল। বল্লমটাকে খাড়া করে ধরে, কোমরটাকে পিছন দিকে রেখে তারা সামনের দিকে

হেলে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরেই হঠাৎ সিধে হয়েই সঙ্গে সঙ্গে আগের মতোই ঝুঁকে দাঁড়াল আবার উত্তেজনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ওদের এই আশ্চর্য রকমের অঙ্গচালনার গতিও বৃদ্ধি পেতে লাগল,—শেষ পর্যন্ত ওদের আচরণ ঠিক যেন পিস্টনের মতো হয়ে দাঁড়াল। এই ধরণের অবেগ আশ্চর্য রকমের ; মাসাইদের এই ব্যবহার অতি সাধারণ। ওদের সঙ্গে বাস করে যেসব শ্বেতাঙ্গরা তারা একে 'কাঁপুনি' বলে। এ ধরনের ব্যাপার এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি ; তাই আমার পক্ষে বোধগম্য হয় না, যারা ক্রুদ্ধ সিংহের আক্রমণকে সামান্য বল্লমমাত্র দিয়ে বাধা দেয়, তার পক্ষে এরকম মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মতো আচরণ করা কিভাবে সম্ভব হয়।

সিংহটাকে মেরে ফেলে যে আনন্দটা আমার মধ্যে এসে গেছিল, তা প্রতিহত হল তখনই যখন দেখলাম মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে থাকা সেই এয়ারডোন কুকুরটাকে যেটা সিংহের মুখোমুখি হয়েছিল।

যে সমস্ত কুকুর যারা ভয় পেয়ে দূর থেকে খালি ঘেউ ঘেউ করছিল তারা এমন বীরত্বের সঙ্গে কামড়াতে লাগল মরা সিংহটাকে, যেন মনে হচ্ছিল তারা কতোই সাহসী। অথচ অনুযোগহীন এই কুকুরটা যে একটু আগে প্রচণ্ড বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল সে এখন মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সমস্ত কষ্ট থেকে তাকে নিস্কৃতি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই আমার করার ছিল না। সিংহের একেবারে মুখোমুখি হওয়া মানেই হোল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, কোন কুকুরের পক্ষেই একটা সিংহের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

নিরাপদ দূরত্ব রেখে চীৎকার করাই হোল কুকুরের কাজ,—কামড়ানো কখনোই উচিত নয়, যদি না তার মনিব অথবা তার বন্ধু সিংহের খপ্পরে না পড়ে। বহুবার আহত হয়ে ক্যাপ্টেন হার্স্টের কুকুরদের এই শিক্ষাই ভালো করে জানা হয়ে গিয়েছিল। সে শিক্ষা গ্রহণের পূর্বেই হতভাগ্য এয়ারডোন মারা পড়ল। তার মৃত্যু থেকে বাকী কুকুরগুলো এই শিক্ষাই পাবে—এটাই এখন আমার একমাত্র আশা।

অদূর ভবিষ্যতে ওদের শিকারে উৎসাহ জানানোর জন্য মরা সিংহটাকে আমি টেনে এনে কুকুরদের সামনে ফেলে দিলাম। প্রথমে এটা তাদের কাছে প্রিয় হয়নি কিন্তু শেষপর্যন্ত খাবলা খাবলা করে এই মাংস খাবার জন্য তাদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হতে চলল। সিংহটার চামড়াটা কুলিদের দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরলাম তাঁবুর দিকে।

আফ্রিকায় বেতারের মতো তাড়াতাড়ি সংবাদ ছড়ায়। একদল তরুণ বীরকে আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকতে দেখলাম, যখন আমি তাঁবুতে ফিরলাম তখন। মনে হয় গুলির শব্দ পেয়েই ওরা তাড়াতাড়ি চলে এসেছে—এ ছাড়া অন্য কারণ আমার চিন্তার বাইরে ছিল। তখন আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবল হোল,—আগের সেই মাসাই দুটো সংবাদ দিল যে ওরা আমায় এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে সেখানে এখানের থেকেও সিংহের সংখ্যা বেশী। ওরা আমাকে এখুনিই নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই আমি আপত্তি করলাম, বললাম যে কালকের আগে তাঁবু গোটান একপ্রকার অসম্ভব।

বন্দুকের লক্ষ্যটা একমুখী করতে করতেই সমস্ত বিকেলটা কেটে গেল, কারণ যে দুটো গুলি দিয়ে আমি সকালে সিংহ দুটোকে মেরেছিলাম, সে দুটো সেখানে বিদ্ধ হয়নি। হওয়ার কথা ছিল যেখানে কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, আর লক্ষ্য করছিলাম ভালো করে যে ওরা গুলির শব্দ শুনে কি করে। দেখলাম একটা মাত্র কুকুরই গুলির শব্দ শুনে ভয় পায়, তাই দিয়ে দিলাম সেটা একটা বুড়ো মাসাইকে, কুকুরটা পেয়ে সেও খুশী হোল।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম পরদিন ভোরবেলায়,—ঘাড়ের ওপর মোষের চামড়ার বিরাট ঢাল ফেলে আর বল্লম উঁচিয়ে মাসাইরাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ডের এই ঢালগুলো, অথচ জোয়ানরা সেগুলো হাল্কা পালকের মতো বয়ে নিয়ে চলল। লাল, কালো, সাদা বিভিন্ন রঙের অনেক বিচিত্র ছবি তাতে আঁকা। মাসাইরা ঢাল দেখে বলে দিতে পারে কোথায় বাস এদের মালিকের, কোন জোয়ান দলের

যোদ্ধা সে, সেই দলে তার স্থান কীরকম। সে সভ্য কোন বয়সের সৈন্যদলের, তার নাম কি আর সিংহ শিকারে কিংবা যুদ্ধের ব্যাপারে সে করেছে কটী কি বীরত্বের কাজ।

দুপুরবেলা এমবারাশা পর্বতমালার পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। অসংখ্য বুনো ফুলে আর কোমল ছোট ছোট ঘাসে ভর্তি সুবৃহৎ শৈলশিরাগুলি পাহাড় থেকে নেমে গেছে উপত্যকার বুকে—যোদ্ধারা সেই শৈলশিরায় উঠে গেল ঠিক যেন হরিনের মতো লাফাতে লাফাতে। বেশী ওপরের বল্লমগুলোকে নিয়ে কিন্তু বিপদ হোল, অনেক কষ্ট করে অনেক এঁকে বেঁকে তারপর তারা ওপরে উঠল। একটা শৈলশিরার ওপরে উঠে দু মাইলের মত সমান জায়গা, তারপরেই আবার নামতে হবে কারণ এর পরেই আর একটা উপত্যকা। এভাবে কিছুক্ষন নামা আর ওঠার পালা চলতে লাগল।

সেখানে একটা ঝোপের পাশ কাটিয়ে স্রোতহীন কাদাভরা একটা নদীর পাড়ে আমরা এলাম। এসে দেখলাম বড় বড় শিংবিশিষ্ট গরুদের একদল বয়স্ক পুরুষ ও রমনী জল খাওয়াচ্ছে। গরুগুলোর আকৃতি যেমন কতকটা ষাঁড়ের মতন, অনুরূপ কুঁজও তেমনি তাদের পিঠে। তাদের গায়ের নানারঙ, এই রঙ দেখেই তারা কোন বংশে জন্মেছে তা মাসাইরা বুঝতে পারে।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বৃদ্ধলোকগুলো আমাদের চারপাশে জড় হল। আর মোরানরা ব্যস্ত হোল ওদের চেঁচিয়ে বোঝাতে বল্লমের নাড়াচাড়ায় হাত পায়ের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে, কেমন করে আমি ঐ সিংহ দুটোকে শিকার করেছি সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে। ব্যাপারটা শোনার পর দেখলাম, বুড়োগুলোর মুখ কিরকম যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর অতিরিক্ত উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে শিশুরা খুব উৎসাহী হয়ে জোয়ানদের হাত-পা নাড়া নকল করতে লাগল। যখন শুনলাম যে দিনকয়েক আগে সিংহের আক্রমণে ছটা দামী গরু মারা পড়েছে

আর দুজন রাখাল তাদের রক্ষা করতে গিয়ে মারা পড়েছে সিংহের হাতে, তখন বুঝলাম যে উপযুক্ত জায়গাতেই এসে উপস্থিত হয়েছি।

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ওদের গ্রামে ওরা আমায় নিয়ে চলল। মনে হয়েছিল এখানেও কিয়ুকুদের মতো প্রচুর চালাঘর চোখে পড়বে, কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত কোন বোঝবারই যো নেই যে এখানেও গ্রাম আছে একটা। যতক্ষণ না ওপরে ওঠা যায়, ঘন নিবিড় ঝোপ ছাড়া আর যে কিছু আছে তা ভাবাই যায় না। মানুষের সমান কাঁটাঝোপের 'বোমা' দিয়ে গ্রামের চারদিক ঘেরা, আর বুক সমান বাড়ীগুলো উঁচু। ঘরগুলো তৈরী করা হয়েছে ওয়াট্‌ম্‌ গাছের কাঠামোর ওপর গোবর মাখিয়ে,—অবশ্য তাতে কোন গন্ধই পাওয়া যায় না, কারণ, গোবর গুলো ইটের মতো শক্ত হয়ে গেছে রোদে পুড়ে পুড়ে। প্রায় অর্ধেক নীচু হয়ে ঘরে ঢোকা গেল। বেশীর ভাগ আদীবাসীদের বাড়ি যেরকম হয়, সেরকম নয়,—ওয়াট্‌ম্‌ দিয়ে ছোট ছোট ভাগে-ভাগ করা হয়েছে কুটির গুলোকে। দেওয়ালে একটা মাঝারি রকমের গর্ত, এছাড়া জানলা বলে আলাদা কিছু নেই। বাড়ীর ভেতরটায় আলো না থাকলেও, সেখানটা তৃপ্তিকর রকমের ঠাণ্ডা।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ওদের মেয়েরা কমলারঙের একটা সরু গলা লাউয়ে করে দুধ খেতে দিল। সেটা খেয়ে আমি মরা গরুগুলোকে ভালো করে দেখার জন্য বাড়ী থেকে বেরোলাম। কিন্তু মাসাইরা তাদের প্রায় সমস্ত মাংসটাই নিয়ে গেছে দেখে আমি দুঃখিত হলাম। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সিংহকে মাংসের লোভে তার শিকারের কাছে ফিরে আসতে দেখা যায়—তাই। মরা জন্তুর মাংস চমৎকার টোপের কাজ করে। মাসাইদের ক্রমশ বুঝিয়ে বলতেই তারা বলল, এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা মরা বাছুর পড়ে আছে, সেটার মাংস ছোঁয়ই নি কেউ। মরা বাছুরটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম,

এখনও তার দেহে যথেষ্ট মাংস আছে যদিও তার পুরো পেটটাই সিংহটা খেয়ে গেছে। ঝোপের মধ্যে সেই দুটো রাখালের মৃতদেহও পড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সিংহ আর হায়না তাদের দেহের সবটুকু মাংসই খেয়ে ফেলেছে। মাসাইরা জঙ্গলের স্বাভাবিক মুর্দাফরাসের ওপরেই মৃতদেহের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়, নিজেরা মরা দেহটাতে মাটি খুঁড়ে কবর দেয় না।

আসলে এই সিংহগুলোকে ঠিক মানুষখেকোর পর্যায়ে ফেলা যায় না। তখনই তারা রাখালদের মারতে সচেষ্ট হয়, যখন তারা তাদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। দেখা গেছে এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে সিংহ যেমন কোন বুনো জানোয়ারকে আক্রমণ করে তখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যতোটা সহজ হয়, ঠিক ততোটা সহজ হয় না, বরঞ্চ একরকম অসম্ভবই হয়, কোন গৃহপালিত জন্তুকে সিংহের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো, কারণ, সে তার শিকারকে প্রাণপনে আঁকড়ে থাকে।

সিংহের ছাপ দেখে এগোতে এগোতে দেখলাম সেটা ঢুকেছে একটা ঘন পাতা ঘেরা ঝোপের মধ্যে। সে কখন রাত্রি হবে তার জন্য অপেক্ষা করছে, কখন আবার সে ফিরে যাবে তার শিকারের কাছে। মাসাইরা বললে তারা যখন সন্ধ্যাবেলা তাদের গরু মোষ নিয়ে বাড়ী ফেরে তখন তারা জন্তুদের তাড়া দেয় চীৎকার করে। সিংহ এই চীৎকার শুনেই বুঝতে পারে যে তার পথে আর কোন বাধা নেই, তখন একটু পরেই সে ফিরে আসে তার শিকারের কাছে।

সেদিন একটু বিকেল থাকতে থাকতেই ওদের গরুমোষ নিয়ে ফিরে আসতে বললাম, কারণ, মরা বাছুরটাকে আগলে লুকিয়ে থাকব আমি। বুড়োরা খুব খুশী হোল একথা শুনে, এই ষড়যন্ত্রটা নিশ্চয়ই সফল হবে একথাও বলল তারা—কারণ নান্দীদের এই চালটা যুদ্ধের সময় প্রত্যেকবারই সফল হয়েছে। আর এক রকমের যোদ্ধা জাত হলো এই নান্দীরা, মাসাইদের সঙ্গে এরা মাঝে মাঝে সংঘর্ষে লিপ্ত হোত।

মাসাইরা যখন খবর পেত যে নিকটবর্তী স্থানে কোন নান্দী যোদ্ধাদলের অবস্থান ঘটেছে তখনই তারা প্রচণ্ড চেঁচামেচি হট্টগোল করে তাদের গরুমোষ কেড়ে নিয়ে ঘরে ফিরত। আর যেই না নান্দীরা মাসাইরা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে ওদের গ্রাম আক্রমণ করত অমনি আচম্‌কা মাসাইরা আক্রমন করে ছত্রভঙ্গ করে দিত এদের। আমি মরা বাছুরটার কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে সন্ধ্যায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক সূর্য যখন পশ্চিমের কোণে ডুবে গেল তখন গরুমোষদের ঘরে ফেরার সঙ্কেতসূচক মাসাইদের বিকৃত অথচ খুব জোরে আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু একটু করে ক্রমশঃ ওদের গলার আওয়াজ নিস্তেজ হয়ে যেতে শুনতে পেলাম।

অকস্মাৎ কুকুরের মতো তিনটে কেশরী সিংহকে বসে কান খাড়া করে এই ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাওয়া শব্দটা শুনছে দেখতে পেলাম। শব্দটা যখন আস্তে আস্তে মিশে গেল বাতাসের সঙ্গে তখন একএক কবে সিংহগুলো আমার দিকে এগিয়ে এল। প্রত্যেকটা স্নায়ু আমার শক্ত হয়ে উঠল, কখন ওরা আমার বন্দুকের আওতার মধ্যে আসে আমি তারই অপেক্ষা করতে লাগলাম। যদিও গরুটাকে ওরা যেখানে মেরেছিল সেখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবুও যেখানে ওরা ওটাকে হত্যা করেছিল সেখানে হাজির হয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। প্রত্যেকটা সিংহ গন্ধশোঁকা শেষ করে মাথা তুলল। তাদের মুখে আশ্চর্য রকমের একটা ভাব ফুটে উঠল ; রাগে গর্জন করার সময় যেরকমভাব ফুটে ওঠে মনে হোল সেরকম কিছুটা, অবশ্য এটা হোল আকাল গভীর ভাবে গন্ধ নেবার চেষ্টা।

সিংহগুলো কিন্তু এখনো বন্দুকের নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে। আমি যখন অপেক্ষা করছি, সেই সময় আমার থেকে কয়েক ফুটের ব্যবধানে একটা শকুন এসে নামল। আমায় ঝোপের মধ্যে দেখে বোধহয় কোন খাবার জিনিস বলে মনে করেছে। শকুনটা একটুও

যাতে ভয় না পায় সেজন্য আমি একদম নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইলাম, কারণ, শকুনটাকে ভয় পেতে দেখলেই সিংহেরা সতর্ক হয়ে যাবে।

শকুনটাকে সিংহেরাও দেখতে পেয়েছিল। সিংহেরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল, তারা মনে করেছিল শকুনটা বোধ হয় কোন খাবারের সন্ধান পেয়েছে। কুকুরের মতো মাথা তুলে শকুনটার গন্ধ নিতে নিতে তারা এগোতে শুরু করল। আমরা বিশ গজের মধ্যে না আসার আগে আমি গুলি করলাম না। এতক্ষণ শকুনটা তার কালো চোখে আমায় লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ বিরাট ডানা মেলে ভয় পেয়ে সে উড়ে গেল। ভয় পেয়ে যাওয়া শকুনটার দিকে সিংহরাও থেমে গিয়ে তাকাল, তারপর ফিরে গিয়ে আবার আরও সতর্ক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল আমায়।

আমি তখনো তেমনি ঝুঁকে ছিলাম, কিন্তু দরকার একটু উচু হওয়ার গুলি করতে। কারণ মনে হোল, যেন কতযুগ ধরে আমি খুব আস্তে আস্তে অত্যন্ত সাবধানে যতোটা দরকার ততোটা উঁচু হলাম। যদিও তখনও সিংহের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। রাইফেল তুলে বুড়ো আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে যা লক্ষ্য করলাম সামনের সিংহটার দিকে তাক করে। সে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই মরে পড়ে গেল। একলাফে বাকি সিংহদুটো পিছিয়ে গেল, পালিয়ে গেল না কিন্তু। যেমন জন্তু আগে কখনও বন্দুকের আওয়াজ শোনেনি, তারা এতে খুব বেশী ভয় পায় না, কারণ, বোধহয় একে তারা বজ্রাঘাত বলে মনে করে। দ্বিতীয় সিংহটাকে গুলি করতে গুলিটা কাঁধে গিয়ে বিদ্ধ হোল তার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাগে হুঙ্কার দিতে দিতে ঘুরে দাঁড়ালো এক পাক, আর তৃতীয় সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর সঙ্গে সঙ্গেই। শুরু হোল দুজনের মারামারি। রাগে তৃতীয় সিংহটা উন্মাদের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে, খাড়া হয়ে উঠেছে তার গায়ের লোম ; প্রকাণ্ড মুখব্যাদান করে সে চায় তার সঙ্গির মাথায় খুলি কামড়ে ধরতে ;

তৃতীয় সিংহটার কাঁধে এবার আমার গুলি গিয়ে লাগল। ঘোড়ার মতো পেছনের দুপায়ে ভর করে সে লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে'ই, আর আমার দ্বিতীয় গুলি তাঁর কাঁধে সেই অবস্থাতেই গিয়ে বিদ্ধ হোল। সিংহটা পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, নড়ল না পর্যন্ত একটুও। এর আগেই দ্বিতীয় সিংহটা মারা পড়েছে, সঙ্গীর কামড়ে কিংবা আমার গুলির আঘাতে লেগেই।

দূর থেকে শোনা গেল মাসাইদের উৎফুল্ল চীৎকার,— ওরা শুনেছে আমার বন্দুকের আওয়াজ। তারা ঝোপঝাড় ভেঙ্গে ছুটে এলো। যারা একটা শত্রু মারা গেলে আনন্দের আতিশয্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, তিন-তিনটে সিংহকে একসঙ্গে মারা পড়তে দেখে তাদের উল্লাসের সীমা ছাড়িয়ে গেল। গ্রামে পদার্পণ করলাম আমরা যুদ্ধ করে বিজয়ীর ভূমিকা নিয়ে। একটা ভেড়া আমার সামনে মেরে, পরে আগুনে তার পাঁজরের মাংসটা ঝল্‌সিয়ে আমায় দেওয়া হোল খেতে; রাত্রের মাংসের চাইতেও সুস্বাদু খেতে হোল। মাটির পাত্রে মেয়েরা 'পম্‌বে' নামে দেশী বিয়ার নিয়ে এল। দুহাতে ধরে এক ঢোক পান করে পাশের লোককে দিল—এভাবেই প্রত্যেকের কাছেই পানপাত্রটা ঘুরতে থাকল। ক্রমে চোখে নেশা লেগে যেতেই ঘন হয়ে থোলি কপালের দিকে লাফিয়ে ওঠার মতো এক আশ্চর্য ধরণের নাচ নাচতে তারা শুরু করে দিলে। ওদের এই নাচ আমি বিয়ার খেতে খেতে আর মাংসে কামড় লাগাতে দেখতে লাগলাম। আমায় ঘিরে কুকুরগুলো শুয়ে রইল। গরুর ডাক কাছেই কোথায় শোনা গেল, আর নৈশ শিকারে বেরিয়ে পড়া অসংখ্য সিংহের—হুঙ্কারও দূর থেকে ভেসে এল! সত্যিকারের এই দেশটাকে আমার আসল দেশ বলে মনে হল, আমার মনের মতো মানুষ হোল এরাই।

তার পরের কতকগুলো দিন অগুনতি মাসাই ঘিরে ধরল আমাকে, তারা অত্যাচারী সিংহ মারার জন্য আমায় নিয়ে যেতে অনেক মাইল —পথ অতিক্রম করে তবে এসেছে। আমার উপর তাদের দাবি সাব্যস্ত

করার জন্য নিজ নিজ জেলার সবটাতে সকলেই যুক্তি দেখাতে লাগল। একজন বললে কোন গাছেও ততো সংখ্যক পাতা নেই যতো আছে তাদের দেশে সিংহের সংখ্যা। অপর একজন বললে, অসংখ্য সিংহের দেখা পাওয়া যাবে প্রতি মুহূর্তেই তাদের উপত্যকায় চলতে গেলে। যেখানেই আমি যাই না কেন, নিশ্চয় আমার সিংহের কোন অভাব যে হবে না একথা ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম।

প্রথমে আমি গেলাম কুকুরদের নিয়ে পাশের গ্রামে। আগের সপ্তাহে বা সাত দিন আগে সিংহের খপ্পরে পড়ে অনেক গরু মারা পড়েছে, আর খুব বেশী রকমের চোট পেয়েছে একটা বুড়ো। বল্লমধারী একদল জোয়ান যোদ্ধা চলল অমার সঙ্গী হয়ে, কারণ তখনও তাদের ধারণা ছিল যে সিংহ-শিকার কেবলমাত্র বন্দুক ছাড়া আর কোন অস্ত্র নিয়ে না গেলে অনর্থক জীবনটাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া দেখায়।

শেষ হত্যাকাণ্ডটা হয়েছিল যেখানে, গ্রামে পৌঁছে সেখানে গেলাম ওরা আমায় ভুক্তাবশিষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো; আর সামান্য কিছু মাংস সিংহ, শকুন হায়েনার হাত থেকে বেঁচে গেছিল। লক্ষ্য করলাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যে, সিংহ গৃহপালিত পশুকে হত্যা করে বন্যপশুকে সেভাবে হত্যা করে ঠিক সেভাবেই। আগে লাফিয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে গিয়ে সামনের তুই থাবা দিয়ে তার মাথাটা এক মোচড়ে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয়। ঘাড় ভেঙ্গে সে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রক্ত সেই ভাঙা জায়গাটায় এসে জমে, আর সিংহ সেইখানে কামড়িয়ে সিংহ জন্তুটার রক্ত চেটে খায়।

আমি বুঝলাম, পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস মৃতদেহের শরীরে না থাকায়, তা সিংহকে আকর্ষণ করে কাছে আসবে না। তাই সঙ্গে করে মোরান আর কুকুরগুলোকে নিয়ে সিংহের ছাপ অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম। চারদিকে সিংহের ছাপ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এগোনো একপ্রকার অসম্ভব কোন নির্দিষ্ট ছাপ ধরে ধরে। এদিকে খালি

গোল হয়ে ঘোরাই মার হবে, যদি না কোন নির্দিষ্ট ছাপ ধরে না এগোই! আমরা এগোতে লাগলাম সবচেয়ে তাজা ছাপ লক্ষ্য করে, যদিও তা কতদিনের বাসি তা বলা অসম্ভব। বাতাস কোন ঝোপের ভেতর না প্রবেশ করার ফলে এমন ঝোপের ভেতর পায়ের দাগও খুব তাজা বলে মনে হয় অনেক সময়। অনেক দিনের ফেলে যাওয়া পায়ের দাগের ওপরে অপেক্ষাকৃত কোন ছোট জানোয়ারের নতুন পায়ের দাগ পড়েছে এমন প্রায়ই ঘটে থাকতে দেখা যায়। এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সিংহের বিষ্ঠা ধরে অনুসরণ করাই হোল একমাত্র উপায়। সহজেই যে নির্ভুলভাবে পথ চিনতে পারে, সে সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ঠা থেকে বলে দিতে পারে, যে সিংহ সে পথ দিয়ে কতকাল আগে চলাফেরা করেছে।

মোরাণরা খুব পটু ছাপ ধরে পথ চলার ব্যাপারে। ঝোপের ছোট ছোট ডাল তুলে তারা প্রায়ই আমার অদেখা চিহ্নগুলি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করাতে লাগল। এক পা এক পা করে ঠিক পায়ের ছাপ ধরে ওরা যে এগোয় তা নয়, ওরা এগোয় দশ-পনেরো ফুট ব্যবধান ধরে পড়ে থাকা ছাপগুলো অনুসরণ করে করে। তারা সিংহের চলাফেরা সম্পর্কে এতোই অভিজ্ঞ যে তারা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারে কোথায় সে গেছে। কোন গন্ধ অনুসরণ করে এগোতে এগোতে কুকুরের দল যেমন হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললে যতক্ষণ না আবার হারাণোর গন্ধ খুঁজে পায় ততক্ষণ নিকটবর্তী স্থানে বালির ওপর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে করতে এগোতে থাকে—এই জোয়ানরাও সিংহের চলাফেরা আন্দাজ করে এগোতে এগোতে কখনো যদি দিকভ্রান্ত হয়, তারা উথলে পড়ে তখনই চারদিকে তাকাতে থাকে।

এভাবে চিহ্ন ধরে ধরে বেশ কয়েক ঘণ্টা অগ্রসর হবার পর আমরা এসে পৌছলাম একটা ছোটখাট ঝোপের পাশে। এই ঝোপের ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী রকমের, শিকারীর পক্ষে বিপজ্জনক। যদিও সিংহগুলোকে

মারা দরকার নয়তো তারা অবশ্যই গরু মোষও মারবে, আবার রাখালদেরও হত্যা করবে হয়তো—তবুও এই ঝোপের ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। কুকুরদের শক্তির পরিচয় দেবার এই হোল সুযোগ। ওদের ঐ ঝোপের ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম।

ঝোপের বাইরে আমরা মাসাইদের নিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। বর্শার ফলা সামনের দিকে মাটিতে গেঁথে মোরানরা দাঁড়িয়ে রইল তাদের ঢালের ওপর ভর করে, আর আক্রমণের প্রতীক্ষায় আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম।

ঝোপ থেকে কুকুরগুলো ভীষণ ঘেউ ঘেউ করতে করতে বেরিয়ে এল। তারা বাইরে বেরিয়ে এসে গোল করে দাঁড়াল, এয়ারডোন আর কলিহুটো ছিল ভীষণ দুঃসাহসী তারা সিংহদের ঝোপের ভেতর থেকে বার করে আনার চেষ্টায় রইল।

আগে থেকে কোন ইঙ্গিতমাত্র না করে হঠাৎ আচম্‌কা ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটা সিংহ কুকুর-গুলোর দিকে ধেয়ে এল। কুকুরগুলোও সিংহের জন্য তাড়াতাড়ি পথ করে দিল, সিংহ তবুও কিন্তু একটা কুকুরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল থাবার প্রচণ্ড আঘাতে। ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, কুকুরটাকে শুধু মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। বাকি কুকুরগুলো সিংহের দিকে সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে গেল, আর পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ শুরু করল, সিংহটা যাতে আহত কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে তাদের দিকে আদৃষ্ট হয়। দক্ষ বক্সিং লড়িয়ের মতো সিংহটা ফিরে বিদ্যুতের বেগে তাদের দিকে চাইলে বাঁয়ে থাবা চালাতে লাগল। আমি তখন গুলি ছুঁড়লাম; আমার গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহটা অনেকটা লাফিয়ে উঠল। এবং সে মুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়ল, কুকুরের পাল ঝাঁপিয়ে তার ওপর এসে পড়ল। আচম্‌কা খানিকটা দূর থেকে আর একটা সিংহকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, যখন কুকুরগুলোকে আমি ডেকে ফিরিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বল্লম উঁচু করে ধরে

মাসাইরা ওদের ভাষায় প্রচণ্ড চীৎকার করতে করতে তাকে আক্রমণ করল। সিংহটা কুড়ি ফুটের মতো এক-একটা লাফে ছুটে চলল প্রস্তরের ওপর দিয়ে, পেছন পেছন ছুটে চলল মাসাই শিকারীরা আর কুকুরগুলো। সিংহটা কিছুদূর এগিয়েছিল মাত্র, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুকুরদের হাতে বন্দী হোল সে। পেছনে পড়ে আমি হাঁপাচ্ছিলাম, যখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম, লক্ষ্য করলাম, বৃত্তাকারে দাঁড়ানো কুকুরগুলোর মাঝে সিংহটা বন্দী। বল্লম বাগিয়ে মাসাইরাও গোল হয়ে ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

চীৎকার করে নির্বোধগুলোকে নিষেধ করলাম, ইতস্ততঃ করতে লাগল তারা তবু, আর কুকুরগুলোর গায়ে যাতে গুলি না লাগে এরকম সতর্ক হয়ে রাইফেলটা তুলে নিলাম। হঠাৎ সিংহটা আমায় দেখেই আক্রমণ করে বসল, সে কুকুরগুলোর ওপর দিয়েই তীরবেগে এগিয়ে এল আমার দিকে। যতক্ষণ না সে কুকুরগুলোর কাছ থেকে সরে আসছে ততক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তারপর গুলি করলাম।

সিংহটার গায়ে প্রথম গুলিটা বিদ্ধ হতে মাটিতে পড়ে ধুলোকাদা মাখতে লাগল আর ছটফট করতে লাগল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—গুলি করার পক্ষে তখন আর কোনই অসুবিধা রইল না। দ্বিতীয় গুলিটা সিংহটার বুকে লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল সেটা।

কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি পঞ্চাশটারও বেশী সিংহ শিকার করলাম কুকুরগুলোর সাহায্য নিয়ে। ইদানীং কুকুরগুলো কয়েকটা সঙ্গীকে মারা পড়তে দেখে অনেকটা সাবধান হয়ে পড়েছিল, খুব সতর্ক হয়ে এড়িয়ে যেত সিংহের সামনে। সিংহকে কখনো কোন কুকুরকে কামড়াতে দেখিনি। বিরক্ত হয়ে কুকুরগুলোকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত দ্রুত ভাবে থাবা চালনা করে সে, কামড়াবার পক্ষে উপযুক্ত বলে কুকুরগুলোকে সে যেন ভাবতেই পারে না। যখন কোন কুকুর সঙ্গীকে সিংহের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্য সচেষ্ট হয় তখন সে সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

তার চামড়া না ধরে আঁকড়ে ধরে তার কেশর, কারণ কেশর চামড়ার চেয়ে ধরে থাকা সহজ। কিন্তু ঝোপের মধ্যে সিংহেরই অনেক বেশী সুবিধে, ফলে আমাকে সাবধান হতে হোল শেষপর্যন্ত অনেক বেশি কুকুরকে মারা যেতে দেখে। খালি যখন সিংহের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সংবাদ আসবে যখন তখন ওদের ব্যবহার করব বলে মনস্থির করলাম। ওদের অন্যসময় তাঁবুতে রেখে একাই যথাসাধ্য সিংহ শিকার করতাম।

একা শিকার করতে বেরিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা তরাইয়ের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে গেল। আগের পথ ধরে ধরে চেষ্টা করছি তাঁবুর দিকে ফিরে আসতে, কিন্তু রাত্রি নেমে এল তাঁবুতে পৌঁছবার আগেই, পথ চিনে আমার পক্ষে ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ল না। একটা ঝড়ের আশঙ্কা বিকেল থেকেই করা যাচ্ছিল, সেই ঝড় এতক্ষণে দূরের শৈলশিরার ওপর নেমে এল। বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে চলা কিছুক্ষণের জন্য সম্ভব হোল কারণ, পাহাড়গুলো থেকে যেখানে ঝড় বইছে সেখানকার দূরত্ব সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। ঝড়ের প্রচণ্ডতা যখন প্রায় মধ্যরাত্রিতে স্তিমিত হয়ে এল তখন সেই অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ বাদে গোরুর গলার ঘন্টার শব্দ গোয়াল ঘর থেকে আমার কানে এসে বাজল, সে শব্দ বড় মধুর বোধ হল। চলতে চলতে আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে করতে সেই শব্দ অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম। আমার চীৎকারের উত্তর এল একটু পরেই। একটা আলো চোখে পড়তে সেই আলোয় মাসাইদের গোবর-লেপা একটা কুটির চোখে পড়ল, আর যথারীতি কাঁটা ঝোপে ঘেরা একটা গোয়াল তার পাশেই রয়েছে। তাড়াতাড়ি আমায় মাসাই-দম্পতি ঘরে নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালাল। পুরুষটি জোয়ান নয়, কারণ তার বয়স চল্লিশেরও বেশী; সুতরাং মাসাইদের হিসাবে তাদের বৃদ্ধ অবস্থা। শেষপর্যন্ত সিংহের মুখে একদিন তাকে ফেলে দেওয়া হবে।

সে সিংহ-শিকারী হিসাবে আমার নাম শুনেছে, সে ব্যগ্র হয়ে আমার সম্বন্ধে আমার বন্দুক ও সেই বন্দুক দিয়ে আমার হাতে কত জন্তু মারা পড়েছে তা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানতে লাগল। ওই বৃদ্ধ লোকটির নাম কিরাকাঙ্গানো। ওর বাবা অনেক বছর আগে গণ্ডারের হাতে মারা গিয়েছিল, একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক সেই থেকে ওর সমস্ত হিংস্র জন্তুর ওপর, তার জীবনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় তাদের মেরে ফেলা। সে বল্লম দিয়ে সিংহ ও মহিষ শিকারের অবিশ্বাস্য কাহিনী সব শোনালো আমায়। অথচ মাসাইদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে আমি বিশেষরূপে অবগত ছিলাম। বেশির ভাগ মাসাইদের মতো কিরাকাঙ্গানো তাদের গরু বা স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে গর্ব করে না, ওর একমাত্র আনন্দ হোল ঢাল আর বল্লম নিয়ে ঘন ঝোপে-ঝাড়ে হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করা। সেও শিকার করতে আমার মতো ভালোবাসে।

ওদের ভাষা আমি এরই মধ্যে খানিকটা শিখে ফেলেছিলাম, সে আমার সঙ্গী হিসাবে আর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলার জন্য আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক কিনা, সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে একটি কথাও না বলে উঠে পড়ল; তুলে নিয়ে তার ঢাল আর বল্লম কৈ জিজ্ঞাসা করল কখন যাত্রা শুরু হবে।

ভবিষ্যতে কিরাকাঙ্গানো আমার ডানহাত হয়ে পড়েছিল, ঠিক যেন আমার রাইফেলের আর একটা নল। সম্পূর্ণ নির্ভীক অথচ পথপ্রদর্শক হিসাবে অপূর্ব এই লোকটার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, বড় একটা এরকম মানুষ চোখে পড়ে না। এমন কতবার হয়েছে যে, ধেয়ে আসা জন্তুকে দুটো গুলি ছুঁড়েও থামাতে না পেয়ে দ্বিতীয় রাইফেলের জন্য হাত বাড়িয়ে দেখি, কোথায় সঙ্গীটা পালিয়ে গেছে। কিরাকাঙ্গানো কিন্তু আমাকে কখনো এরকম বিপদের মুখে ফেলে পালায় নি। সে যে শুধু বিশ্বাসী তাই নয়, সে ঝোপ ঝাড়ের ব্যাপারেও খুব দক্ষ। ঠিক বুনো জানোয়ারের মতো সে চিন্তাও করতে পারত

তাই অনেক আগে থাকতেই সে প্রস্তুত থাকত জন্তুর আচার আচরণ অনুমান করে। শৈলশিরার মধ্যবর্ত্তী নালা গুলোর ভেতরে যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সুন্দরভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালনা সম্ভব হয় সেজন্য কিরাকাঙ্গানোকে দলপতি করে আরও ছোট ছোট বল্লমধারীর দলে সকলকে ভাগ করে দিলাম। নিবিড় জঙ্গলে এইসব নালাগুলো করা, সিংহেরা দিনের বেলায় এখানে এসে বিশ্রাম করে। আমি এর এক কোনে থাকতাম, আর ঢাল-বল্লম দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আর আস্ফালন করতে করতে, সিংহদের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে তাড়া দিতেই তারা ছুটে যেত আমি যেখানে ছিলাম তার নীচ দিয়ে, আমি এদের দৃষ্টিও ঘ্রাণশক্তির আওতার বাইরে থাকতাম। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এইভাবে একবার আমি সাতটা সিংহকে হত্যা করি। একটার পর একটা সিংহ যেমনি মরে যেতে থাকে, মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাবার কথা ওরা ভাবেও না, খালি কোথায় থেকে যে গুলি আসছে তা দেখবার জন্য বাকিগুলো গর্জন করে পাক খেতে খেতে তেড়ে আসে।

যতোই কিরাকাঙ্গানো কাজের লোক হোক না কেন আমার আসায় একবার কিন্তু একটা খুব ভালো সিংহকে হারাতে হয়েছিল ওরই জন্য। এরকম হোল ঘটনা।

কোন গ্রামবাসীগন কর্তৃক সিংহের আক্রমণ থেকে তাদের গৃহপালিত পশুদের রক্ষাকল্পে আমার সাহায্য চাওয়া হলে আমি সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে থাকল কিরাকাঙ্গানো।

গ্রামে যখন উপস্থিত হলাম আমরা, তার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। আমি রখালদের মুখে সব কথা শুনে মনকে স্থির করলাম একটা জেব্রাকে মেরে টোপ হিসেবে সেটাকে কাজে লাগাব। জেব্রার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে অবশ্য কিরাকাঙ্গানো। একটা পুরুষ জেব্রাকে আমি গুলি করলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কিন্তু তার শরীরের একেবারে পেছনদিকে গুলিটা গিয়ে

বিদ্ধ হোল। তার পেছন পেছন অগ্রসর হওয়া, অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, কারণ আলো তখন আবছা হয়ে এসেছে। তার চিহ্ন অনুসরণ করে পরদিন সকালে অগ্রসর হতে লাগলাম, আমার দৃঢ় ধারণা হোল যে শকুনের পালের চক্রকারে ওড়া দেখেই অনুমান করতে পারব যে মরা জেব্রটা কোথায় আছে।

যখন আমরা যাচ্ছিলাম একটা ঝোপের পাশ দিয়ে; আচম্কা দাঁড়িয়ে পড়ে কিরাকাঙ্গানো ইঙ্গিত করল তার হাতের বল্লমটা দিয়ে। তার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, একটা সিংহ জেব্রাটাকে আরাম করে খাবার জন্য একটা আকাশিয়া গাছের ছায়ায় তাকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সিংহটার কেশর ছিল অপূর্ব সুন্দর। সিংহটা তার পিঠে করে জেব্রাটাকে নিয়ে যেতে এক একবার দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে আর বিশ্রাম নিচ্ছে, তারপর তেমনি চলেছে আবার। আমি অবাক হয়ে গেলাম সিংহটার শক্তির পরিমান অনুমান করে, কারণ জেব্রাটারও ওজন প্রায় নয় থেকে দশমনের মতো ছিল।

আকাসিয়া গাছ লক্ষ্য করে ঝোপ কেটে এগোচ্ছি, আর এগিয়ে গিয়ে কিরাকাঙ্গানো সবচেয়ে সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। সিংহটার কাছে এগিয়ে আমরা অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সিংহটা ছিল ভারী সুন্দর, শরীরের সামনের দিকটা ঘন কেশরের আড়ালে দেখাই যাচ্ছে না। যে সমস্ত সিংহ ঘন জঙ্গলে থাকে তাদের ঘাড়ে এমন কেশর প্রায় দেখাই যায় না, কারণ ঝোপে ঝাড়ের গায়ে তাদের কেশর আটকে গিয়ে প্রায়ই কেশর ছিড়ে যায়। আর একটু, সিংহটা এগিয়ে আসতেই লক্ষ্য করলাম, আমার পাশে দাঁড়িয়ে কিরাকাঙ্গানো অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

আচমকা চিৎকার করে উঠে বল্লম বাগিয়ে সে সিংহটাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করল। অবাক চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিরাট সিংহটা জেব্রাটাকে ফেলে পালিয়ে গেল। তার সঙ্গে

সমানে সমানে ছুটল কিরাকাঙ্গানোও—আর প্রতি মুহূর্তেই বল্লমটা যেন ছুঁড়বে এইরকম একটা ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু সিংহের গতি তার গতিবেগের চেয়েও অনেকগুন বেশি, সে কিরাকাঙ্গানো থেকে অনেক গুন এগিয়ে গিয়ে ঝোপের আড়ালে নিজের শরীরটাকে লুকিয়ে ফেলল। তাকে হঠাৎ অমন করে সিংহটার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য চিৎকার করতে সে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, 'সিংহটা কি বড়! ওঃ।

কুকুরগুলোর সাহায্যও এই সিংহ শিকারের সময় নিয়েছিল। যখন আহত হয়ে কোন সিংহ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে তখন তাদের খুঁজে বের করার জন্য কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতাম। তা না হলে হায়নাদের মুখে পড়ার মত সে এক অতি বীভৎস ব্যাপারে পর্যবসিত হবে। সিংহগুলো এই মুর্দাফরাসদের অতি ঘৃণার চোখে দেখে, যদিও হায়না তার কাছে অপ্রিয় নয়, তবুও খাওয়ার সময় সিংহগুলো হায়নাগুলোকে সেখানে আসতে দেয় না। মানুষ যেমন খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে তার পোষা কুকুরকে খাওয়ায় সিংহটাও তেমনি করে হায়নাকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেতে দেয়। হায়না কিন্তু সিংহের এই গর্বিত আচরণকে মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। এবং বুড়ো হয়ে গিয়ে কিংবা আহত হয়ে যখন কোন সিংহ অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন সেই সময়কে তারা তাদের প্রতিশোধের সুযোগ বলে মনে করে। শেষ পর্যন্ত কোন সিংহেরই স্বাভাবিক মৃত্যু আসে না, হায়নারাই তাদের মৃত্যুদূত হয়ে আসে। আমার মনে হয়, অন্যকোন জন্তুর মাংস অপেক্ষা হায়নাদের মাংসই সিংহের বেশী প্রিয়।

কয়েকটা সিংহ একটা হস্রবেশ্য জঙ্গলার মধ্যে বাস করত, আমাকে বিশেষ ভাবে তাদের অত্যাচারের কথা মাসাইরাই জানাল। তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে একটা সিংহী এর মধ্যে বাস করত; এই সিংহীর হাত থেকে তার গরু মোষকে রক্ষাকরার জন্য এক রাখাল তার হাতে ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। এই সিংহের দল অনেক গরু মোষকে

হত্যা করেছিল। শোনার পর একে মারার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম—বিশেষকরে ঐ সিংহীটাকেই, কারণশুনতে পাচ্ছিলাম সেটা ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ঠিক করলাম তাকে টোপ ফেলে প্রলুব্ধ করে হত্যা করতে হবে কারণ ঐ জায়গায় যাওয়া অসম্ভব।

টোপ ফেলে এই রিজার্ভে সিংহ মারার পরে বিপদও অনেক। মাসাই বৃদ্ধরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাদের ফেলে দিয়ে আসা হয়, আর সেখানে তারা হায়নার হাতে মারা পড়ে—এটাই হোল মাসাই সমাজের নিয়ম।

সিংহটাকে বার করে আনার জন্য এবার আমি একটা জন্তুকে মারলাম টোপ হিসাবে,—সেখান থেকে খানিকটা তফাতে,—যাতে সিংহেরা বন্দুকের শব্দ না পায়। মৃত জন্তুর শরীরটাকে গরুর গাড়ীতে করে সমস্ত জলাটার ওপর দিয়ে নিয়ে আসা হোল। অর্থাৎ যেখানেই থাকুক ওরা রক্তের দাগ ধরে ধরে ঠিক এসে হাজির হবে সিংহেরা। মরা জন্তুটাকে আকাশিয়া গাছের নীচে রেখে গাছটার ওপরে লোকজনদের দিয়ে একটা মাচা তৈরী করা হোল। মাচানের বহুল ব্যাবহার হয় সিংহ শিকার কালে, এটা যদিও আমার বিশেষ পছন্দ নয়, মাটির ওপর একটা বোমা তৈরী করে সেখান থেকে গুলি ছোঁড়া আমার এর থেকে বেশী প্রিয় পদ্ধতি কারণ, উচু মাচানের উপর থেকে গুলি ছুঁড়লে সাধারনতঃ তা শিকারের জন্তুর উপর না লেগে তার উপর দিয়েই চলে যাবার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বোমার উপর নির্ভর করতে হল না সকারণ এখানে হাতির চলাফেরা অত্যন্ত বেশী রকমের ভুল করে কখন হয়ত তারা মাড়িয়েই চলে যাবে। অগত্যা তৈরী করতে হোল মাচান। এখানে নিজেকে সম্পুর্ণ নিরাপদ বলে মনে হোল—কিন্তু মাত্র দু'ঘণ্টা অতিক্রম হওয়ার আগেই যে আমার এতো চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে তা কে আর ভাবতে পেরেছিল!

ব্যর্থ হোল আমার প্রথম রাতের প্রতীক্ষা। সিংহেরা আসেনি যে তা নয়, কিন্তু যেখানে বসেছিলাম তার ওপরের ডালে একটা পাখি

চেঁচিয়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটাল যে ভয় পেয়ে সিংহেরা পালিয়ে গেল। পরদিন বাধ্য হয়ে তাদের মাচানে গিয়ে উঠলাম।

যখন চারদিক অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করল তখন অঝোরধারায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জলে ভিজে গেল গোটা শরীরটা, তখন জঙ্গল থেকে আগত মশার দল আমায় ঘিরে ভন ভন করতে লাগল। মশাও মারতে পারলাম না কারণ সেই সঙ্গে সিংহেরা পাছে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য বৃষ্টি পড়ার জন্য একটা সুবিধাও হোল, বৃষ্টির গন্ধ সিংহেরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হবার ভরসা পেল। তাদের শিকার করার শব্দ চারিদিকের আগাছায় প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার কানে এসে প্রবেশ করল এবং রাত প্রায় তিনটের সময় তাদের খুবই কাছে এসে পড়ার লক্ষন টের পেলাম। আমার কানে তাদের শব্দটা লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ প্রবেশ করল যেটা আফ্রিকার অন্যান্য যে কোন শব্দের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য সূচিত করে।

সমস্তক্ষন অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে শুয়ে থাকার জন্য শরীরটা অবশ হয়ে আসছিল, ঠিকভাবে রাইফেলটাকে তুলে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে যেই একটু নড়াচড়ার শব্দ হোল অমনিই সিংহেরা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল। যে সিংহের পালাবার সময় পায়ে থপ্ থপ্ করে প্রচুর আওয়াজ হয়, সে কোন শব্দ না করে নিঃশব্দে শত্রুকে আক্রমণ করে। কাজেই কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে হয়তো কান পেতে লক্ষ্য করছে বুঝলাম যে তারা বেশিদূর যায় নি। কোনও শব্দ না করে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

ভাগ্যের হাতে শিকারের নৈপুণ্য নির্ভর করে। একটা পাখির চেঁচামেচিতে আগের রাত্রিতে একটা সুযোগ আমার নষ্ট হয়ে গেছিল, আজ আমার মাচানের কাছেই আর একটা হাইয়্যাকম ডাকতে শুরু করে দিল! কোনরকম ভয়ের কারণ থাকলে যে হাইয়্যাকম ডাকে না এটা সিংহেরা জানত তাই সে ডাকে তারা নিশ্চিন্ত হোল। তারা আস্তে আস্তে টোপের কাছে এগিয়ে এলে, বার বার পেছন ফিরে

তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত সাবধানে এগোতে শুরুকরায় আমি কিন্তু রাইফেলটাকে কাঁধে লাগিয়ে তেমনি নিঃসাড়ে ওপুড় হয়ে শুয়ে আছি, যাতে আমি একটুও নড়াচড়া না করে গুলি করতে পারি।

তুটোই ছিল পুরুষ সিংহ। বন্দুকের নলের সঙ্গে টর্চটাকে লাগিয়ে গুলি ছুঁড়লাম যে সিংহটা ডান দিকে আছে তার দিকে লক্ষ্য করে, কারণ রাইফেলটাকে বাঁকিয়ে নিয়ে কোন জায়গা বদল না করেই যে সম্ভবপর হবে অপর সিংহটাকে গুলিবিদ্ধ করার তা আমি জানি। গুলি খেয়ে সিংহটা পড়ে গেল ; তার সঙ্গী তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। সঙ্গের সিংহটাকেও গুলি করতেই সেও পড়ে গেল মাটিতে ; আশ্বস্ত হবার জন্য তার দিকে আর একটা গুলি ছুঁড়লাম। এতক্ষণেও কিন্তু সিংহীটার কোনও সন্ধান মেলেনি।

হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে মাচান থেকে মাটিতে নেমে গাছের-নীচের একটা জায়গায় সিংহতুটোকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম তাদের চামড়া যাতে হায়নারা এসে নষ্ট করে না দিতে পারে সেজন্য-বর্ষাতি ঢাকা দিয়ে দিলাম। শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা অপেক্ষা যাতে পড়ে না যাই তার জন্য কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙ্গে বিশেষ ওজনের জন্য ঢেকে দিলাম। আমার সারা দেহটা। এই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। টোপটা খাওয়ার শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। সিংহীটা তার তিনটে বাচ্চাকে সঙ্গে করে এসেছে। যতটুকু সম্ভব ততোটুকুই কম শব্দ করে খুব সাবধানে রাইফেলটা তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়লাম—তার মাথা ফুঁড়ে গুলিটা ভেতরে ঢুকে গেল। টোপটার ওপর সঙ্গে সঙ্গেই সিংহীটা পড়ে গেল আর তার তিনটে বাচ্চা পালিয়ে গিয়ে কোথায় অন্ধকারে মিশে গেল। শেষ হোল আমার কাজ। মাচান থেকে নেমে অন্যান্য মৃত সিংহগুলো যেখানে পড়েছিল সেখানে সিংহীটাকে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম।

যাতে সিংহটাকে তুটো হাতেই নিয়ে যেতে পারি সেজন্য নামিয়ে রাখলাম টর্চটা মাটিতে। হঠাৎ অন্ধকারে একটা আকৃতি আমার

চোখে পড়ল। একমুহূর্তের জন্য মনে হোল হয়তো সেটা একটা সিংহীর বাচ্চা, কিন্তু পরক্ষণেই তার আকৃতি দেখে বুঝলাম যে বাচ্চার আকৃতি এতো বড়ো নয়। তার দিকে থেমে গিয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার সামনে একটা মস্তবড়ো সিংহ দাঁড়িয়ে—সেটা হয়তো একটু আগে মেরে ফেলা সিংহীটার সঙ্গী।

মাচানে আমার রাইফেলটা ফেলে এসেছি। কিছুটা সময় দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ষাঁড়ের মতো প্রকাণ্ড ছিল সিংহটা। নিস্পন্দ হয়ে রইল।

সিংহটা মাত্র ১৫ফুটের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে তার কালো মুখ আর লম্বা লম্বা কেশর নিয়ে। মনে হয়, যদি দৌড়োই তাহলেও সেও পিছন পিছন তাড়া করবে, রক্তমাংসের মানুষ হয়ে এ উত্তেজনা আর সহ্য করতে না পেরে গাছটার দিকে দ্রুত ছুটে গেলাম। হাতের কাছে কোন ডালপালা না থাকায় কাঠবেড়ালির মতো তুড়ি মেরে তরতর করে গাছে উঠে পড়লাম। যখন মাচানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সারা শরীর আমার ঘামে ভিজে গেছে। আর একটু হলে ভয়ে, উত্তেজনায় রাইফেলটা ফেলেই দিচ্ছিলাম। নিচে টর্চটা ফেলে রেখে আসার জন্য কিছু চোখেই পড়ল না আমার।

কিছুক্ষণ বাদে টোপের কাছে গিয়ে সিংহটার মাংস খাওয়ার আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ শব্দটার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে আন্দাজ করে নিলাম সেটা কোথায় আছে। যথাসাধ্য লক্ষ্যস্থির করে এ অবস্থায়েই আমি গুলি ছুঁড়লাম। গুলির শব্দ কমে যাবার পরও কোন শব্দই শুনতে পাওয়া গেল না। খুব আবছা ভাবে সিংহটাকে টোপের কাছে পড়ে থাকতে দেখলাম বলে মনে হোল।

ভোর হতে যেটুকু বাকি ছিল সেই বাকি সময়টা মাচানের ওপরেই আমি কাটালাম,—আফ্রিকার সমস্ত কালো-কেশর সিংহ-শিকারের—লোকও আমাকে সে রাত্রে মাচান থেকে নামাতে পারত না।

সে রাত্রে ভয়ঙ্কর রকমের সব স্বপ্ন বার বার আমার ঘুমটাকে ভাঙিয়ে দিল। স্বপ্ন দেখলাম, আমার শিকার করা যে সমস্ত পশু গাছের নীচে পড়ে আছে, তারা টুকরো টুকরো করে আমায় খাচ্ছে। সকালের আলোয় আমি মাচান থেকে নেমে পড়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম সিংহগুলোকে। যে সিংহটাকে সকলের শেষে গুলি করে হত্যা করেছি, সেটাই হোল এ অঞ্চলের সব সিংহগুলোর মধ্যের একটা সেরা সিংহ কারণ, এর কেশরটার রঙ হোল অনেকটা বাদামী রঙের খুব সকালবেলা উঠে সিংহীর বাচ্চাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমি আর কিরাকাঙ্গনো। একগোছা শুকনো ঘাসের আড়ালে তাদের লুকিয়ে থাকতে দেখা গেল। সেগুলোকে দেখতে লোমওয়ালা টেডি ভাল্লুকের মতো। আমাদের দেখতে পেয়ে অত্যন্ত রেগে গিয়ে সে প্রতিতশোধ মানসে মুখে অদ্ভুত রকমের শব্দ করতে লাগল। তাদের সঙ্গে করে তাঁবুতে ফিরলাম। বাটীতে মুখ ডুবিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা স্তন্যপানেই অভ্যস্ত, তাই ওভাবে মুখ ডুবিয়ে বাটি থেকে দুধ খেতে তারা জানে না। তবে মুখ ডোবানোর সময় বাটির যে দুধটুকু তাদের নাকে লেগেগিয়েছিল, জিভ দিয়ে চেটে চেটে তারা সেই দুধই খেতে লাগল; মনে হোল, গরম গরম খেতে তাদের ভালোই লাগছে। কয়েকদিন ধরে এরকম করেই তারা খেতে লাগল। অবশেষে তারা মুখ ডুবিয়ে খেতে শিখল, আর খুব বশ মানল।

তাদের আমাব ক্যাম্পখাটের পায়ায় বেঁধে রাখতাম। প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরে বাচ্চাগুলো পরস্পরের মধ্যে মারামারি, ঝগড়াঝাটি আর চীৎকার চেঁচামেচি করে আমায় জ্বালাতন করত। তাহলেও তারা কিন্তু নিস্পৃহ বা জড় নয়। তারা সব সময়েই যুদ্ধ করতে যেমন তেমনি খেলা করতেও ওস্তাদ। একদিন দিনের বেলায় তারা ছাড়া পেয়ে আমার একমাত্র বালিশটার সঙ্গেই খুব যুদ্ধ করল। ফিবে এসে দেখি, সারা তাঁবুতে সাদা পালকের তুফান বয়ে গেছে। আমার বন্ধুকে

অনেকদিন পরে আমি বাচ্চাগুলোকে দিয়ে দিই, তিনি স্থানীয় গরুমোষকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করেও যাতে আরামে তাদের দিন চলে যায়, এরকম একটা জায়গায় তাদের ছেড়ে দেন।

হামেশাই শুনতে পাই যে, আগুন দেখলে নাকি বুনো জানোয়ারেরা ভীত হয়ে পড়ে—এবং এটাই তাদের স্বভাব। এই প্রচলিত মতবাদটা অনেক দিন ধরেই অব্যাহত গতিতে চলে আসছে ; যার জন্য অনেকেই একে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে বিশ্বাস করেন। আমি নিজেও সেই বিশ্বাসই মনে মনে পোষণ করতাম, সেইজন্য সিংহ নিশ্চয়ই তাঁবুর আগুনের কাছে আসতে সাহস করবে না, এই ভেবে আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু মাসাই রিজার্ভের এক রাত্রের অভিজ্ঞতা আমার সে ধারণাকে পাল্টে দিল।

সেদিন বিকালবেলা একটা জেব্রাকে টোপ হিসেবে মেরে বলদদের দিয়ে সেটাকে তাঁবুতে টেনে নিয়ে এলাম। ২৪ ঘণ্টা ধরে পচিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তবেই তাদের আমি টোপ হিসাবে ব্যবহার করি, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে আগুনের এত কাছে আসতে কোন জন্তুই সাহস করবে না তাই সেই মরা জেব্রাটাকে তাঁবুর আগুণের কাছে ফেলে রাখবার জন্য লোকজনদের আদেশ দিলাম।

কুকুর আর বলদ গুলোকে নিয়ে কিরাকাঙ্গানো রাত কাটাতে পাশের একটা গ্রামে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ, এই সব জন্তুদের আমি কখনো তাঁবুতে রাখতাম না, কারণ, তাঁবুর আশেপাশে অপেক্ষমান সিংহ বা চিতাবাঘ গন্ধ পেয়ে ভীত হয়ে এসব জন্তু ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা গ্রামে থাকলে সে আশঙ্কা থাকে না। আমাদের দুটো কুকুর ঐ ভাবেই চিতার কবলে পড়েছিল। কুকুর হোল চিতার প্রিয় খাদ্য, তাই সে সর্বদাই প্রস্তুত, কুকুরের পেছন পেছন অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করতো।

কিরাকাঙ্গানো চলে যাবার পর আগুনের কাছে কম্বলমুড়ি দিয়ে

কুলিরা শুয়ে পড়ল, আর পাইপ টানতে টানতে ভেতরে বসে আমি আগুনের দিকে দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করলাম।

বহুদূরে আমার কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র লাগয়ের উত্তর অঞ্চলে আমার কল্পনা তখন যেখানে বিচরণ করছে।

যখন সচেতন হলাম, তখন আমার সামনে নটা সিংহের মুখ দেখতে পেলাম। ছায়াচ্ছন্ন স্থান পরিত্যাগ করে তারা আমার মুখোমুখি হয়েছে। সাহস হোলনা নড়াচড়া করতে। আমার ঘরে বন্দুকটা ফেলে এসেছি, সেখানে একটা ডিজ লণ্ঠনও জ্বলছে। অত্যন্ত সাবধান হয়ে সিংহেরাও আমাকে লক্ষ্য করছে। খানিকক্ষণ বাদে তারা ঘুমন্ত কুলিদের স্থান পরিত্যাগ করে তারা মৃত জেব্রাটার কাছে চলে গেল, যেটাকে তাঁবুর আগুনের পাশে রাখা হয়েছিল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবেগে মরা জেব্রাটার ওপর। যেন সামান্য কাগজের মতো শক্ত সেই জেব্রাটার চামড়া ছিঁড়ে তারা অতি সহজেই তার শরীর থেকে বড় বড় মাংসের টুকরো খুবলে নিতে লাগল।

চেয়ার ছেড়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম আমার ঘরের দিকে,—প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি জাগছে। সিংহগুলো খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো। বড় বড় সিংহগুলোর কাছে নিজেই নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হোল। ইচ্ছে করলেই দুটো লাফ দিয়ে ওরা আমায় ধরে ফেলতে পারে। কুলিরা ওদের থেকে কয়েক ফুট মাত্র ব্যবধানে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। এক ছুটে তাঁবুতে চলে যাবার ইচ্ছে হোল, কিন্তু পাছে নড়া চড়ার শব্দ পেয়ে সিংহেরা আক্রমণ করে তাই সাহস হোল না। তাই সিংহরা যতক্ষণ না আবার খাওয়া শুরু করে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে আমার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরে ঢুকেই রাইফেলটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম হাতে—ঠাণ্ডা রাইফেলটাকে তারা কখনও আমার কাছে এতো আকাঙ্খিত বলে মনে হয় নি।

এরপর আবার একটা নতুন বিপদ। আমার গুলিরশব্দে চমকে লাফিয়ে উঠে কুলির দল আমার আর সিংহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়বে যে। সিংহেরা তাতে খেতে গিয়ে তার গায়ে বাঁধা শেকলটায় খুব জোর শব্দ হোল, কারণ ঐ শেকলটা দিয়ে বেঁধে জেব্রাটাকে তাঁবুতে আনা হয়েছিল, তারপর আর সেটাকে কেউ খোলেই নি। ভাবনা হোল, পাছে এই শব্দে কুলিদের ঘুম ভেঙ্গে যায়,—কারণ, হঠাৎ জেগে উঠে সামনে সিংহদের দেখে কুলির দল ভীষণভাবে ভীত হয়ে কি যে করবে তা বলাই যায় না। একদল সিংহের সামনে একদল ভীত কুলির দৃশ্য এই ধরণের কল্পনা মোটেই প্রীতিকর নয়।

শেষপর্য্যন্ত ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে গুলি করব—এরকমই সিদ্ধান্ত করলাম। যে সিংহটা সবথেকে বড় তাকে লক্ষ্য করে সঠিক গুলি করলাম,—গুলিবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহটা মাটিতে পড়ে গেল। অন্য সিংহগুলো গুলির আওয়াজে একটু পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু তারপর জেব্রাটার ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে কুলিরা যেভাবে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে—তাতে মুহূর্তের জন্য ওরা মরেই গেছে বলে মনে হোল।

সিংহের দলে নির্ভুল ভাবে গুলি করা শুরু করলাম, রাইফেল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকের হাওয়া ছিটকে এসে ডিজ লণ্ঠনটাকে নিভিয়ে দিল। মারা গেল চারটে সিংহ,—গুলিটা শেষ সিংহটার বুকের একটু নীচে বিদ্ধ হয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল; তারপর থপ থপ করে স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো লাফাতে শুরু করে দিল। তাকে আর একটা গুলি খরচা করে নিষ্কৃতি দিলাম বাকি সিংহগুলো সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে গিয়ে নিশানা ঠিক রেখে একটা বড় সিংহীকে গুলি করলাম। গুলি লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে সিংহীটা মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল আর তাব পিছু নিল বাকি সিংহেরা।

কিন্তু কুলিদের ঘুম এত কাণ্ডতেও ভাঙল না, আশ্চর্য, সিংহের

হুঙ্কার কিংবা রাইফেলের শব্দ কিছুতেই তাদের নিদ্রার পক্ষে বাধা হয়ে উঠল না। এমন আশ্চর্য ব্যাপার আমি কখনো দেখি না যদিও আগে ওদের এই অদ্ভুত ঘুমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

আগুনটাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়ে ওদের একজনের পায়ে ধাক্কা দিতে একজনের নিদ্রাভঙ্গ ঘটল। হাত-পা ছড়িয়ে প্রথমে সে উঠে বসেই কয়েক ফুট মাত্র তফাতে পড়ে থাকা সিংহগুলোকে দেখেই প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল, তারপরই এক লাফ দিল, আর চীৎকার করতে করতে উন্মত্তের মতো ছুটে চলল আমার ঘরের দিকে আর কিছু না জেনেই বাকি সকলে ঘুম ভেঙে তাকে অনুসরণ করল। তারা তাঁবুতে পৌঁছে প্রচণ্ড রকমের কাঁপতে লাগল। তারপর আমার মুখে সব ঘটনা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম একথা ভেবে যে, অনিদ্রা রোগে কখনো তারা আক্রান্ত হবে না।

কিরাকাঙ্গানো পরদিন সকালে কুকুরগুলোকে নিয়ে ফিরে এলে তাদের নিয়ে তখুনি আহত সিংহীটার চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম আমি। তাঁবুতে কুলিগুলো অশ্লীল ভাষায় গান গাইতে গাইতে সিংহদের চামড়া ছাড়িয়ে পেট থেকে, হৃতপিণ্ড থেকে আর মূত্রাশয় থেকে চর্বি বের করার কাজে ব্যস্ত হোল। এই সামান্য সময়ের ব্যবধানেই তাদের চর্বিটা পচতে শুরু করেছিল। সন্তান পুত্র হবে না কন্যা হবে অর্থাৎ ছেলে না মেয়ে হবে তা ওই সিংহের চর্বির পরিমান দেখেই বোঝা যায় বলেই ওদের হয় ধারণা। যদি ছেলে হয় তাহলে একচামচ চর্বি খেতে হবে আর যদি মেয়ে হয় তাহলে খাবে আধ চামচ। ওদের সিংহের চামড়ার ওপর কোন আকর্ষণ নেই, যত আকর্ষণ হোল ওদের চর্বির।

আমরা তাঁবু থেকে যখন একশত গজ দূরে তখন দেখতে পেলাম মাটিতে রক্তের দাগ। সিংহীটা মারাত্মক রকমের আহত হয়েছিল; বহুবার তাকে চলতে চলতে বিশ্রাম নিতে হয়েছে, তার জন্য তার

সঙ্গীরাও অপেক্ষা করেছে। পাতলা ঝোপের মধ্য দিয়ে সেই ছাপ ধরে ধরে এগোতে লাগলাম। এখানে প্রায় কুড়ি গজ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, তাই শিকারের পক্ষে এ জায়গা হোল উপযুক্ত। অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে এগোতে লাগলাম, এবার আহত সিংহীটার দেখা পাব বলে মনে হোল। এগোতে এগোতে শেষপর্যন্ত খুব ঘন একটা ঝোপের কাছে এসে পড়লাম। জায়গাটা মোটেই ভালো নয়।

ঝোপটার মধ্যে মৃত্যুর নিস্তব্দতা বিরাজমান। একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আহত সিংহীটা আমাদের খুব কাছেই রয়েছে,—ওপর দিক থেকে যে কোন সময়েই সে আক্রমন করতে পারে আমাদের। কুকুরগুলো এদিকে রীতিমত চঞ্চল হয়ে পড়েছে, এয়ারডোন গুলো উত্তেজনায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত পারছে না। অবশেষে তাদের এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলাম। তারা সামনের ঝোপের মধ্যে লাফাতে লাফাতে ঢোকবার মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন সামনের ঝোপ থেকে ভেসে এল। আমার পাশ কাটিয়ে অবশিষ্ট কুকুরগুলোও সেই ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকল। সিংহের গভীর গর্জনও বিকৃত আওয়াজের সঙ্গে কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার মিশ্রিত লড়াইয়ের সেই পরিচিত শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি।

ঘন ঝোপ ঠেলে আমি আর কিরাকাঙ্গানো সেদিকে অগ্রসর হলাম। বার পা দূরত্বের পথ অতিক্রম করার আগেই আচম্‌কা একটা গোল গর্তের ভিতর লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে রক্তের দাগ, অবশ্য দাগগুলো শুকিয়ে গেছিল। সিংহীটা যে তাহলে এখনে এসে বিশ্রাম করেছিল তা বুঝতে পারলাম। আমার সেই দুঃসাহসী এয়ারডোন কুকুরদুটো তখনো চোখ মুখ ঘোলা অবস্থায় গর্তের ধারে পড়েআছে। সিংহীটাকে আক্রমনের মাধ্যমে তার সমস্ত আক্রোশটাকে নিজের ওপর টেনে নিয়েছে তারা। সেযাত্রা আমাকে আর কিরাকাঙ্গানোকে ওরাই

প্রাণে বাঁচিয়ে দিল, কারণ, সিংহীটা এমন নিপুনতার সঙ্গে আত্মগোপন করেছিল যে ঠিক সময়মতো সে আমাদের দৃষ্টিগোচর হোত না।

ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত বাকি গুলোর ছোটার শব্দও আমরা শুনতে পেলাম।—থেমে পড়ে যখনই তারা প্রচণ্ড বেগে ঘেউ ঘেউ করছে তখনই রুখে দাঁড়ালেও সিংহীটা কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। আমরা সেই শব্দ শুনে শুনে এগোতে লাগলাম। দেখলাম, ঝোপ থেকে ফাঁকা জায়গায় সিংহীটাকে কুকুরগুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসছে; আমরা তার পশ্চাদানুসরণ করলাম।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেহের প্রত্যেকটি মাংসপেশীকে কাঁপিয়ে অথচ শক্ত করে কেবলমাত্র দুটো আঙ্গুলের সাহায্যে ঐ লম্বা বল্লমটাকে উঁচিয়ে তুলে ধরে মাসাইটা চলেছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা কচি কুকুর আমার কাছে এল,—তার সমস্ত দেহটা ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। যখন দেখলাম তাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না, তখন এই অসহায় যন্ত্রণা থেকে একগুলিতে তাকে মুক্ত করলাম। একগোছা শুকনো ঘাসের মধ্য থেকে গুলির শব্দ শুনেই একলাফে সিংহীটা আমাদের মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানের মধ্যে এসে পড়ল, আর তার ডানদিকের ঝোপ থেকে ঠিক সেই সময়েই আর একটা সিংহী বেরিয়ে এসে আমাদের ধাওয়া করল।

দুদিক থেকে দুটো সিংহীই তখন প্রায় আমাদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে—ভাববারও অবকাশ পেলাম না। মনে হোল, দ্বিতীয়টার বেলাই বেশী, তাই তাকেই লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুড়লাম। তার বাঁ দিকে চোখের আধ-ইঞ্চি ওপরে গিয়ে গুলিটা বিদ্ধ হোল। প্রথম সিংহীটার শরীরে ঠিক সেই মুহুর্তেই কিরাকাঙ্গানোর বল্লম এসে বিদ্ধ হোল। সিংহীটা ভীষণভাবে ফিরে দাঁড়ালো, চেষ্টা করল দাঁতে চেপে ধরে বল্লমের লাঠিটা বের করে নিতে। তার বেল্টের মধ্য থেকে দুমুখো ছুরিটা বের করায় ব্যস্ত হোল কিরাকাঙ্গানো, কিন্তু আমার দ্বিতীয় গুলিটা বিদ্ধ হোল তার কাঁধে।

কোন কথা না বলে আমি আর কিরাকাঙ্গানো হাতে হাত রাখলাম। কোন না কোন সিংহের হাতে পড়ে আজ যে আমার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়তে হোত এবং তা যে সম্ভব হয় নি কেবল ওর জন্য, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমি স্থানীয় যতগুলো শিকার দেখেছি নিঃসন্দেহে, তাদের মধ্যে বিপদে স্থিরমস্তিষ্ক অথচ সবচেয়ে সাহসী হোল কিরাকাঙ্গানো।

মাসাই রিজার্ভে আমার সময়ের সীমা শেষ রেখায় উপনীত হতে চলেছে। সতরটা সিংহকে ইতিমধ্যেই আমি বধ করেছি, গ্রামবাসীদের তবুও দুর্দশার শেষ নেই। সিংহগুলোকে একেবারে শেষ করে ফেলার নির্দেশই ক্যাপ্টেন রিচি আমাকে দিয়েছিলেন, তাই রাত্রে একটা বোমার আড়ালে থেকে ওদের গুলি করে মারব বলে ঠিক করলাম। ব্যাপারটা বিশেষ বিপজ্জনক বটে, কিন্তু বিশেষ কাজের জন্যই আসা এই মাসাই রিজার্ভে, ঘোরার জন্য নয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্রে সিংহ শিকারে প্রবৃত্ত হলাম। যেখানে সিংহ থাকা সম্ভব সেরকম একটা ঝোপের পাশে একটা জেব্রা'কে মেরে ফেলে সমস্ত ভূমির উপর দিয়ে তাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত টেনে এনে রাখা হোল, উদ্দেশ্য হোল অবশ্য ওই মৃতদেহটার গন্ধ ওই ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করানো। তাছাড়া এ জায়গায় রাত্রে চলাফেরা করার সময় পথ-চলতে অন্য সিংহেরাও এই জেব্রার চিহ্ন ধরে ধরে কুকুরের মতো অনুসরণ করে টোপটার কাছে উপস্থিত হতে পারে। এভাবেও কিছু সিংহ পাওয়া অসম্ভব নয়।

টোপের কাছে ঝোপঝাড় থেকে ডালপালা এনে কুলিরা ঘোড়ার খুড়ের আকৃতি একটা বোমা বানাল। আমি আর কিরাকাঙ্গানো সেখানে রাত্রিযাপন করব এরকম ঠিক হোল। সিংহের পথে যাতে জেব্রাটাকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে সেরকম ভাবে জেব্রাটাকে বেঁধে দেওয়া হোল। অনেকবারই বোমার ভিতর নড়াচড়া করার দরুন সিংহ টোপ থেকে পালিয়ে গেছে। কি করে যে তারা জানতে পারে যে ভিতরে মানুষ আছে তা বুঝতে আমার অনেকদিন

সময় লেগেছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম তারা তারার আলোয় মানুষের ছায়ার নড়াচড়া দেখে মানুষের উপস্থিতিটা টের পেয়ে যায়। তাই যাতে বনের মধ্যে কোন আলোই প্রবেশ করতে না পারে তাই কাঁটাঝোপ দিয়ে বোমার উপরটা ঢেকে দেওয়া হল।

সব কাজ শেষ হবার পর বোমায় আমরা দুজনে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ওকে একটা টর্চ নিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক গুলি ছোড়ার সময় শিকারের ওপর কিভাবে আলো ফেলতে হবে। সে মুগ্ধ হয়ে গেল টর্চটা হাতে পেয়ে। সে সেটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া আর দোলাতে লাগল যে তাকে নিষেধ করতে হোল শেষপর্য্যন্ত আমাকে। যাতে কোন অবস্থাতেই গুলির অভাবে বিপর্যস্ত বোধ না করি সেজন্য কিছু গুলি পকেটে আর কিছু গুলি বেল্টের ভরে গুলির থলেটা রাখলাম আমার সামনে, আর দুটো রাইফেলে গুলি ভরে পাশে রাখলাম।

অন্ধকার নামলে টোপটার কাছে কতকগুলো হায়না চোরের মতো উপস্থিত হোল, দুটো শিয়ালও ওদের পিছু পিছু এলো। শেয়াল দুটো ক্ষুধার্ত চোখে হায়নার দিকে তাকিয়ে রইল আর কোথাও কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা জানার জন্য একবার এগিয়ে আবার পেছিয়ে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগল। অবশেষে দৌড়ে এসে একটা হায়না বের হয়ে পড়া জেব্রাটার নাড়িভুঁড়িতে একটা কামড় বসিয়েই চেঁচাতে চেঁচাতে কিছুটা দূরে ছুটে পালাল। এবার বাকি সবাইকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেল। টোপটা ধরে তারা টানাটানি আরম্ভ করে দিল। হঠাৎ তারপর তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল, বিপুল বিক্রমে শিয়ালদুটো এগিয়ে এল। ওরা যে সিংহের আগমন টের পেয়েছে তা বোঝা গেল। আমিও রাইফেলটা উঁচু করে ধরে প্রস্তুত। খানিকক্ষণ বাদেই বোমার পিছন দিক থেকে একটা নীচু অথচ গাঢ় নিশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পেলাম। সিংহের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ যে এটা—তা আমার বুঝতে ভুল হোল না। ঘুরে গিয়ে তারা আমাদের ছেড়ে জেব্রটার ওপরে এসে পড়েছে। টর্চের আলো ফেলার

জন্য আমি কিরাকাঙ্গানোকে আস্তে আস্তে বললাম। কিন্তু তেমনি আস্তে আস্তে ওর মুখে 'তাবাল্লো'—অর্থাৎ 'দেরী করুন' শুনে আমি অবাক হলাম। তাকিয়ে দেখি ও ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে। দিনের বেলায় যে মানুষটা একটা বল্লমমাত্র সঙ্গে করে সিংহের সামনে নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই-ই রাতের অন্ধকারে বোমার মধ্য—থেকে এভাবে শিকার করার নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে।

তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে একটা মোচড় দিয়ে টোপের ওপর যখন আলো ফেললাম, তখন একটা চমৎকার দৃশ্য আমার চোখে পড়ল। মাত্র কয়েক গজ ব্যবধানে আমাদের জেব্রাটাকে চাটছে কুড়িটা সিংহ-সিংহী, টোপটার পাশে কোনটা দাঁড়িয়ে থেকে, কোনটা বা শুয়ে পড়েই জেব্রটাকে লেহন করছে তাদের জিভ দিয়ে। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে দুটো কালো-কেশর ওয়ালা বিরাট সিংহ।—দুঃসাহসী মনোভাব তাদের চোখে মুখে, তারা খাওয়া শুরু করেছিল বলে তাদের কেশরে মরা জেব্রাটার পেটের ময়লা আর রক্ত। এখন কিরাকাঙ্গানো বেশ থর থর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে ভীষণ আতঙ্কে, যদিও গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে'ই বা তার ঐ ভয় কেটে যাবে তা জানি আমি। যাতে টোপের উপর আলোকপাতে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্য টর্চটাকে একটা কাঁটাগাছের দুটো ডালের মাঝখানে আটকে রাখলাম, তারপর রাইফেলটাকে ঝোপের একটা ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে দুটো পুরুষ সিংহের মধ্যেকার বড়ো সিংহটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম গুলি। সিংহদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একযোগে ভয়ঙ্কর রকমের চীৎকার শুরু হোল। গুলি করলাম বার বার দুবার। রাইফেলে গুলি ভরার জন্য আর টর্চের আলোর সীমানার বাইরে সিংহের চলে যাওয়াতে আমি নিরস্ত হলাম। কিরাকাঙ্গানোর হতচকিত ভাবখানা এর মধ্যেই কাটতে শুরু করেছে। তাকে চিবানোর জন্য খানিকটা তামাক দিলাম। তামাক খেতে মাসাইরা খুব ভালোবাসে। মনে হোল তামাকের ঝাঁঝে তার সচেতনতাবোধ

ক্রমশরই ফিরে আসছে, আর তাছাড়া কোন মাসাইদের পক্ষেই তিনটে মরা সিংহ দেখার স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব। ইতিমধ্যেই সিংহেরদল ফিরে আসছে আবার। টর্চটা ধরে কিরাকাঙ্গানো প্রত্যেকটা সিংহের ওপর আলোকপাত করতে শুরু করে দিল। সে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে এতো দ্রুত আলো ফেলতে লাগল শিকারের উপর যে আলো করে লক্ষ্যস্থির করারও সময় পেলাম না। কিন্তু একটা করে সিংহ প্রতি গুলিতে মারা পড়তে লাগল। যদিও ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠুর সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না, তবুও প্রয়োজন ছিল এর। খালি পাশের মরা সিংহটাকে একবার শুঁকে নিয়ে গুলির দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই সিংহেরা শুরু করে দিয়েছে তাদের খাওয়া।

ইতিমধ্যে দশটা সিংহ জেব্রাটাকে ঘিরে মারা পড়েছে। এককোন থেকে একটা চমৎকার কালো কেশর সিংহ কোন মতলবে ছিল জানি না, চোরের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে এলো আমাদের বোমার কাছে। সে সেখানেই দাঁড়িয়েই রক্ত হিম করা কয়েকটা ভীষণ রকমের গর্জন করল, মৃত্তিকা যেন কম্পিত হোল সে গর্জনে। বাকি সিংহগুলো এই আচম্‌কা গর্জনে ভয় পেয়ে গেল, সবাই ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করল। তাদের পশ্চাদানুসবণ করল ঐ কালো কেশর সিংহটা।

বনের মুদাফরাস হায়না কর্ত্তৃক সিংহের চামড়া নষ্ট হোক এটা আমার অভিপ্রায় নয়। সিংহেরা সবাই চলে গেছে জেনে যখন আমি সিদ্ধান্ত করলাম তখন টর্চটা জ্বেলে রাখার জন্য আমি কিরাকাঙ্গানোকে আদেশ করলাম আর মরা সিংহগুলোর দেহটাকে টেনে টেনে আনলাম আমি। সমস্ত আতঙ্কের ভাব কেটে গিয়ে উৎসাহের ভাব জেগেছে মাসাইটার মনের মধ্যে। বোমা ছেড়ে যখন আমি প্রায় মরা সিংহগুলোর কাছে পৌঁছে গেছি তখন আচম্‌কা নিভে গেল আলোটা।

কিরাকাঙ্গনোকে চেঁচিয়ে টর্চটা জ্বালতে বলে কয়েক পা

আরও এগিয়ে গেলাম আমি। আচমকা একটা সিংহের ওপর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। তখনও তার শরীর উত্তপ্ত। আমি শুনতে পেলাম একটা চাপা নিঃশ্বাসের আওয়াজ। সিংহটা তাহলে এখনও বেঁচে আছে! ছিটকে বেরিয়ে এসে একলাফে প্রাণপণে ছুটলাম বোমা লক্ষ্য করে, কম সময়েই সিংহটার মুহূর্তের মধ্যে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার আশঙ্কা করছিলাম। যা হোক, আমি, বোমায় প্রবেশ করেই বন্ধ করে দিলাম দরজাটা। টর্চটার বিভিন্ন টুকরো গুলোকে নিয়ে কিরাকাঙ্গানোকে বসে থাকতে দেখলাম। তার কৌতুহল উদ্বেক করেছিল এই আশ্চর্য জিনিসটা, তাই কিভাবে জ্বলে সেটা তাই জানতে সে খুলেছিল টর্চটাকে; আর এদিকে আহত সিংহের ওপরে অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছি আমি।

খানিকটা ওকে তিরস্কার করতে ও মার্জনা ভিক্ষা করল। আবার টর্চটাকে ঠিক করে গুলি করে আহত সিংহটাকে একেবারে মেরে ফেললাম। বুঝতে পারলাম অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কোন পথ নেই। সে রাত্রে টোপের শেষে আরও দুটো সি হের দল এসেছিল।

সকালবেলা যে দৃশ্যটা দেখলাম, তা যেকোন লোকের পক্ষে অভাবিতপূর্ব। আমাদের সামনে আঠারোটা সিংহের মৃতদেহ পড়ে আছে। মনে হোল রাত্রের হট্টোগোলের থেকে সকালের পরিবেশটা অদ্ভুত রকমের শান্ত। মরা সিংহগুলোর ওপরে কয়েকটা পোকার ওড়ার ভন ভন্ শব্দ ছাড়া, কোথাও কোন শব্দ নেই। আর কোন আহত সিংহকে আশে পাশে না দেখতে পেয়ে বোমা থেকে বার হয়ে এসে মরা সিংহগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। বাধ্য হচ্ছি বলতে যে এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত কষ্ট হোল আমার মাসাইদের দুর্দশা কমাবার জন্য এদের মরণ যে নিশ্চিত তাও অবশ্য আমি জানি। যে স্থানের সিংহের সংখ্যাবৃদ্ধি অস্বাভাবিক কারণে ঘটেছে, অস্বাভাবিক উপায়েই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যতোই বেপরোয়া

কিংবা দল হোক না কেন মাসাইরা তারা নিজেরাই তাদের এ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়ে এ এক প্রকারের অসম্ভব ব্যাপার।

সরকার থেকে আজ বল্লম ধারী মাসাইদের সিংহ শিকার অপরাধ জনক, অথচ মাসাই রিজার্ভে আমি যখন প্রথম আসি তখন কোন নীতি নিয়মের গণ্ডীবাঁধা ছিল না। তাদের ঢাল বল্লম নিয়ে ডাকাতদের কবলে অনেক তরুণ মাসাইরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, ঐ লড়াই যারা দেখেছে তাদের সংখ্যাও আজ সীমিত।

শিকার-কাহিনী



সিংহীর নাম এলসা

জয় অ্যাডামসন

এলসা।

(সে এক সিংহ শাবক)

তাকে নিয়ে একদা ঝড় উঠেছিল সারা পৃথিবীতে, সে অর্জন করেছিল অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। কিন্তু বনের এক সিংহীকে যিনি জনতার সামনে হাজির করলেন তাঁর পরিচয় তো আগে জানতে হবে।

তিনি হলেন জয় অ্যাডামসন। স্বামীর সঙ্গিনী হয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে এসে ভালোবেসেফেলেন রহস্য রোমাঞ্চ কুহক আর তন্ময়তাকে।

হঠাৎ দেখা পেয়ে যান ছোট্ট সিংহ শিশুর। তার নাম দেন এলসা আর তাকে বড়ো করে তোলেন মায়ের স্নেহে।

একদিকে বুনো জীবন অন্যদিকে ভালোবাসার টান, এ দুয়ের আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্থ সিংহী এলসার আশ্চর্য সুন্দর কাহিনী নিয়ে জয় অ্যাডামসন রচনা করেন তিনটি অনবদ্য গ্রন্থ বর্ণ ফ্রি, লিভিং ফ্রি, ফর এভার ফ্রি।

তার থেকে সেরা কাহিনীটি বেছে নেওয়া হল।

সফারী।

এই সফারীর দৌলতেই পেয়েছি এলসাকে, যাকে নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

সফারী করত আমার স্বামী জর্জ, সে ছিল উত্তর কেনিয়া অঞ্চলের সরকারী অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষক।

আফ্রিকা মহাদেশের এক বিশাল অংশ উত্তর কেনিয়া।

কেনিয়া পর্বত হতে ইথিওপিয়ার সীমান্ত বরাবর বিশ হাজারেরও বেশি মাইল স্থান জুড়ে রয়েছে অগাধ অরণ্য রাশি।

আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়ার উত্তর সীমান্ত প্রদেশে তখন সভ্যতার ধ্বজা ওড়েনি। ভীনদেশী কেউ আসেনি এখানে বসবাস করতে।। পরম শান্তিতে দেশীয় মানুষরা পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রেখে হাসি খুসিতে নির্ধারণ করছে আপন জীবিকা।

এই প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্তে আমরা বাস করছি বহু বছর ধরে।

ছোট উপনগরীটি ত্রিশ জনের মত শ্বেতকায় সরকারী কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয়েছে ইসিওলোর কাছে।

বিরাট অরণ্যে বে-আইনী শিকার, হিংস্র বন্যপ্রাণীর অত্যাচার প্রভৃতি দেখাশোনার জন্য জর্জকে সব সময় এই বিশাল এলাকা জুড়ে টহল দিতে হত, সফারী তাকেই বলে।

সবুজ শান্ত সেই প্রকৃতির রাজ্যে জর্জ যখন একা বেরিয়ে পড়ত, আমিও তার সঙ্গ নিতাম···ঘুরতাম, দেখতাম, গাছ চিনতাম, পাতা ফুল ছুঁয়ে দেখতাম, অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম নাম না জানা পাখিদের দিকে, শুনতাম তাদের গান, তন্ময় হয়ে শুনতাম। আবার হিংস্র প্রাণীর গর্জনে তন্ময়তা ভেঙে গিয়ে জড়িয়ে ধরতাম জর্জকে। এই ভাবে এক ভালবাসার সাথে ভালবাসলাম অরণ্যকে, ভালবাসতে শিখলাম অরণ্যের প্রাণীদের। নিজেকে হারিয়ে ফেললাম তাদের সহজাত জীবনধারায়।

বন্য প্রকৃতির অবাধ লীলাভূমি এই সবুজ রাজ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা পেলাম প্রচুর।

সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার লেখনীর যাত্রা সুরু।

একদিন জর্জের কাছে খবর এল, বোরা উপজাতির একজন, এক মানুষ খেকো সিংহের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। জর্জকে সেই সিংহের একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সিংহের ব্যবস্থা করতে আমাদের উপনগরী ছেড়ে বোরা বসতীতে এসে ক্যাম্প করতে হল। এই বোরা বসতি ইসিওলোর অনেক উত্তরে।

জর্জ আরো জানতে পারল মানুষ খেকো সিংহটা তার দু-দুটো প্রেয়সীকে নিয়ে কাছে পিঠের কোন এক পাহারের গুহাতে আশ্রয় নিয়েছে।

উনিসশো ছাপ্পানোর ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিন। ভোরের আলো ফুটতেই, চোখ খুলে গেল, ঘুম ভেঙে দেখি জর্জ পাশে নেই। ক্যাম্পে আমি একাকিনী। আর প্যাটি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। আমার পাশে একেবারে গা ঘেঁষে।

প্যাটি ছবছর ছমাসের পাহারা হাই র‍্যাক্স। একদম বাচ্চা বয়স থেকে ও আমাদের কাছে। দেখতে একটি বড় ধরনের কাঠবিড়ালী বা খরগোসের মত খানিকটা। আবার বাঘের মাসি একটা বিড়ালের মতও বলা যায়।

আমার কোলের কাছে চুপচাপ শুয়ে আছে, যেন এই কোলটা ওর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বিঘ্ন স্থান।

ওকে নিয়েই ভাবছিলাম, এমন সময় গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু জর্জ তো এত তাড়াতাড়ি ফিরবে না। তবুও ক্যাম্পের ঝোলান ভারী দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলাম, প্যাটি আমার কাঁধে……

আমাদের ক্যাম্পের চার ধারটা বেশ শক্ত জমি। চারিদিকে

গ্রানাইট পাথরের খাঁজ বেরিয়ে আছে, তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু কাঁটা ঝোপ। সেই রকম একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে আমাদের ল্যাণ্ড রোভারকে দেখতে পেলাম।

ল্যাণ্ডরোভারটা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ক্যাম্পের সামনে দাঁড়াল। ওদিকে গাড়ি থেকে না নামতেই জর্জ চিৎকার করে আমায় ডেকে বলছে……তোমার জন্যে কী নিয়ে এলাম দেখ।

কাছে এগিয়ে গেলাম. দেখলাম একটা সিংহের চামড়া। বিস্তারিত সবকিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই জর্জ আমায় গাড়ীর পেছন দিকে ইশারা করে কিছু দেখতে বলল।

সে দিকে চেয়ে দেখি, আহা! কি সুন্দর এতটুকু তিন তিনটে সিংহ শিশু। গুড়িমেরে এ-ওর কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দেবার চেষ্টা করছে, যেন পৃথিবীকে মুখ দেখাতে কত লজ্জা। এখনো মনে হয় পৃথিবীর আলোর রঙ জানেনা, চোখ ফোটেনি। চোখের ওপর এখনো একটা নীল কুয়াশার পর্দ্দা।

চেষ্টা করছে হামাগুড়ি দিয়ে চলবার কিন্তু পারছে না। তাদেরকে কোলে তুলে নিলাম। খুব ভাল লাগছিল। তুলতুলে শরীর যেন তিনটে ছোট ছোট রেশমের পুঁটুলি।

জর্জকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তবু ও তখনই সকালের অভিযানটা বর্ণনা করল। খুব ভোরের দিকে মানুষ খেকো সিংহীটার সন্ধান পেয়ে কিছু লোক এসে জর্জ আর তার সঙ্গী কেন্‌কে ডেকে নিয়ে যায়।

যেখানে সিংহীটাকে দেখা গিয়েছিল সেখানে উপস্থিত হতেই দূর থেকে সিংহীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং সেটা হঠাৎ করে।

সিংহীটা তখন এত কাছে গুলি না করে উপায় নেই। জর্জের ইচ্ছে ছিল না গুলি করার। কিন্তু এদিকে ফিরে যাবার ও উপায় নেই, কাজেই জর্জের ইঙ্গিতে কেন্ সেই সিংহীটার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। প্রথম গুলিতেই সিংহীটা চোট খেয়ে পিছে মোড় নেয়…

যাবার পথে ফেলে যায় রক্তের দাগ। সেই রক্তের দাগ ধরে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকে। সামনে একটা বিরাট সমতল পাথর, জর্জ তাতে উঠে গেল আশপাশটা ভাল ভাবে দেখার জন্য, কেন্ রইল পাথরটার নীচে।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ পেতে জর্জ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, কেন্ নীচের দিকে ঝুঁকে একটা গুলি ছুঁড়েছে, তারপর আবার একটা, চাপা ঘর ঘর গর্জনের সাথে সাথে সিংহীটাকে দেখা গেল কেনের দিকে সেই আহত অবস্থাতেই ছুটে আসতে। কেন্ তখন অসহায়, কেননা তার রাইফেলে গুলি নেই। গুলি যে ভরবে তারও উপায় নেই।

জর্জ ও গুলি করতে পারছে না, কেন না সিংহীও কেন্ তখন একই সরলরেখায়।

ভগবান মাথার উপরে, তাই সেই সময় একজন পাহারাদার নিজের সুবিধামত স্থান থেকে সিংহীটাকে গুলি করল। গুলি খেয়েই সিংহীটা একটু ধারে সরে যেতেই, জর্জ অন্তিম গুলি করে। সিংহীটাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিল।

জর্জ কাছে গিয়ে দেখল সিংহীটা সদ্য প্রসবা দুধের বাঁট গুলোতে তখন ভর্তি দুধ। কিছুদিন আগেই মনে হয় সে সন্তান প্রসব করেছে।

জর্জের বুঝতে দেরি হল না কেন এই অরণ্য সমাজ। চোট খেয়েও পাল্টা আক্রমণ করছিল। নিশ্চয়ই শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়েও বাঁচাতে চাইছিল আদরের শোনা মনিদের। কিন্তু হায়! প্রাণ টুকু দিয়েও.........

জর্জের মন গভীর বেদনায় ভরে গেল, যদি সে এটা আগে বুঝতো! তবে অভিযানটা একটু অন্য রকম ভাবে সাজাতো।

যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন ঐ দুধের বাচ্চাগুলেকে খুঁজতে হবে, নিশ্চয় কাছে পিঠের কোন ফাটলে তারা মায়ের আসায় সময় গুনছে।

এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সামান্য একটু পরেই একটা ফাটল থেকে বেশ ফোঁস ফোঁস গর্ গর্ শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল ওই শব্দ সিংহ শিশুর।

ফাটলের মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও হাত দিয়ে বাচ্চাগুলো বার করা গেল না।

অবশেষে গাছের একটা ডাল ভেঙে আঁকশির মত করে বাচ্চাগুলোকে টেনে বার করা হল। তিনটে সিংহ শাবক।

তারপর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসার সময় দেখলাম বড় দুটো মুখে ফেনা ভরিয়ে বেশ গজরাচ্ছে। কিন্তু ছোটটি নির্বিকার।

আমি বুঝলাম এবার এদের মানুষ করতে আমায় বেশ বেগ পেতে হবে। এদিকে প্যাটিকে নিয়েও চিন্তায় পড়লাম। এতদিন সব আদর যত্ন ওই পেতো এখন আরও তিনটে এসে জুটেছে। সেটা কি প্যাটি মেনে নেবে?

কিন্তু আশ্চর্য প্যাটি কিন্তু ওদের অপচ্ছন্দ করল না, অনায়াসেই ওদের তিনজনের ভিড়ে ঢুকে গেল। যেন ওর খেলার সাথী এসেছে।

এক থেকে একবারে চার।

আর এইদিন থেকেই এই চারটে পশুর মায়ার বাঁধনে কেমন ভাবে জড়িয়ে পড়লাম নিজেই জানি না।

ওদের চারজনের মধ্যে প্যাটিকে সবার বড় মনে হত। তা ছাড়া সত্যিই ত প্যাটি ওদের চেয়ে ছ-বছরের বড়।

বাচ্চা তিনটেকে কিছুতেই দুধ ধরাতে পারি না। দুটো দিন এই ভাবে কেটে গেল। যত কায়দা করেই দুধ খাওয়াতে চাই, মুখ কিছুতেই খোলে না······শুধু আপত্তি করছে ফোঁৎ······ফোঁৎ, মহা মুসকিল······ঠিক যেন আমাদের ছোট বেলার সেই ছোট শিশুটি ······ঝিনুক থেকে মুখ সরিয়ে নেওয়া······না······খাবো না······ যাও······

অবশ্য দুধ খাওয়া তারা শিখল। তবে এক সঙ্গে বেশি খাবার ক্ষমতা ছিল না। দু-এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর মিষ্টি না দেওয়া গোলা দুধ গরম করতে হত। সাফ সুফ করতে হত রবারের নলগুলো।

ওদের এখন মায়ের দুধ খাওয়া অভ্যেস। সেই মায়ের দুধের পরিপূরক কিছু জোগার করা সম্ভব। এমন কি শিশুদের দুধ খাওয়ার কোন বোতল আমাদের কাছে ছিল না। পরিবর্তে রেডিওর ভেতর থেকে একটা রবারের নল নিয়ে, আপাতত কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলাম।

অবশ্য এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা বাজার থেকে লোক পাঠিয়ে নকল দুধের বাঁট, গ্লুকোজ, মিষ্টি ছাড়া দুধের কৌটো আর কডলিভার তেল আনতে দিয়েছি।

এখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে ইসিওলোতে জেলা শাসকের কাছেও জরুরী বার্তা পাঠিয়েছি—আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই তিনটি সিংহ শাবক নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। ওদের জন্য কিন্তু আরামপ্রদ সু-ব্যবস্থা চাই।

দিন কয়েকের মধ্যেই বাচ্চাগুলো বেশ মানিয়ে নিল। সবার আদরের পাত্রি যেন ও বাচ্চাগুলো। আর প্যাটি? সে যেন ওদের ধাইমা। বাছা তিনটে ওকে কম জ্বালাতন করত না। টানা-হেঁচড়া তো লেগেই থাকত···এক এক সময় তিনটি কন্যা যখন খেলাচ্ছলে প্যাটির গায়ের ওপর জড়িয়ে পড়ত, তখনও প্যাটি কিছু বলত না। তাছাড়া দিনকেদিন ওরা বেশ বড় হতে লাগল, দেখতে প্যাটিকেও ছড়িয়ে গেল।

ওদের দুষ্টুমি গুলোও অদ্ভুত ধরণের। বেশ মজার ব্যাপার। পরে বলছি সে কথা।

ওরা তিন বোন যেন তিন রকমের। বড়টি একটু ভারিক্কি ধরণের সব সময়ই দু-বোনকে যেন শাসনে রাখতে চায়। আবার তাদের ভালবাসত ও প্রচুর। প্রচণ্ড উদার ছিল সে।

মেজটি যেন সব সময় হাসি খুসি। হাসি হাসিতে ভরিয়ে দিতে চায় ভুবন, আর দুধের বোতল তো কথাই নেই। বোতলটিকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকত। মনে হত ওই বোতলটা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে আদরের বস্তু······প্রচণ্ড সোহাগি। তাই তার নাম দিয়েছিলাম লাঙ্কিকা অর্থাৎ সোহাগি।

আর সব চেয়ে ছোট্টটি সবার চেয়ে পাতলা চেহারা। কিন্তু পাতলা চেহারা হলে কি সবার চেয়ে তেজি। সবাইকে পরিচালনা করার মত ক্ষমতা ছিল ওর। কোন কিছুর সন্দেহ থাকলে, এই ছোট্টটাই আগে এগিয়ে যেত।······ওর হাবভাবে আমার একজনের কথা মনে পড়ে যেত তাই ওর নাম দিয়েছিলাম এলসা।

এলসাই এই কাহিনীর নায়ক তথা নায়িকা। কিন্তু এই পাতলা চেহারার এলসা যদি আমার হাতে না পড়ত তবে আজ কোথায় হারিয়ে যেত কে জানে।

কারণ সাধারণতঃ পাতলা বা দুর্বল চেহারার সিংহ সিংহীরা দলে স্থান পায় না। যে কোন কারণে তারা একদিন মারা পড়ে, ব্যাপারটা খুলেই বলি।

সিংহ সিংহীদের এক সাথে থাকাকে বলে 'প্রাইড' বা যুথ।

এক বা তার আরো বেশি ওই সিংহ পরিবারে যাতে আরো কয়েকটা জুটে গিয়ে এক সাথে শিকার করতে পারে। সেটা হল যুথ। এক এক পেয়ার বা একটী সিংহের সঙ্গে ভিন্ন করে বোঝাবার জন্যই এই যূথ শব্দটা ব্যবহার হয়।

এলসা যদি সেই যূথ এ থাকত, তবে একদিন হয়ত দল থেকে ঠিকরে পড়ত।

সাধারণতঃ সিংহীর চারটে বাচ্চা হয়। একটী সাধারণতঃ মারা যায়। তৃতীয় যেটা থাকে সেই দুর্বল গোছের, ফলে মায়ের সাথে শিকার বা ঘুরে বেরোতে পারে না।

দুবছর বয়স পর্যন্ত মা বাছাদের দেখা শোনা করে।

মা যা খায় তাই চিবিয়ে চিবিয়ে বাচ্ছাদের মুখে তুলে দেয়।

দু বছর পার হতে মা ওদের নিয়ে চরতে বেরোয়। তখন কিন্তু তাদের বেশ সাবধানে থাকতে হয়।

একটু বেহিসাবী হলেই প্রাণ যাবার ভয় থাকে। কেননা এই সময় তো ওরা আর শিকার ধরতে পারে না। বড়দের কাছে যা খুদ কুড়ো পায় তাই খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এর বেশী আশা করলে সমূহ বিপদ।

এই সময়টা তাই বাচ্চাদের অশেষ দুঃখ, এক এক সময় খিদের জ্বালায় বড়দের মধ্যে খাবারের ভাগ বসাতে যায় ফলে কখনো কখনো সেই বড়দের নখের আচড়···চড় চাপড়টা পর্যন্ত খেতে হয়। ফলে অনেক সময় সেই দুর্বল বাচ্চাগুলো মারা যায়।

কোন কোন সময় দেখা যায়, খিদের জ্বালায় 'প্রাইড' ছেড়ে নিজেরাই শিকারে বেরিয়ে যায়। কিন্তু শিকার করার প্রক্রিয়া কিংবা শক্তি না থাকায় বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়······

আজ এলসা আমার কাছে, ও যদি জঙ্গলে থাকত হয়ত প্রকৃতি ওর জন্যেও এমন কোন চরম পরিণতি এনে দিত।

আমার ছোট সংসারে প্যাটি ও তিন শাহাজাদি কিন্তু বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে থাকে।

ওদের প্রিয় স্থানটা হল আমার ক্যাম্প খাটের নীচে।

আমার কাছে থাকতে থাকতে দিন কে দিন ওরা এমন হয়ে গেল যে, বাইরের মাটিতে পা দিতে চায় না।

আমি তখন ইচ্ছে করে জায়গাটা জলে ভিজিয়ে দিতাম....

ওঃ, তখন মুখের ভাবটা দেখলে দারুণ হাসি পেত। বিরক্তির সাথে কুঁই কুঁই করত।

এদিকে সাহাজাদিরা অবার নোংরা থাকতে ভালবাসে না। তাই কোন সময়ই ওদের গায়ে কোন বদগন্ধ পেতাম না।

ক্রমে একটু একটু করে বড় হয়। জিভ খর খরে হতে থাকে।

সপ্তাহ ছুই পরে ইথিওলো ফিরে এসে দেখলাম, আমাদের শাহাজাদিদের জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরী হয়ে গেছে।

অনেকে ওদের দেখতে এল। ছোট ছেলেমেয়েরা তো ওদের আদর করার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু আমাদের শাহাজাদিরা যেন অন্য কোন মানুষদের একবারে পছন্দ করে না।

কিন্তু তারু বলে যে ছেলেটা বাগানের কাজ-কর্ম্ম করত তার সাথে কিন্তু বেশ ভাব হয়ে গেছে।

তারুকে আমরা শাহাজাদিদের দেহরক্ষীর পদে বহাল করলাম।

তারু ও খুব আনন্দিত। দিন রাত সে শাহাজাদিদের আগলে বেরাত।

তিন মাস কেটে গেল। ওদের এখন কডলিভার তেল আর গ্লুকোজের সাথে হাড়ের গুড়োর সাথে একটু নুন মিশিয়ে খাওযাচ্ছি আর মিষ্টি ছাড়া তুধ তো আছেই।

দিন যত এগোচ্ছে খাবার সময়টাও তত পরিবর্তন হচ্ছে। এখন ওদের তিন ঘণ্টা বাদে খেতে দিচ্ছি।

চোখ ফুটে গেছে। কিন্তু এখনও যেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি পায় নি।

ওদের খেলা করার জন্য রবারের নল আর পুরানো টিউব দিলাম। সে সব নিয়ে ওরা যখন খেলা করত— দেখতে যেন মজা লাগত।

টিউবটা হয়ত একজনের কাছে···অমনি আরেকজন এসে সেটা ছিনিয়ে নিত···আরেকজন হয়ত একজন ধরে আছে···অমনি আরেকজন গড়িয়ে এসে পড়ত টিউবের ওপর, শরীরের চাপে টিউবটা যদি ছেড়ে যায় ভাল। নচেৎ অন্যজন প্রাণপনে টিউব ধরে টানত। যদি সে সক্ষম হত, তবে মুখে কামড়ে ধরে সবার নাকের ডগায় টিউবটা ছুলিয়ে বেড়াত। অন্যে যখন তখন সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্য তার ওপর ঝাঁপ দিত।

সত্যি এত মজা লাগত তা দেখে।

আরো সব খেলাধূলার মধ্যে পিছু নেওয়া খেলাটা অদ্ভুত।

সবাই সবার এক এক বারে পিছুনিত আমরাও বাদ পড়তাম না।…তারপর হঠাৎ সামনে যে আছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ঠিক যেন শিকার ধরার খেলা। এমন ভাবে মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেত যে, বোঝার উপায় ছিল না। তারপর লুটি পুটি…চিৎপটান…ঘুঁষো ঘুঁষি তো চলতই, বেচারি প্যাটির অবস্থা হত সঙ্গীন। ওর মুখটাও কি করুণ লাগত তখন। ও-নিজেও ওই সব খেলায় যোগ দিতে চায়। কিন্তু বাচ্চাগুলো বড় হয়ে ওরা এখন প্যাটির চেয়ে তিন গুণ হয়ে গেছে। তাই ওই সব দুরন্তপনা খেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত।

আকৃতিতে ছোট হলে কি হবে। নিজের মনোবল বুদ্ধির জোরে। মাতব্বরিটা ঠিক বজায় রাখত। হয়ত কেউ খুব দুষ্টমি করছে…অমনি তার সামনে গিয়ে এমন ভাবে দাঁড়াত যে ওরা মাথা নীচু করে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। ওর ছোট চেহারাটা নিয়ে এমনি মাতব্বরি দেখতে আমাদেরও মজা লাগত। ওর তাই সামান্য সম্বল ধারাল দাঁত মনের সাহস, আর উপস্থিত বুদ্ধি, যা ওর প্রশংসার দাবী রাখে।

এই প্যাটি সেই ছোট বেলা থেকে আমার কোলে বড় হয়েছে একবারে মানুষের জীবনধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বুনো হাইরাক্সের মত ও কিন্তু নিশাচর নয়। ঠিক ওই সময়টাতে ও আমায় তার নরম তুল-তুলে শরীরটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে।

ও নিরামিষাষী, কিন্তু এ্যালকোহলের প্রতি কেন যে আসক্তি বুঝি না। কেউ নেই কোথায়…সুযোগ বুঝে এ্যালকোহলের ছিপি খুলে তার স্বাদ নিতে ছাড়ে না।

এটা ওর শরীরের পক্ষে খারাপ। এইটুকু বাদ দিয়ে ওর নৈতিক চরিত্রটা সত্যিই নির্মল। তাই আমাদেব জিন বা হুইস্কির বোতল-গুলোকে সাবধানে রাখতে হতো।

সব চেয়ে মজার ওর পায়খানার ব্যাপারটা। পাহাড়ীয়া হাই

ব্যাঙ্গরা সাধারণতঃ পাহাড়ের কোন ধারে একই জায়গায় মল ত্যাগ করে। কিন্তু ওই প্যাটি? ওঃ ওর ল্যাভাট্রীর বেড়ার ধারে বসে মলত্যাগ করার অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমরা না হেসে পারতাম না।

আমাদের হাসতে দেখে ও যেন কেমন ঘাবড়ে গিয়ে গোবেচারা ধরনের হয়ে যেত। তাই আমরা ওর জন্য একটা অভিনব পায়খানার ব্যবস্থা করে দিলাম।

ভীষণ খুঁত খুঁতে ধরনে পরিষ্কার আমাদের ওই প্যাটি। কোনদিনও আমরা ওর গায়ে কোন পোকা লোমে কোন উকুন দেখিনি। তবুও ও সব সময় তার ধারাল নখ দিয়ে লোম আঁচড়াত। প্রথমে একটু অবাক হতাম। তারপর দেখলাম গায়ের লোম যাতে পরিছন্ন পরিপাটি থাকে তার জন্যই ও নখ দিয়ে লোম আঁচড়াত।

লেজ বলে কিছু আছে মনে হত না। ওর মেরুদণ্ডের মাঝ বরাবর একটি গ্রন্থী থাকে। ওর ডোরাকাটা লাল রঙের লোমের মধ্যে সেটা ঠিক একটা সাদা কাপড়ের পাড় মনে হত।

যখন ও খুব ভয় বা আনন্দ পেত, তখন সেই গ্রন্থী থেকে রস বেরিয়ে লোমকূপের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত। আর লোমগুলো তখন খাড়া হয়ে যেত।

এই প্যাটি এত নির্ভীক ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই বাচ্চাগুলো যে এক এক সময় এত ভয় খাওযাত বলার নয়

আগেই বলেছি খুব দুরন্ত ছিল আমার সাহাজাদিরা…ফলে ওকে ওদের থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য জানলার ওপরে কিংবা ঝুলন্ত কোন জায়গায় উঠে পড়তে হ'ত…সাহাজাদিরা তো সেই সব জায়গায় ওদের ভারী শরীর নিয়ে উঠতে পারত না তাই প্যাটির রক্ষে।

এক এক সময় প্যাটির প্রতি আমার খুব মায়া লাগত… সাহাজাদিরা যখন ছিল না ও তখন একাই সব আদরটুকু পেত, ওরা আসার পর ওর আদর যেন বেশ কিছুটা কমে গেল, তবুও আশ্চর্য

ও কিন্তু তার জন্য কোন দিন এতটুকু অভিমান করেনি। একবারে নিজের মত করে ওদের মানিয়ে নিয়ে ছিল।

এদিকে সাহাজাদিরা দিনকে দিন বলবান হয়ে পড়ছে। ওরা তাই সময় অসময়ে তাদের শক্তি ফলিয়ে বেরাত।

শক্তি জাহির করত মাটিতে পাতা কার্পেটের সাথে তা সেটা বড় ছোট বলে বিচার করত না ঠিক শিকারী বিড়ালীর মত শরীরটাকে নীচু রেখে দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে টেনে নিয়ে যেত।

ওদের আরেকটা প্রিয় খেলা ছিল দুর্গ জয় করা খেলা।

একজন লাঠ দেওয়া আলুর বস্তার উপর লাফিয়ে উঠে যাবে। আরেক জন সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দেবে যতক্ষন তৃতীয় জন পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে না পড়ছে। তারপর যতক্ষন না তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এলসাই কিন্তু এ খেলাতে বেশি জিতে যেত। কেননা ওছিল সবার চেয়ে চালাক, দুজন যখন যুদ্ধ চালাছে ও তখন সুয়োগ বুঝে বাজি মারত।

কলাগাছ পেলে তাকে যতক্ষন না ছিঁড়ে ছিটে খার খার করছে ততক্ষন সেই গাছকে নিস্তার দিতনা।

গাছে উঠতেও তিনজন ওস্তাদ। কিন্তু ঝোঁকের মথায় যখন খুব উঁচু ডালে চেপে বসত। তখন নামবার সময় পড়ত ফ্যাঁসাদে··· অসহায় দৃষ্টি নিয়ে নিচের দিকে চেয়ে থাকত। তখন বাধ্য হয়ে আমরাই তাদের উদ্ধার করতাম।

তরু সকাল হতেই যখন ওদের বাইরে ছেড়ে দিত তখন কি প্রাণ চঞ্চল। সারারাত আটকে থাকার পর যেন একসাথে সারা পৃথিবী চষে বেরাতো।

একদিন বেশ মজার ব্যাপার ঘটল আমাদের কাম্পের একটু দূরে, আমাদের দুজন অতিথি ক্যাম্পে বাস করছিলেন। ওরা তিনজন ছাড়া পেতেই এক দৌড়ে ছুটে গেল সেই কাম্পের দিকে···

ব্যাস নিমেষের মধ্যে…ক্যাম্পের অবস্থা দফারফা। অতিথিরা তখন ত্রাহি ত্রাহি রবে চিৎকার করছে।

আমি আর জর্জ সেদিকে ছুটে গেলাম। ছুটে গিয়ে ওদের কাণ্ড দেখে হাসব না কাঁদব ঠিক করে পেলাম না। একদিকে অতিথিরা যখন ক্যাম্পের জিনিস পত্র গোছাতে ব্যস্ত। অন্যদিকে আমাদের তিন সাহাজাদি তখন অবাধে লুণ্ঠন করে যাচ্ছে….বার বার ওই ক্যাম্পের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে…আর তার মধ্যে থেকে এক একটা জিনিস লুঠ করে আনছে…যেমন মসারীর ছেঁড়া টুকারো। জুতো জামা অবশেষে একটা লাঠি নিয়ে ওদের তাড়া করলে ওরা রনে ভঙ্গ দিল।

সন্ধ্যেবেলা ওদের ঘরে ফিরিয়ে ঘুম পাড়ান ছিল অতি দুস্কর ব্যাপার…কেউ তখন ওদের ধরতে পারত না…একেই অন্ধকারে ওদের চোখ হীরের মত জ্বলে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ভাল দেখতে পায় ফলে আমাদের নাজেহাল হতে হত।

এরজন্য আমাদের ও একটু চাতুরির আশ্রয় নিতে হত। একটা লম্বা দড়িতে একটা পুটলি বেঁধে খোঁয়ারের দিকে নিয়ে যেতাম। দুষ্টু সাহাজাদিরা তখন সামনে খেলার জিনিস দেখে চুপ করে থাকতে পারত না…তারা সেই পুটলিটিকে ধাওয়া করত….সেই সুযোগে পুটলি সমেত ওদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে তবে শান্তি। দুষ্টুমির একটা সীমা আছে…কিন্তু ওদের নেই…তবুও ভাল লাগত…ওদের দুষ্টুমি এসব বাদেও বইপত্রের উপরেও কম লোভ ছিল না…

এদিকে আমাদের ছোটখাট লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান বই বাঁচাতে নিজেরাই ওদের আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলাম…শুধু তাই নয় অন্যান্য ঘরের জিনিস পত্র বাঁচাতে একই ব্যবস্থা নিতে হল।

প্রত্যেক ঘরের দরজার সামনে ঘরে উঠিবার মুখে বারান্দার দরজার সামনে বাঁধ সমান উঁচু করে একটা কাঠের আলগা দরজার ব্যবস্থা করলাম।

দুষ্ট দুরন্ত শাহাজাদিরা এটাকে মেনে নিতে পারল না। অবশ্য তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটা বড় টায়ার গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ওরা কিছুটা খুসি হল। ওই টায়ারটাকে নিয়েই তখন যত কুস্তি... ওটাকে চিবোত...কাটত, ওটার মধ্যে ঝুলে দোল খেত।

একটা মধুর ড্রামও ওদের খেলার জন্য দিলাম...ওরা সেটাকে নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে বেড়াত।

আরেকটা মজা হত। কিছু পুরানো কাপড় চোপড়...ছেঁড়া টিউব নিয়ে একটা পুঁটলি করে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে দড়িটা অন্য প্রান্তে টেনে ধরে রাখতাম। শাহাজাদিরা সেটাকে ধরবার জন্যে লাফ দিত। যে সফল হত অমনি সে সেটা ধরে ঝুলতে আরম্ভ করত। আর সেই সুযোগে অন্য প্রান্ত থেকে দড়িটা টানতেই বাচ্চাটা সমেত পুঁটলি ওপরে উঠে যেত...তখন ওর মুখের চোখের ভাব দেখে আমরা প্রচণ্ড হাসতাম। ওরা কিন্তু বেশ মজা পেত।

এত রকমের খেলা দিয়েও কিন্তু তাদের ঘরের কথা ভোলান গেল না। সুযোগ পেলেই সেই কাঠের আলগা দরজার বেড়ায় গিয়ে মুখ ঘষত।.

একদিন বাড়িতে কয়েকজন অতিথির আগমনে বেশ আমোদ প্রমোদ হৈ হুল্লোড় হচ্ছে।

সেদিন কিন্তু ওদের ব্যবহার আশ্চর্য রকমের শান্ত ছিল। চুপ-চাপ তিন শাহাজাদি লক্ষ্মী মেয়ের মত সারি করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ এতটুকু দরজার কাছে এগিয়ে এলনা।

ব্যাপার কি। ওমা। লক্ষ করে দেখি একটা সাপ আমাদের ও শাহাজাদিদের মাঝখানে সিঁড়ির ওপর ফণা তুলে গর্জন করছে। পরে বন্দুকটা নিয়ে আসতে গিয়ে দেখি সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

এত রকমের বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের সোহাগি অর্থাৎ ল্যান্টিকাকে আটকান দায় হয়ে উঠল। সে যেরকম ভাবেই দরজার ছিটকিনি পর্যন্ত থাবা উঠিয়ে হাতল ঘোরাত। ভারি বেয়াদপ, ভয়ানক

দুষ্টু তো···দরজা খুলে ফেলেছে আর কি···আমরা তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে তবে রেহাই পেতাম।

ল্যান্টিকা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়, সুযোগ বুঝে একদিন সেই রকম হাতলের মাথাটা ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছিল। আমরা দেখতে পেয়ে বকুনি দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলাম।

ওই-দুষ্টটা তখন করল কি—আমাদের কাপড় শুকোবার দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল।

অর্থাৎ তাড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ। দেখতে দেখতে শাহাজাদিরা আরো বড় হয়ে গেছে, ওদের বয়স এখন তিন মাস। দাঁতগুলো যেন ধারাল আর বড় বড় হয়েছে। এই সময় ওরা মা-র দেওয়া চেবানো মাংস খেয়ে থাকে। আমরা তার যত কাঁচা মাংসকে ভালভাবে কিমা মত করে আরো নানারকম জিনিস মিশিয়ে ওদের খেতে দিতাম। কিন্তু প্রথম প্রথম শাহাজাদিরা এমন অভিনব খানায় মুখ দিতে চাইত না, অবশেষে আমাদের ল্যান্টিকা সেই খাবার চেখে দেখল।

—না-মন্দ নয়—ভালই লাগছে···দুই বোন যখন দেখল ল্যান্টিকা যখন পছন্দ করেছে তখন তাদেরই বা কেন না-পছন্দ···

কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল সেই অভিনব খানা নিয়ে রীতিমত মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল।

এ এলসার বেচারার মহা বিপদ হল। কেননা তিন বোনের মধ্যে ও সবচেয়ে ছোট আর দুর্বল। অর্থাৎ মায়ের দুর্বল সন্তান, সে সন্তান গিয়ে সমাজে বেশিদিন বাঁচতে পারে না।

কি আব করি, বাধ্য হয়ে ওর জন্য আলাদা ভাবে খাবার রেখে দিতাম।

আমি কাছে বসে ওকে খাওয়াতাম ওঃ! সে কি অদ্ভুত ওর ভাবভঙ্গী, খাচ্ছে চোখ বুজে···আর মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলিয়ে আয়েস করে চিবোচ্ছে···যেন এই খানাটা কত সুখের!

এই সময় ও আমার হাতের বুড়ো আঙুল চুষত…আর থাবা দুটো দিয়ে আমার উরুতে ঘসত…ঠিক ছোট বেলায় শিশুরা যেমন বেশি দুধ পাবে বলে মায়ের বুকে ঘন ঘন মাথা ঘসে তেমনি, ঠিক এই সময় থেকেই আমি যেন এলসাকে বেশি ভাল বেসে ফেললাম।

কত সুন্দর ভাবে আমাদের দিনগুলো আনন্দে অতীত হতে থাকে।

আদর খেয়ে খেয়ে ওরা এমন হয়ে গেল—কোন জায়গায় যদি একবার আরাম করে বসতে পায়, আর সেখান থেকে ওঠার নাম করে না। এমনকি লোভনীয় মজ্জার হাড় দেখালেও ছুটে আসত না—আসত, তবে সেটা আড়ালের জায়গা থেকে ফুটবলের মত গড়িয়ে।

বেশ লাগতো তখন, যখন আমি সেই হাড় তুলে ধরতাম আর ওরা চার থাবা শূন্যে তুলে চিৎ হয়ে সেই হাড় থেকে মজ্জা চুষে খাবে, আমাকেই সেই হাড়টাকে ধরে রাখতে হবে, ওরা এতটুকু ছোঁবে না।

ওদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলে মাঝে মাঝে হঠাৎ দুঃসাহসিক ব্যাপারের সন্মুখীন হতে হত।

এই রকম একদিন ওদের নিয়ে সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। আগের সন্ধ্যায় পেটে ক্রিমির জন্য ওষুধ খাইয়েছিলাম। তার প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্য ওদের পেছনে পেছনে চলছি…কিছুদূর গিয়ে ওরা শুয়ে পড়ল।

এমন সময় দেখি একদল বড় বড় কালো পিঁপড়ে ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি ওদের শরীরের ওপরেও চড়াও হয়েছে পিঁপড়ে গুলো কিন্তু বেশ মারাত্মক। ওদের চোয়ালের জোর এত বেশি যে, সামনে কিছু পড়লে ওরা সেটা কামড়ে কুটো কুটো করে দেয়।

আমার আদরের শাহাজাদিরা তখন একটু আরামে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করছিল না, তবুও ঘুম ভাঙাতেই হবে। কিন্তু

হঠাৎ দেখি পিঁপড়ে গুলো কেন জানিনা ওদের প্রতি সদয় হয়ে পথ পরিবর্তন করল।

আরেকদিন হয়েছে কি···কি ওরা তখন সেইভাবে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় একদল গাধা চরতে চরতে ওদের কাছে চলে আসে।

ওরা ঘুম ভেঙে গাধাদের দিকে চাইতেই অবাক হয়ে গেল··· আরে বাবা! এত বড় জীবতো ওরা কোন দিন দেখেনি। এরা অবার কোথাকার বাসিন্দা?

প্রথম চোটে এতটুকু ঘাবড়াল না। আরে, সিংহের বাচ্ছা তো। সিংহ-বিক্রম যাবে কোথায়?

দেখতে না দেখতেই একবারে রণ হুঙ্কার দিয়ে এক ঝাঁপ। ব্যাস্ নিমেষে গাধার দল উধাও। ওদের মনে এতে সাহসও বেড়ে গেল। ফলে হল কি আমাদেরই বোঝা বওয়া গোটা চল্লিশ গাধা আর কিছু ঘোড়া বাড়ির সামনে হাজির হতেই তিন শাহাজাদি একবার মারমুখী তাড়া করল···গাধা ঘোড়া গুলো তখন প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারল ছুট লাগাল। একবারে পুরো বাহিনীটাকে ছত্র ভঙ্গ করে ওরা বীরবিক্রমে ফিরে এল। এখন আর ওরা তিনমাসের শিশুটি নয়। ওদের বয়স এখন পাঁচ। শাহাজাদিরা এখন রীতিমত সুন্দরী হয়ে উঠছে। আমার ছোট্ট ক্যাম্পের শাহিবাগিচায় ওদের রূপ যৌবন ধীরে ধীরে ফুটতে থাকে। শক্তি বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন ওরা দিনের বেলা সারাক্ষণই মুক্ত থাকে। রাত হলে ওরা বালি আর পাথর দিয়ে সাজানো প্রাচীরের গণ্ডির মধ্যে ঘুমোয়, যেটা ওদের কাঠের ঘর থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসা যায়।

আমাদের এই সাবধানটুকু নিতে হত, কেননা বাড়ির চার পাশে হায়না হাতি শিয়াল আর বন্য সিংহরা ঘুরে বেরায়। বলা তো যায় না, আমাদের বাচ্চাগুলোকে যদি আক্রমন করে!

ওদের কে যত ভালবাসছি···যতই বেশি করে জানছি···ততই

ভাল লাগছে···সাথে একটা নিষ্ঠুর সত্য সম্বন্ধে বুকটা মোচর দিয়ে ওঠে। ওরা যে ভাবে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে, ততই চিন্তা হচ্ছে। কেননা সব সময়ের জন্য তো ওদের কে এমনি ভাবে বুকের মধ্যে আগলে রাখতে পারব না।

মন চায় না, হৃদয় ভেঙে যেতে চায়। তবুও সিদ্ধান্ত নিতে হয় ওদের মধ্যে দুটিকেই স্থানান্তরিত করতে হবে। করলে বড় দুটিকেই কেননা তিনজনের মধ্যে ওই দুজন যেন বেশি পিঠে-পিঠি। তাছাড়া ওরা এমন বেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। এলসার মত অতটা আমাদের ওপর নির্ভর করে না।

তাই পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলাম। যদি বুকের কাছে রাখতে হয় তবে ওই এলসাকেই রাখব। কেননা ছোট্টটি থেকেই ও যেন বেশি গায়ে লাগা। বোনেদের সাথে ততটা মেশেনি। ওকে ভাল ভাবে তৈরি করে নিলে শুধু ইসিওলোতে কেন, সফারীতেও উপযুক্ত সঙ্গিনী হবে।

এদিকে বড়টি আর সোহাগির জন্য আমরা রটারডাস ব্লাইডর্প চিড়িয়াখানার সাথে কথা বললাম। ওদের নিয়ে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য প্লেনের ব্যবস্থাও করলাম।

ইসিওলো থেকে পৌনে দুশো মাইল দূরে নাইরোবী বিমান ঘাঁটি। সেখান থেকে ওরা যাত্রা শুরু করবে।

তাই আগে থেকে ওদের গাড়ী চড়া অভ্যাস করার জন্য একটা লোহার জাল ঘেরা ট্রাকে রোজই বেশ কিছুটা রাস্তা বেড়িয়ে আনতাম। যাতে ওরা যাবার পথে ভাবতে পারে ওরা ওদের খেলার খোঁয়াড়েই আছে।

অন্তিম দিবসে কেমন যেন বিষাদের ছায়া চারিদিকে।

ট্রাকে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য মেঝেতে কিছু নরম বালির বস্তা ভিজিয়ে রাখা হল।

একসময় ওদের দুজনকে উঠিয়ে গাড়ি ছাড়া হল···আর ঠিক সময়

দেখি এলসা ছুটে ছুটে এগিয়ে আসছে। কিছুটা এসেই থেমে গিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল ছুটে যাওয়া গাড়ীর দিকে! এলসা চেয়ে রইল···স্থির দৃষ্টিতে···মায়াভরা চোখে···যতক্ষণ গাড়ীটা তার দৃষ্টির সীমানার বাইরে চলে যায়।

আর আমি···এলসার ওর সেই করুণ দুটি আঁখির পানে চেয়ে··· বুকটা কেমন যেন কঠিন ভাবে মোচড় দিয়ে উঠল···বুক ঠেলে এক দলা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল···আমি এলসার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।

আমার দুই আদরের শাহাজাদির সাথে আমিও গাড়ীর পিছনে বসে ছিলাম। মনে ভয় ছিল ওদের আদরের ঠেলায়ই আমায় যদি কিছু আঁচড়-ফাঁচড় খেতে হয়, তাই আত্মরক্ষার জন্য···না হাতিয়ার বলতে যা বোঝায় তা নয়···একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স নিয়ে বসে ছিলাম।

কিন্তু লজ্জার বিষয়, সেই বাক্স কোন কাজে লাগে নি।

অবশ্য শাহাজাদি দুজন বেশ কিছুক্ষণ একটু ছট-ফট করেছিল বইকি···কিন্তু একটু পরেই কেমন সস্তি হয়ে বস্তার উপর শুয়ে পড়ে আমায় তাদের থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরল···যেন অবোধ শিশুরা খুঁজে চলেছে মায়ের আদরের কোল।

এমনিভাবে প্রায় এগারটি ঘণ্টা ট্রাক চলল। মাঝ পথে বার ছয়েক টায়ার পাঞ্চার ও হলো···

সেদিন ওরা এত শান্ত-শিষ্ট এত লক্ষ্মীটি হয়ে ছিল···যার উদাহরণ আমি খুঁজে পাইনি ওদের বিগত জীবনে।

নাইরোবি সহরের মধ্যে দিয়ে যখন গাড়ী যাচ্ছিল···ওরা অবাক চোখে দেখছিল পথের দু-ধারে অজস্র বড় বড় বাড়ী···ছুটে যাওয়া অজস্র হরেক রকমের গাড়ী, অবাক বিস্ময়ে শুনছিল অদ্ভুত শব্দ···এ যেন অদ্ভুত এক পরিবেশে এলো, কারা···অদ্ভুত সব গন্ধ···আবার যেন সব রূপ···এ তারা কোথায় এল, এ কোন পৃথিবী······

তারপর······

তারপর এক সময় জন্মভূমির সব ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে ওরা উড়ে গেল নীল আকাশে।

কিছুদিন পর চিড়িয়াখানা থেকে টেলিগ্রাম পেলাম···ওরা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে নির্বিঘ্নেই পদার্পণ করেছে।

কেটে গেল আরো তিন-তিনটে বছর। একদিন ওদের দেখতে গেলাম। কর্তৃপক্ষ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

আমরা আমাদের দুই শাহাজাদির কাছে গেলাম···আদর করে ওদের গায়ে চাপড় দিলাম। ওরা কোন প্রতিবাদ করল না···বন্ধুর মতই মেনে নিল···কিন্তু···কিন্তু আমাকে ওরা চিনতে পারল না···

চিনতে পারল না—!···না পারুক···ওরা ভালই আছে—সুখেই আছে·······

মনকে প্রবোধ দিলাম—ফেলে আসা স্মৃতিগুলো মনে রেখে ওরা ভালই করেছে। একদিন যারা মুক্ত আনন্দে সবুজ পৃথিবীতে ছুটে বেড়াত···,আজ ওই বদ্ধ খাঁচায় থেকে সেই সব সবুজ প্রাণোচ্ছল স্মৃতিগুলো নাইবা মনে রাখল। জয় অ্যাডামসনের একটি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে।



শিকার কাহিনী
শিকার উপন্যাস
মালয় জঙ্গলের
যুগল বাঘিনী
কর্ণেল অ্যালেন লক

কর্ণেল অ্যালেন লক—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবিস্তৃত মালয় অরণ্যে রবার গাছের অন্তরালে রক্তচোখো বাঘের নিবাস। গোধূলির আবছায়াতে সোনা কালো রঙের শোভা, চলনের সুঠাম ছন্দ আর দেহের মসৃণ রেখার মিলনে চলমান সৌন্দর্য্যের প্রতীক!

কর্ণেল অ্যালেন লকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রসূত রত্নখনির মধ্যে উজ্জ্বলতম হীরক কাহিনীটি সংগৃহীত হল বর্তমান সংকলনে।

॥ এক ॥

এ হ'ল দুই দুষ্টু বাঘিনীর গল্প।

যাদের বাবা আমার হাতে মারা যায়। কি বিরাট চেহারা ছিল বাঘটার, ওকে আমি শিকার করি এক নিঝুম অন্ধকার রাতে। এছাড়া বাঘিনীর মাও ছিল বদমেজাজী। ঘরের পোচা জানোয়ার না পেলে পেট ভরতো না তার।

আসলে বুনো শুয়োর, সম্বর বা ওই জাতীয় কোন ভাল প্রকৃতির জীবজন্তু কিজালের জঙ্গলে পাওয়া যেত না বড়ো একটা, ফলে ওদের কোন উপায়ও ছিলোনা থাবা না বাড়িয়ে গৃহপালিত পশুর দিকে।

একদিন অপেক্ষা করছি সন্ধ্যাবেলায়, কাছেই আছে ওদের মার শিকার করা মরা মানুষটা। আকাশ বিদীর্ণ করে বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়, প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়াও তার সঙ্গে বইছে। সমুদ্রের ফেনা চোখে মুখে লাগছে উড়ে এসে, ঝলকে ঝলকে। কান পাতাই দায়—বৃষ্টির শব্দ আর ঝড়ের দাপটে, আর সেতো দূরের কথা, বাঘিনীর পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া। আমি খেয়ালও করিনি, কখন শিকারের সামনে বাঘিনীটা এসে দাঁড়িয়েছে আমার এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে। ওকে যে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল গুলি করে মারার তা আমি তখন জানতুম না। যেমন জানতুম না আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হলে অভিজ্ঞ কোন বাঘ এমন বুক দুরু দুরু করা ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ গর্জন করে যাতে খুব সহজেই শিকারীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, আর সেও সেই সুযোগে গা ঢাকা দেয় চোখের পলকে।

আমি অপেক্ষা করছি বেলাভূমির ধারে যেখানে বসে, তার আশেপাশে সেই কোন গাছে, সামনে একটু পাতলা ঝোপ সামান্য, তার সাতফুট উঁচু একটা ন্যাড়া মাথা, নরম মাটিতে পোঁতা নড়বড়ে চারটে খোঁটার ওপর। পেছনের পাহাড়ে ওর হাঁকডাক শুনতে

পেয়েছিলুম বৃষ্টি শেষ হবার আগেই, এবার আঁতকে উঠলুম ওর পিলে চমকানো পরিপূর্ণ গলার গর্জনে। আজও বিস্ময় লাগে আমি যখন ভাবি, কেন যে তখন এমন একটা ভয়ঙ্কর গর্জনে আছড়ে পড়ল মাটিতে। শুধু একবারই নয় সেরকম গর্জন, আরও শুনলুম দুবার, পরপর। ঝোড়ো হাওয়ায় বৃষ্টিতে ভিজে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি একেই, তার ওপর আবার দাঁতে দাঁত না লেগে যায় এরকম ভয়ঙ্কর বীভৎস গর্জন শুনে খানিকক্ষন অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে করে ওর মাথা লক্ষ্য করে শিকারী টর্চের আলোয় জবাব দিতে পেরেছিলুম সেই ভয় মেশানো বিদ্ঘুটে গর্জনের।

যমজ দুবোন খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলো মা মারা যাবার পর এবং সম্ভবতঃ বাধ্য হয়েই শিশুদের শিকারের খোঁজ করার বয়স না হলেও সে কাজ নিজেদেরই করে নিতে হয়েছিলো। একই সঙ্গে তারা ঘোরাফেরা করত এই কিছুদিন পর্যন্ত ও, কিজারাং এও মাঝে মাঝে হানা দিতো। কিন্তু বাঘদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী আলাদা হয়ে যেতে হোল দুবোনকে এক সময়ে। কিজান পাহাড়ের দক্ষিণদিকে গেল একজন—পানেডায়, তার বিশাল সাম্রাজ্য হোল তেলোক কালোং আর তেলোক মেংগতুয়াং গ্রাম। এই পাহাড়ের অপর পারে রয়ে গেলো অন্যজন। অথচ আশ্চর্য, বহুবার আমি দেখেছি নির্জন সমুদ্রতীরে জলের পায়ের ছাপ, বুঝেছি, মেতে থেকেছে ওরা ওদের কিশোরী সুলভ চপলতার খেলায়।

বেশ ছিলো ওরা দুবোনে কিন্তু, কিছুই এসে যেতো না এমন একটা, দু-একটা গরু-ছাগল মারলে। কেননা, সাধারণতঃ এটাকে খোদার মর্জি হিসেবেই মালয়বাসীরা ধরে নিতো। কিন্তু ওদের লোভ দেখতে দেখতে বেড়ে গেলো, হানা দিতে লাগলো আশেপাশের গ্রামে গিয়ে প্রায়ই। তাই নয় শুধু, ওরা শুয়ে কালো মানুষকেও রীতিমত ভয় দেখাত। যখন তখন বড় একটা বনের পশু না পেয়ে উত্তর দিকের বাঘিনীটা মেরে ফেলত গ্রামের পশুগুলোকে। আর

যে বাঘিনীটা দক্ষিণদিকে ছিল সে সম্ভবতঃ হানা দিতো না গ্রামে, কারণ প্রচুর শিকার সে পেতো অরণ্য ঘেরা ঢালু পাহাড়েতে, কিন্তু কেন জানি তার সম্ভবতঃ নজর ছিল আসল মানুষের ওপর। আমার কানে তার একের পর এক বদমাইশির নাম ঘটনা পৌঁছতে লাগল।

তেলোক কালোং-এর বিস্তৃত রাস্তা ধরে একবার এক কাঠুরে ঘরে ফিরছিলো, তাকিয়ে দেখে পেছন ফিরে নিঃশব্দে একটা বাঘ একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান রেখে অনুসরণ করছে তাকে। সম্ভবতঃ সে তখন বাঘ-বাঘিনীর ডাকটা ভাল করে শোনার অবকাশ পায়নি কিনা। সে দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো বাঘটাও, সেই যে শুরু করলো চলতে, অনুসরণ করতে লাগল তাকে বাঘটাও। সে ভাবে ছুটতে পারে কি আর? সে যাত্রায় সে যা হোক করে বেঁচে গিয়ে ছিল প্রাণে। স্কুলের ছুটির পর প্রত্যেক দিন নাকি বড় রাস্তার ওপর একটা বিরাট বাঘ লুকিয়ে থাকে বলে জানিয়েছে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী বাঘটা নাকি উচ্চতায় পাঁচ ফুট আর লম্বায় ১৫ ফুট। গরু-বাছুর নিয়ে ঘরে ফিরে আসার সময় বিকেলবেলায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জন করে একটা বাঘ প্রায়ই ভয় দেখায় ছোটদেরকে।

কিমালের পেঞ্জলু একদিন, তার পরে কয়েকদিনের মধ্যেই, আমাকে শুনিয়ে দিলো এই সব কাহিনী।

আমি প্রথমে ভেবেছিলুম বাঘিনী বুঝি একটাই, যেটা মারছে গরু-ছাগল কিমালে, আর ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে পানে ডায় কিংবা তেলেক-কালোং-এর লোকজনদের। কিন্তু পায়ের ছাপ দেখে পরে বুঝেছিলুম।—না, এটা একটা অন্য। বনের পাশে, আলগা মাটিতে কিংবা পায়ের ছাপ দেখে বালির ওপরে খুব সহজ বাঘের গতিবিধি অনুমান করা যেমন, তেমন বিচার করে বলা খুব কঠিন কোনটা পুরোনো বা কোনটা নতুন, বৃষ্টি বা শিশির ধোয়া ভিজে পায়ের ছাপ

দেখে। শুধু পায়ের ছাপ ভালোকরে পরীক্ষা করে দেখে অনুমান করলুম এটাই যে, ওরা ভিন্ন দুটো বাঘিনী, যমজ দুই বোন।

বাঘে একটা ছাগল নিয়ে গিয়েছিল আগেরদিন রাত প্রায় দশটার সময়। যার ছাগল তাকে ভোরবেলায় এসে খবর দিয়ে গেলো। খুব একটা বড় ছিল না নাকি ছাগলটা তাই ওরা খুঁজে পায়নি শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন। সম্ভবতঃ সমস্ত ছাগলটাকেই রাতারাতিই শেষ করে ফেলেছিল খেয়ে। কেননা, মৃত ছাগলটিকে ওরা খুঁজে পায় নি কোথাও। তাই বিশ্বাস আমারও। কিন্তু ঠিক আমার এটাও যে, সাধারণতঃ বাঘের পেট পরিপূর্ণ হয়ে যাবার পর খুব ভারি আর কুঁড়ে হয়ে যায়, তখন কোথাও বেশীদূর না গিয়ে দিনের উত্তাপটুকু এড়াতে চাওয়ায় জন্য কাছে পিঠের বা নিকটবর্ত্তী স্থানের নিখুঁত আশ্রয়স্থানে শুয়ে থাকে। ফলে ঠিকমত একটু বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজলে, শিকারকে খুজে না পেলেও শিকারের শিকারীকে খুঁজে পাওয়া কিছুই একটা কঠিন কাজ নয়।

আমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম খবরটা পাওয়া মাত্রই। দক্ষিণে কিজাল পাহাড়ের কোল পর্যন্ত পায়ের ছাপের সঙ্গে রক্তের দাগ আর শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার খুব আবছা চিহ্ন ধরে ধরে পৌছলাম, আর এগিয়ে চললুম পানেডারের দিকে গাড়িটাকে বড় রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রেখে। আমার নিজেরও পাঞ্চোরে খানিকটা কাজ ছিল—চেষ্টা চলছে সেখানে কিছুটা জমিকে আবাদী করা সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী। তারপর তালুকদারের কাজে বেরিয়ে পড়লাম। আবার খানিকক্ষণ সেখানে তদারকি করে। দুই মাইল প্রায় আসার পর দেখলুম বালির উপর পায়ের ছাপ, সে ছাপ একটা বাঘিনীর, ঘুরে চলে গেছে পাঞ্চোরের দিক থেকে এসে তেলোক কালোং-এর দিকে। আমি বিস্ময়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাহলে কি দুটো বাঘিনী একই রাতে একই অঞ্চলে শিকার করেছে কিজালে হানা দিয়ে, তাদের মাপ এবং বয়েস আশ্চর্য রকমের এক।

কিন্তু তা সম্ভব কেমন করে হয়? অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কিজালের পেঞ্চলুর কাছ থেকে জানতে পারলুম, যে একটা বাঘিনীকে সে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে কয়েক বছর আগে কিজালের জঙ্গলে, সঙ্গে তার দুটো বাচ্চাও ছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পা মাৎ আর আমি একটা মোটামুটি-ভাবে নজর রেখেছিলাম বিভিন্ন অঞ্চলের বাঘের ওপর। এবং সমীক্ষা চালাচ্ছিলাম একের পর এক তাদের ওপর, কিন্তু আমি কখনও শুনি নি এমন ছলনাময়ী যমজ দুই বোনের কথা। 'উত্তরী যমজ' এই নাম আমরা দিয়েছিলুম ওদের। টর্চ আর রাইফেল নিয়ে দীর্ঘদিন ওদের খোঁজে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি আমরা। যখন পাহারা দিচ্ছি আমরা নারকেল গাছে ঘেরা সুন্দর ছায়াৎ কিজালে, তখন খবর পাওয়া গেল, তেলোক কালোং-র উত্তর যমজ হানা দিয়েছে। যখন নজর রেখেছি তেলোক কালোং-এর ওপর, খবর পেলুম সেই কাঠুরেকে ভয় দেখিয়েছে সেই বড় বড় সড়কের ওপর, যেটা পাঙ্গোরের সমুদ্র আর জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চলে গেছে।

একদিন রাত্তিরে পাহাড়ের ঠিক নীচে দায়াৎ কিজালের কাছে উত্তরী যমজ যৌথভাবে মারলো একটা বিরাট পোষা ছাগল। সোজা খোঁয়াড় ভেঙে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঢুকলো। তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে বাড়ির কর্তা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুনেই, আলো ফেলতেই হলদে দুজোড়া ভাঁটার মতো চোখকে একবার শুধু তার দিকে ঘুরে তাকাতে দেখলেন, তারপর চলে গেল অনায়াসে অতবড়ো ছাগলটাকে নিয়ে টানতে টানতে। তাক বুঝে পরের দিন রাত্রে বেছে নিলুম এমন একটা জায়গা, যেখান থেকে আমি খুব সহজেই মুখোমুখি হতে পারবো ওদের, যদি ওরা আবার ছাগল নিতে আসে সেই খোঁয়ার থেকে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা. আমার চোখ দুটোই কেমন ব্যথা হয়ে গেলো তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকারের মধ্যে। হানা দেওয়া শুধু কেন সেই গ্রামের আশে-

পাশে দিন পনেরোর মধ্যে আমি টিকিই খুঁজে পেলুম না ওদের। বললো স্থানীয় মালিকরা, ওরা নাকি টের পেয়ে গেছে বা আমিই ওদের পেছনে লেগেছি।

তুজনেই, আমি আর পা মাৎ খুব হাসলাম কথাটা শুনে। তবু হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারলুম না। কিজালের আশ-পাশের গ্রামগুলোতে হত্যার ভয় দেখিয়ে আর প্রচুর গৃহপালিত পশুদের মেরে রীতিমত তখন ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে ওরা।

দেখতে দেখতে এসে গেলো জুন মাস আবার। জেলেরা এখনই 'জুয়ালা' বা নদীমোহনায় মাক ওয়াং নামে সপ্তাহব্যাপী একরকমের উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হোল প্রাচীন প্রথানুযায়ী সমুদ্রদেবীর আরাধনা, অভিনয় ও নৌকা বাইচ। এসময়ে তুহাতে দেদার পয়সা খরচ করে ওরা। ঠিক এমনি পানতাই ফিজালের জেলেরাও আয়োজন করেছিল একটা উৎসবের, সেই উৎসবে নিমন্ত্রণ ছিল আমারও। সেদিন ৭ই জুন, ১৯৫০ সাল। আমি আর পামাৎ মায়াকন তাদের উৎসব দেখে পানতাই ফিজলি থেকে প্রায় গভীর রাত্রিতে গাড়ি করে ফিরছিলুম। সবে যখন ফিজালের ঢালু পাহাড়ি পথ বেয়ে নামছি, পরমুহূর্তেই দেখলুম একটা বাঘিনীকে ঘুরে দাঁড়াতে গাড়ির আলোয় আলোকিত সামনের ঢালু পথ থেকে, তারপরেই পাশের খাদে সে চকিতে একটা লাফ দিলো কেমনভাবে। একটা চোখের পলকে ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা।

সৌভাগ্যবশতঃ যখন কোথাও আমি রাত্তিরে বেরোতুম, আমার সঙ্গে থাকত টর্চওয়ালা, ৩৭৫ ম্যানশিকার গুলিভরা রাইফেলটা। আর একটু এগিয়ে গিয়ে পা মাৎ আমার ইঙ্গিতে সামনের বাঁকে ঝট করে ঘুরিয়ে গাড়ীটাকে দিলো তার ইঞ্জিনটাকে বন্ধ করে, আর নেমে পড়লুম আমি সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাতে কি হয়, ছুটতে শুরু করেছে বাঘিনীটা তখন অবিশ্বাস্য গতিতে, তখন তাকে মনে হচ্ছে,

গাড়ীর আলোর সীমানার বাইরে আবছা ছায়ার মতো। ওটাকে লক্ষ্য স্থির করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে গুলি করে, অসম্ভব ওটাকে মারা অবাস্তব। তবু চট করে টর্চ জ্বেলে রাইফেলটা তুলে চালালুম গুলি—কপালে যা থাকে।

মনে হোল একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল আমার রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে। তবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না নিজের কানকে, কেননা, বাঘিনীটাকে অনাহত অবস্থায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম নীচে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। বাঘিনীটার পায়ে গুলি লেগেছে বলেই পামাৎ-এর ধারণা। কিন্তু আমি সুনিশ্চিত নই। তবুও যদি সত্যি বলেই ধরে নিই পামৎ-এর কথা, অর্থাৎ যদি আহত হয়ে থাকে বাঘিনীটা, তাহলে আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য হোল তাকে খুঁজে বার করা। কিন্তু অসম্ভব। দূর থেকে, লোকজন নেই, অস্ত্রও নেই পামাৎ-এর কাছে, তাছাড়া এমন গভীর খাদকে তার এমন ঘন কিকের জঙ্গলটা যে কোনমতেও সম্ভব নয় আমার একার পক্ষে বাঘিনীটাকে খুঁজে বার করা। আসালে আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তেই আসতে পারি না বাঘিনীটা মারতে। তবে দূর থেকে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম বাঘিনীটার চাপা অথচ রোষমিশ্রিত গর্জন, ফিরে আসছিলাম যখন।

শুক্রবার ছিল পরের দিনটা, সে দিনটাকে ত্রেনগান্নুতে অন্যান্য রাজ্যের মতোই রবিবার বলে ধরা হত। আগে থেকেই একটা ব্যবস্থা পাকা হয়েছিল আমার একটা শিক্ষক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে, এড়ানো গেল না কোন মতেই। তবে বিদায় নেবার ব্যবস্থা করেছিলুম তাড়াতাড়ি করে, কেননা কিজাল পাহাড়ের ধারে গভীর সেই গিরিখাদে আমার মন পড়েছিল সত্যিসত্যিই। কাজ মিটিয়ে দিয়ে এখানকার বিনজাই গ্রামের পেখলু চে আবদুল্লা বিন ইসাককেও পা মাৎ-এর সঙ্গে তুলেছিলুম গাড়ীতে। মালয়ে আমি এখন ঝানুপথ প্রদর্শক ইসাকের মতো আর একজনকেও পাইনি

খুঁজে। তাই নয় শুধু, ও দুঃসাহসীও রীতিমত। কিজাল পাহাড়ের দিকে তিনজনে মিলে রওনা হলুম।

জায়গাটিকে এখন দিনের বেলায় সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখাচ্ছে। বাঘিনীটা কাল সেখান থেকে একটা পেল্লাই বাঘ পেয়েছিলো, গাড়ি থামালুম সেই জায়গাতে এসে। খুব গভীর ছিল সত্যিই খাদটা, বৃষ্টিহলে এখান দিয়ে কলকল খলখল করে জল নামে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। একফালি মরা জমি সবুজ ঘাসে ছাওয়া এই খাদটার পর তারপরই ধাপে ধাপে শুরু হয়ে গেছে গভীর জঙ্গল। ওপর থেকে বাঘিনীটা কে গুলি করার সুযোগ পেয়েছিলুম আমি, খাদ পেরিয়ে অতিক্রম করে সময়ে এই সবুজ ভূমিটুকু। এখনও পর্যন্ত জানি না কিন্তু সত্যিই কি ঘটেছে ওটার ভাগ্যে। আমি গভীর ঘাসের মধ্যে পামাং আর ইসাককে নিয়ে নেমে পড়লুম।

শুধু গভীরই নয় খাদটা, অসম্ভব রকমের পোড়াল শ্যাওলা পড়া নুড়ি পাথর গুলো। সবুজ জমিতে এসে পডলুম খাদটাকে অত্যন্ত সর্তকভাবে পার হয়ে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারলুম না সেখানে, শুধু ঘাসের ওপর দুটো ছাপ পষ্ট পায়ের ছাপ আবিষ্কার করতে পারলুম। ঢুকে পড়লুম জঙ্গলের মধ্যে একটা মোটামুটি আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। নিম্নে থামেনি আমার অনুমান, নিচের মাটিতে, পাতায় গাছে বেশ খানিকটা রক্তের দাগ আবিষ্কার করলুম। তাহলে কি সত্যিই আহত হয়েছিলো বাঘিনীটা? কিন্তু শিকারীর সৌভাগ্যে তো এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। অবিশ্বাস্য হলেও, হ্যাঁ সত্যিই আমার জীবনে তা ঘটেছিল। কেননা, অচিরেই আমরা মৃত বাঘিনী টাকে পেয়েছিলুম আবিষ্কার করতে। উঁচু একটা টিলা থেকে খানিকটা গাড়িতে খানিকটা বড়াখিয়ে নিচে পড়ে পড়েছিলো, পড়ে থাকা একটা গাছের গুড়িয়ে সঙ্গে আটকে গিয়েছিলো মাথাটা। একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় অভিব্যক্তি তার মুখে।

লোকজনদের তেলোক কালোং থেকে ডেকে নিয়ে আমার জন্য

পা মাংকে পাঠালুম। বাঘিনীর পা বাঁধা আর রাস্তায় গিয়ে উঠবো যে পথ দিয়ে ঝোপঝাড়, লতাপাতা সে পথের পরিষ্কার করাব কাজে আমি তার ইশারায় রইলুম। ছজন জেলে আর আমরা কজন মিলে ওপরের রাস্তা পর্যন্ত মৃত বাঘিনীটাকে বয়ে আনতে যে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলুম, তা আমার বেশ মনে আছে, বিশেষ করে আমাদের কালঘাম ছুটে গিযেছিলো খাদটা পেরোতেই। যা হোক, তাকে গাড়ির ওপর কোন রকমে চড়ালুম। কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি ঐ গাড়ি থেকে মাত্র কালই একবার মাত্র চোখের পলকে তাকে দেখেছিলুম, আজ সেই গাড়ীতে করেই বযে নিয়ে যেতে পারবো তাকে মৃত অবস্থায়।

মেপেছিলুম পবে, সাত ফুট চাব ইঞ্চি। জালটা ফুঁড়ে চলে গিয়েছিল পিছনের লেজের প্রায় সংযোগ স্থান থেকে সমস্ত দেহ বরাবর। এখন আমবা বুঝতে পারছি, যে গর্জন শুনেছিলুম ফিরে আসার সময়, তার অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রনার আর্তনাদ ছিল সেটা। একথা সত্যি কিন্তু, সে বেশ কিছুটা ছুটে গিযেছিলো, গুলিটা বেঁধা সত্ত্বেও, তারপর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো ভারসাম্য হারিয়ে। সেটা সম্ভব হবে তবেই, অসম্ভব গায়ের শক্তি কি মনের জোর থাকলে। কেন জানি না আমার বারবার মনে হয়েছে আমি চোরের মতো অত্যন্ত হীনপন্থায় গুলি করে খতম করেছি উত্তরী যমজের একটাকে। ভেবেছিলুম প্রথমে, এটা বোধ হয় সেই বাঘিনী যেটা ভয় দেখিয়ে বেড়াত তেলোক কালাং এর লোকজনদের। কিন্তু মাস খানেকের পরবর্তী নানা ঘটনায় প্রমাণ পেয়েছি, বাঘিনীটা দায়াৎ ফিজালের, সম্ভবতঃ সেদিন রাতে যোনের সঙ্গে দেখা করে নিজের এলাকায় ফিরে আসছিলো। এর পরে বাঘের উৎপাত দায়াৎ ফিজালে ঘটেনি বেশ কিছুদিন ধরে, পক্ষান্তরে কিন্তু আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগলো তেলোক কালাং এর নানান ঘটনা।

দফতরের নানান ঝামেলায় জড়িয়ে জুলাই-আগষ্ট এই দুটো

মাস বিশেষ মন দিতে পারিনি শিকারের কাজে। অথচ শুনেছি ব্যাঙ্গালে, ফিক্সাল থেকে দূরে ওকে নামাসের অন্য পারে বেশ বেড়েই চলেছে বাঘের উপদ্রব। হাতের কাজ একটু কমে যেতে আগষ্টের শেষের দিকে একজোড়া বাঘ মারলুম পাঁচ দিনের ব্যবধানে। একটা বাঘিনীকে ১১শে আগষ্ট প্রথম মারলুম, যখন তারই আগের দিন রাতে মারা একটা বুনো শুয়োরকে নিয়ে খাচ্ছে বেশ আরাম করে বসে বসে। তার পর ২৬শে আগষ্ট, একটা ছোট ছাগলকে বেঁধে বেশ বড় মত আকারের একটা বাঘকে সোড চালিয়ে মারলুম।

অবশ্য উত্তরী যমজের অন্যটার ওপর এর ফাঁকে ফাঁকেই কড়া নজর রেখেছিলুম। পাঞ্জোর, তেলোক কালাং, আর সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের মধ্যে রীতিমত তখন ও ওর রাজত্ব বিস্তার করেছে। দীর্ঘ-দিন ওর পায়ের ছাপ অনুমান করে ঘুরেছি আমি, মনে মনে এঁকে ফেলেছি একটা ছক-ওর গতিবিধির। কিন্তু সুবিধা করতে পারি নি বিশেষ কিছুই। ওটা আসলে অত্যন্ত চালাক। বহুদিন নজর রেখেছি একটা সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে পাহাড়ী ছোট টিলার ওপর বসে ওর পথের ওপর। হিসেব অনুযায়ী চলছিল সমস্ত পরিকল্পনাই, কেবল একটি ছাড়া। ও যখন সমুদ্র উপকূল ধরে আসে পাঞ্জোরের দিকে, সামান্য খানিকটা ঘাসে ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর পেরিয়েই সাধারণতঃ প্রতিবারেই ও তারই পাঞ্জোরের পথ ধরে। একদিন মোড়ের মাথায় আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি একটা ছোট টিলার ওপর বসে বসে। গাড়িটাকে আগেই হিসেব মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম প্রায় একশ গজ দক্ষিণে, যাতে পাঞ্জোরের সড়ক থেকে ওর নজরে না পড়ে চট করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, ও সেদিন পাঞ্জোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো উন্মুক্ত প্রান্তরটুকু না পেরিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে, খুব সহজেই গাড়িটা ওর পড়লো নজরের মধ্যে। গাড়িতে অপেক্ষা করছিলো পামাৎ আর একজন লোক, ওরা চকিতে ঘুরে বাঘিনীটাকে এক লাফে উধাও হয়ে যেতে দেখলো। উপকূলের গভীর জঙ্গলের

মধ্যে। ওরা কেবল টর্চের আলোয় একবার মাত্র তীব্রভাবে জ্বলে উঠতে দেখেছিলেন বাঘীনীটার চোখ তুটোকে। বলতে চেয়েছিলো —যেন চোরের মতো জঘন্য পন্থায় আমার বোনকে গুলি করে পেছন দিক থেকে মারতে পেরেছিল বলে মারতে পারবে যে আমাকেও, সস্তা নয় অত!

২৮ শে সেপ্টেম্বরের বিকেলবেলা, একটা মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলুম জনগানে। যেন, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলো, আর জেনের পাশে পেছনের আসনে বসে আছেন চৈমুদা বিণ আবতুল রহমান, শিক্ষিকাদের দলনেত্রী। বহুবার জেদ ধরেছিলেন যেন সে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য তাকে বাঘ শিকারের সময়, কিন্তু কান দিই নি আমি কোন বারেই। এটাই স্বাভাবিক যে একথা অগ্রাহ্য করা। রাত হয়ে গেল ফিরতে জনগান থেকে। প্রায় তখন সাড়ে ন'টা। রাস্তার ঠিক মাঝখানে বাঘিনীটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম, আগের বারে গাড়িটাকে পাঙ্গোর সড়কে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম ঠিক সেইখানে। গাড়িটাকে তুর থেকে আসতে দেখে সম্ভবতঃ ও আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলো ব্যাপারটা, অলসভঙ্গিতে রাস্তাটাকে তাড়াতাড়িভাবে পেরিয়ে সড়কের নীচে নেমে গেল হেলতে তুলতে তুলতে। কোন কথা না বলে গাড়িটার আলো নিভিয়ে পামাৎ দাঁড় করিয়ে দিলে, নেমে পড়লুম আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলুম রাস্তার নিচেটা রাইফেলের সঙ্গে বাঁধা টর্চ জ্বেলে। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যেন আমাকে স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। পি ডবলিউ ডির লোকেরা একটা বিরাট গর্ত করেছিলো মাটি খুঁড়ে রাস্তা সারানোর জন্য, যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক তার নীচেই সেটা। গর্তটা পরে মেপে দেখেছিলুম পাঁচ ফুট গভীর ছিল সেটা। বলতে পারেন সমপূর্ণ অযাচিত, অবিশ্বাস্য যে বাঘিনীটা সেই গর্তের মধ্যে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় গুটিশুটি হয়ে পড়ে আছে। এমন আচরণ কেতা তুরন্ত

কোন বাঘ বা বাঘিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। পরে আমি বলাবলি করতে শুনেছিলুম, আমার এই কাহিনীটা নাকি সম্পূর্ণভাবে বানানো ও অতিরঞ্জিত। অবশ্য কেউ আমার কানে তোলে নি একথা আমার বাড়ী বয়ে এসে।

আমিও বেশ প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম। অর্ধবৃত্তাকারে কানের পাশ দিয়ে মুখের ওপর ফেলেছিলুম আলোটা বার দুয়েক। আর প্রথম তখনই তীব্র আলোর দুটো জ্যোতি চোখে পড়েছিল। আমার পায়ের নীচেই ঠিক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলজ্বল করছে। বাঘিনীটার মুখের ওপর আলো ফেলতেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বুক কাঁপানো ভয়ঙ্কর গুরু গর্জন করে সেখানে আমায়। খুব কাছ থেকে এই দৃশ্যটা দেখা বা শোনার সৌভাগ্য আমার স্ত্রীর হলেও প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন যে চৈ মুদা বিন আবদুল রহমান। তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা আমার, কোন অবকাশই ছিলো না ওদের দিকে তাকাবার। সোজা যদি বাঘিনীটা লাফিয়ে ওঠে, তার আওতার মধ্যে পাবে আমাকে প্রথমেই। অথচ পেছনে যে মার খাবো দুজন, কোন উপায় নেই তারও, ঠিক পিছনেই আমার দাঁড় করানো রয়েছে গাড়িটা। আমার তখন কোন কিছু পামাৎকে দেখানোর মতন মানসিকতাও ছিল না। মুহূর্তের মধ্যেই তা অনুভব করতে পারলুম সুস্পষ্ট। এটুকুই এর—যা কিছু করতে হবে রীতিমত বুদ্ধি খাটিয়ে খুব ধীর স্থির মস্তিষ্কে। ইচ্ছে করলে আমি বাঘিনীটাকে সেই অবস্থাতেই তখনই শেষ করে ফেলতুম দুটো নল থেকে গুলি চালিয়ে। কিন্তু সে তাতে কোন মতেই ছেড়ে কথা কইত না আমাকে। সে পেছপাও হোত না মেয়েদের আক্রমণ করতে যদি গুলি করার একটু সামান্য লক্ষ চ্যুতি ঘটে। কেননা, আমি জানি যে, পৃথিবীতে হিংস্র আর কোন প্রাণী নেই আহত শার্দূলের মতো।

আমার মাথায় খেলে গেল চকিতে একটা বুদ্ধি। রাইফেলধরা অবস্থাতেই আমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাত দুটো ওপরে তুলে ভয়ংকর

ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলুম অস্বাভাবিক রকমে। এর আগে বাঘিনীটা কল্পনাও করতে পারে নি কোনদিন এরকম উৎকট আওয়াজ আসবে কোন মানুষের কাছ থেকে। আমিও ঠিক যেমন ভাবতেই পারি নি যে কোন সতর্ক বাঘিনীর উপর এই বীভৎস বিটকেল চীৎকার সৃষ্টি করতে পারে কোন প্রতিক্রিয়া। বাঘিনীটা অতর্কিতে সরে গেলো একপাশে। এবং শুরু করলো ছুটতে এক পলকের মধ্যে ঐ এক লাফে গর্ত থেকে বেরিয়েই। পামাৎ আগে থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জ্বালিয়ে রেখে দিয়েছিলো গাড়ির সামনের দিকের দুটো আলোই। আমি আবার গুলি করলাম পিছন থেকে দ্রুত ধাবান্ত বাঘিনীটাকে সেই আলোতেই। অবশ্য রাস্তা থেকে কুড়িগজেরও কম এবারকার দূরত্ব। স্পষ্ট দেখলুম গাড়ির আলোয় যে, বাঘিনীটার গায়ে গুলি লাগাতেই সে একবার ঘুরে গেলো চকিতে একবার ডিগবাজি খেয়ে। অর্থাৎ, চার পা শূন্যে তুলে মাটিতে পড়ে মুখটা আমার দিকে করে ছুঁড়তে লাগলো ভীষণ ভাবে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলুম খানিকটা। কিন্তু চোখের পলকে উধাও হয়ে গেলো বাঘিনীটা, রাইফেল তুলে আমি প্রস্তুত হবার আগেই। চাপ চাপ রক্তের দাগ সেখানে দেখলুম, যেখানে বাঘটা পড়েছিলো। কিন্তু কি করে ও ওই অবস্থায় জঙ্গলে ঘুরে গিয়ে প্রবেশ করতো তা কিছুতেই ঢুকলো না আমার মাথায়।

দরজা খুলে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে পামাৎ। বাঘিনীটাকে সেই রাত্তিরেই খুঁজতে বেরোনো উচিত কি না তা আমাদের আলোচনা করতে দেখে আঁতকে উঠল যেন। ওযে তখনও দুঃস্বপ্নের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তা বুঝতে পারলুম স্পষ্টই। আমার পরনে এতো রাত্তিরে জঙ্গলে ঢোকার মত উপযুক্ত পোষাকও ছিল না। সঙ্গে গাড়িতে তার ওপর ভদ্রমহিলা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছেন —সাত পাঁচ এই সব ভেবে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম। স্থগিত রেখে তখনকার মতো আহত বাঘিনীটাকে খোঁজার কাজকে।

পরের দিন সকালেই, আহত বাঘিনীটার খোঁজে একজন পেশ্কলু, আমি আর পামাৎ এবং আবহুল্লা বেরিয়ে পড়লুম। আমরা পাঞ্জোর সড়কের ওপর রেখে গাড়িটাকে ধরলুম জঙ্গলের পথ। বাঘিনীটা যেখানে গতকাল রাত্তিরে উল্টে পড়েছিল ডিগবাজি খেয়ে এখন চাপচাপ কালচে শুকনো রক্ত সেখানে পড়ে থাকতে দেখলুম। আমরা এগিয়ে চললুম, সেই রক্তের দাগ, ভাঙ্গা ঝোপঝাড় আর ছেড়া লতাপাতা অনুসরণ করে করে। অবশেষে পৌঁছলুম এসে বিস্তীর্ণ একটা জলাভূমির সামনে, সেটা ছিল অল্পসল্প, আগাছায় ঢাকা, পাহাড়ের ঢালুর নীচে। খুব সামান্যই জল! আমরা তিনজনেই নেমে পড়লুম জলের মধ্যে হাঁটুর উপর কাপড় গুটিয়ে। কেননা, অন্যপায়ে পৌঁছবার এছাড়া কোনই উপায় ছিল না। তাছাড়া, এই জলার মধ্যে বাঘিনীটাও নেমে ছিলো। কিন্তু বাঘিনীটা কোথা দিয়ে অন্যপায়ে উঠলে, খুঁজে সেইটে বার করতেই হোল মুশকিল সব চেয়ে। রীতিমত তিনদিকে তিনজন আমরা অভিযান করে খুঁজলুম তন্নতন্ন করে, কিন্তু কোন বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম না কোথাও। আর সম্ভবও নয় পাওয়া। কেননা, শক্ত পাথর উঠে গেছে ধীরে ধীরে অন্য গায়ে জলের কিনারা থেকেই। খুঁজলুম অসম্ভব জেনেও, ঝোপেঝাড়ে খুঁজলুম, গাছের—নীচু-পাতায়-যদি কোথাও ছিটেফোঁটাও লেগে থাকে রক্তের দাগ। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সব কিছু হওয়ায় ঠিক যেন ভোজবাজির মতোই মিলিয়ে গেছে নিঃশেষে।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এলো এদিকে, রোদের তেজও বাড়তে লাগলো। তখন খিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। অথচ বাঘিনীটা গুলি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছিলো যেভাবে, তাতে রীতিমত আহত না হয়ে যায় না। কিন্তু কিছু বলা অসম্ভব আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। যদি নিতান্তই মারা না গিয়ে থাকে বাঘিনীটা, তাহলে ওকে ফেলে রাখা ঠিক নয় এমন অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, তেমনি

আবার কোনমতে সমীচীন হবে না ওকে এই রকম আহত হিংস্র অবস্থায় ছেড়ে রাখা আশেপাশের গ্রামগুলোর কথা ভেবে। তাই শলাপরামর্শ করে তিনজনের মধ্যে ঠিক করা হোল, আপাততঃ আমরা ঘরে ফিরে যাবো অনুসন্ধানের পালা সাঙ্গ করে, তারপর আবার গ্রাম থেকে বিকেলের আগেই কিছু লোকজন জুটিয়ে এসে সুরু করবো ঝোপ পেটানো। পা মাং আর আবদুল্লার ওপর ভার রইলো লোকজন জোটানোর।

চাট্টি নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়লুম আবার। দেখলুম যথাযথ-ভাবে তাদের দায়িত্বভার পালন করেছে পামাং আর আবদুল্লা। প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন মালয় জোয়ানকে জুটিয়ে এনেছে মাঝিপাড়া থেকে। স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সবাই, সটগানও কয়েক জনের হাতে দেখলুম রয়েছে। বেছে বেছে এদের মধ্য থেকেই একটা শক্তিশালী বাহিনী পরে গড়ে তুলেছিলুম, আমার বদলি হয়ে যাবার পর নিজেদের সম্পত্তি বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যারা নিজেদেরই কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব ভার তুলে নিয়েছিলো। সে যা হোক, ঘুরঘুর করছিল যে ফন্দীটা আমার মাথার মধ্যে দুপুরে ফিরে আসার সময়, সেই পরিকল্পনাটাকে এবার বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য খুলে বললুম ওদের কাছে। তার আগের পথে বাঘিনীটা জলায় নামার পর যখন আবার ফিরে আসে নি, তখন খুবই স্পষ্ট এটা যে সে ওপরে উঠেছে জলার অন্যপারের কোন না কোন দিক থেকে। সুতরাং যদি আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নামি বিস্তীর্ণ জলাটা ঘুরে ঘুরে ঝোপ পেটাতে পেটাতে, সবচেয়ে সহজ হবে সেটাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, যদি চেষ্টা করে আহত বাঘিনীটা পালাবার ভয় পেয়ে গিয়ে,—তাহলে ওকে পাঞ্জোরের দিকে ফিরে যেতে হবে হয় জলা পেরিয়ে নয়তো নামতে হবে সমুদ্রবেলার দিকে জঙ্গল ছেড়ে। তখন খুব একটা কঠিন হবে না ওর পায়ের ছাপ ধরে ওর অনুসন্ধান করা। আর কিছু না হোক, ব্যাপারটা অন্ততঃ বোঝা যাবে স্পষ্টভাবে। সমস্ত লোক জনদের সার বেঁধে আমি দাঁড়

করিয়ে দিলুম তিনটে দলে ভাগ করে। প্রায় তিন গজ করে ব্যবধান রইল পরস্পরের মধ্যে। আমার, পামাৎ-আর আবদুল্লার ওপর ভার পড়ল এই তিনটে দলের পরিচালনার দায়িত্বভার। কেউ কোন বিপদে পড়লে ঠিক হলো, সংকেত করবে সাহায্যের জন্য।

যখন শুরু হোল ঝোপ পেটানো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

এগুতে শুরু করে এখান থেকে সমুদ্রের দিকে পৌছবে পা-মাৎ এর দলটা, ঠিক মাঝখানে পৌঁছবে আমার দলটা, অন্যপারে সেই বিস্তীর্ণ জলাভূমিটা। আর আবদুল্লার দলটা প্রধান সড়কের দিকে পৌঁছবে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম প্রথম দিকে উল্লাসিত চীৎকার সবার কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ, কিন্তু কিছুক্ষন বাদে তা মিলিয়ে গেলো সম্পূর্ণভাবে। আমরা তখন দেখতে পাচ্ছি স্পষ্টভাবে, যে যার নিজের বিচ্ছিন্ন দলটাকে, শুনতে পাচ্ছি অবশ্য তাদের কথাবার্তা। পুরো দমে ঝোপ পেটানো চলেছে। ঘড়ির দিকে বারবার তাকাচ্ছি, আর চেষ্টা করছি শুনতে কান খাড়া করে, কোন সংকেতসূচক শব্দ কোথাও শোনা যায় কিনা।

কেটে গেলো কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু খুঁজে পেলুম না কোন চিহ্নও তার অস্তিত্বের, বাঘিনী তো দূরের কথা। যখন এসে গেছি প্রায় শেষ সীমায় পামাৎ আর আমার দুটো দলই, পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো সংকেত সূচক বাঁশি বেজে উঠল তৃতীয় দলটা থেকে হঠাৎ। বাঁশির শব্দ লক্ষ্য করে যে যার দল ভেঙ্গে ছুটলুম পড়ি কি মরি করে পাহাড়ের দিকে।

ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি, সামান্য একটু ফাঁকা বড় বড় ঘাসে-ছাওয়া জায়গায়। বুঝতে পারলুম স্পষ্টভাবেই দোমড়ানো মোচড়ানো ঘাসের চিহ্ন দেখে যে কোন বাঘ বা বাঘিনী এখানে শুয়েছিলো অনেকক্ষণ ধরে, নয়তো আছড়ে পড়েছিলো সজোরে। আমার অনুমান যে মিথ্যে নয় তা বুঝতে পারলুম গন্ধ শুঁকে, ঘাসের ওপর নাক নামিয়ে এনে। আহত অবস্থায় গতরাত্তিরে

এখানেই ছিল ও। অর্থাৎ, এখনও তাহলে বেঁচে রয়েছে বাঘিনীটা। চকিতে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে আমি নিষেধ করলুম চীৎকার করে সমস্ত লোকজনদের ছুটতে। এবং নির্দেশ দিলুম, সম্ভব অনুযায়ী সার বেঁধে দাঁড়াতে, যাতে যৌথভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চালাতে পারি অনুসন্ধানের কাজ। তার আগেই কিন্তু ছুটে বেরিয়ে গেলো বাতাসের বুক চিরে একটা গুলির শব্দ। এত কাছ থেকে আচম্‌কা গুলির শব্দ শুনে প্রায় চমকে উঠলাম আমি।

যখন এসে পৌঁছলুম ঘটনার কেন্দ্রে, রীতিমত তখন ভীড় জমে গেছে চারদিকে। আর একটা বাঘিনী রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে সেই রক্তের মধ্যে। আর মৃত বাঘিনীটার সামনে সটগান হাতে একজন তরুন, আবদুল্লার দলের আলি যার নাম, সে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য একটু ভিড় ঠেলে কয়েকটা ছবি পরপর তুললুম আমি সেই অবস্থাতেই। দেখতে পেলুম স্পষ্টভাবে গুলির চিহ্নটাকে, যেটা আমি ছুঁড়েছিলুম গত রাত্রে। সামান্য একটু নীচে থেকে পেছনের দাবনার ভেতরে প্রবেশ করে তৃতীয় কশেরুকায় সোজা গিয়ে গুলিটা আঘাত করেছে। যাক, এতক্ষণে হতভাগাটা মুক্তি পেলো তার দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে।

আমি অবাক না হয়ে পরিনি, এ প্রসঙ্গে একটা কথা ভেবে, আমরা জলা পেরিয়ে সকালবেলায় এই জায়গাটার চারপাশ খুঁজেছি অনেকবার করে। জলার প্রান্ত থেকে তিনশো গজ দূরেও নয় জায়গাটা, অথচ গন্ধ পর্যন্ত পাইনি বাঘের গায়ের, পায়ের ছাপ বা অন্য কোন চিহ্ন তো দূরের কথা। সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিলো আহত বাঘিনীটা যে ওকে খোঁজাখুঁজি করছি আমরা, কোনরকম শব্দই না করে তাই চুপচাপ পড়েছিলো সে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে, অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা বুকে চেপেও।

কিন্তু এমনটা সচরাচর ঘটে না স্বাভাবিক ভাবে। পা মাং আর আবদুল্লাও সম্পূর্ণ একমত আমার সঙ্গে—এই বাঘিনীটা উত্তরী

যমজেরই অন্যটা। কিজাল পাহাড়ে কয়েকদিন আগে যে বাঘিনীটাকে গুলি করে মেরেছিলুম তার থেকে এক ইঞ্চি মাত্র ছোট এটা,—সাত ফুট তিন ইঞ্চি। এছাড়া এটা ঠিক তার বোনেরই মতন—আচার আচরণ স্বভাব-চরিত্র ও বুদ্ধির দিক থেকেও।

কিজালের যমজ বাঘিনীর হত্যা লীলার অবসান হল। বলতে দ্বিধা নেই যে মালয় অরণ্যে আমার যত বিচিত্র আর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে সাংঘাতিক। কেননা যুগল বাঘিনীর অন্বেষণে আমি মৃত্যুর সঙ্গে কর মর্দন করেছিলাম।

*কর্ণেল অ্যালেন লকের একটি কাহিনীর ছায়ায়।



শিকার কাহিনী

আমার প্রথম শিকার

—শের জঙ

শের-জঙ্—হলেন এমন একজন শিকারী যিনি শুধু অরণ্যের ভয়াবহতাকে অন্বেষণ করেই তৃপ্ত থাকেন নি, এর পাশাপাশি তিনি নিভৃত বনের অন্তরালে বিস্তৃত অপার সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন।

তাই তাঁর চোখে জঙ্গল তার নিশি—উন্মথিত রূপের হাজার পশরা সাজিয়েছে, হয়েছে সে রহস্য ঢাকা কুহক।

এই বিচিত্র সুন্দর অরণ্যের সাথে প্রথম পরিচয়ের অপূর্ব এই কাহিনীটি আমরা বেছে নিলাম।

॥ এক ॥

তখন অক্টোবর মাস, পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এমনই সময় দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে আমি আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ছ মাইল ব্যবধানে ওপারে চলেছি, ওপারের সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

তখন আমি চৌদ্দ বছরের কিশোর। আমার জীবনের সেই প্রথম শিকারী হিসাবে একক অভিযান। আমার জীবনের বহুদিনের বহু কামনার ধন হোল বনের বাঘ—বনের মধ্যে যে সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়, সেই বহু কল্পনার সামগ্রীর উদ্দেশ্যেই আজ আমার যাত্রা, তাই শিকার আজ আমার উত্তপ্ত রক্তের হিল্লোল।

আমার বাবা শিকারী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। গুলি ছুঁড়তে আর বল্লম শিকারে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর আজীবনের শখ ছিল বনের বড় বড় জানোয়ার শিকার করব। তাই তিনি সরকারের অধীনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সেই পদ ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে এসে বসবাস করেন সমস্ত শিকারীর কল্পনার স্থান এই শুভ্র পার্বত্য গিরির উপত্যকায়। উদ্দেশ্য হল, বনের বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী হত্যার মাধ্যমে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোকে রঙিন আনন্দে উজ্জ্বল করে তোলা।

তখন সময়সীমা হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধ, ঐ জায়গায় সেই সময় একটা বাঘ ক্রমান্বয়ে গরু মেরে গ্রামের লোকদের তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এই বাঘটি এত শয়তান ছিল যে তার শয়তানিতে তুন উপত্যকা থেকে ১৫০ বর্গ মাইল জায়গা ঘিরে গ্রামবাসীরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। বর্ত্তমানে হিমাচল প্রদেশের দক্ষিণ দিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই জায়গাটি।

এই রকম আশ্চর্য ধরনের হিংস্র বাঘ দেখতে পাওয়া বর্ত্তমানে

খুবই দুর্লভ। যেখানে অন্য বাঘ তাদের উদরপূর্ত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু মেটাবার জন্যই হত্যা করে, এবং অবশিষ্ট কটা দিন ছুটি নিয়েই উদরপূর্তি করে, এই বাঘটি সে জায়গায় কোন বাছবিচার না করেই অনবরত শিকার করে চলে। একদিন এই বাঘটি শিকারের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, খালি একদিনেই বাঘটার শিকার হয়েছিল এক জায়গায় আটটা আর অন্য জায়গায় ছ ছ'টো মোষ!

বাঘটার গতিবিধিও ছিল অন্যান্য বাঘদের থেকে বেশ স্বতন্ত্র ধরণের। চলবার সময় মাটিতে বাঘটার বাঁদিকের সামনের পায়ের ছাপটা পড়ত একটু লম্বাটে হয়ে এবং কিছুটা আবছা হয়ে—তার থেকে বেশীর ভাগ লোকের মনেই এই ধারণা হয়েছিল যে, সে বোধ হয় চলবার সময় একটু পা টেনে চলত কেননা, মাটিতে তার পায়ের যে ছাপ পড়ত তাতে লক্ষ্য করা যেত যে, তার বাঁ পায়ের পাঁচ আঙ্গুলের জায়গায় ছটা ছাপ পড়ছে সেজন্য তার নূতন নামকরণ হয়েছিল, অবশ্য গ্রামবাসীরা দিয়েছিল ল্যাংড়া চ্যাঙ্গা, অর্থাৎ 'ছ' আঙ্গুলে খোঁড়া।

আকারে সুবিশাল হাওয়ায় এবং লম্বা চওড়ায় অস্বাভাবিক রকমের মেদবৃদ্ধি হওয়ার ফলে সে ছুটে গেলেও বনের সুচতুর জানোয়াররা তার বেহাত হয়ে পড়ত। অনন্যোপায় হয়ে অবশেষে সে গরু চুরির পন্থাই অবলম্বন করে। তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে সে তার এই স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে সেই জায়গায় নির্বিঘ্নে রাজত্ব চালাচ্ছিল। এই সময়ের মধ্যেই সেই শয়তানটা অনেক দূরাঞ্চলের গ্রামের চাষীদের গরু ছাগলও খেয়ে খেয়ে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল।

অমরাবতীর সুখ সম্ভোগেই উন্মত্ত অমরাগণ, তাদের বিন্দুমাত্রও অবসর নেই পৃথিবীর ক্ষুদ্র ব্যাপারে নাক গলানোর। আর এ জায়গাটা তখন যে সব দেশীয় ভূস্বামী অথবা জমিদারের রাজ্যসীমার

আওতার মধ্যে পড়েছিল, তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড রকমের বিলাসী, প্রকৃতিতে এই সব সুখোমত্ত দেবতাদেরই অনুরূপ।

যদি কোন মহানুভব শিকারী তাঁদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি-প্রবণ হয়ে কিছু সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, খালি তাহলেই লোকে সহস্র বাধা বিঘ্নের হাত থেকে কিছুটা নিস্তার পেত। অবশ্য তা করতে হোত অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। কারণ, একমাত্র ভূস্বামী অথবা জমিদার ছাড়া সেই সময়ে অধিকাংশ রাজ্যেরই সাধারণ লোকের কোন দাবী ছিল না বাঘ শিকার করার।

আমার পিতৃদেব এই অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বাঘটাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে মাসের পর মাস, শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার বহু প্রাকৃতিক অত্যাচার সহ্য করেও বাধ্য হয়ে বহু রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বারবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি যতবারই ইচ্ছা করেছেন বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হতে, ততোবারই তাঁকে বোকা বানিয়ে বাঘটা পালিয়ে গেছে।

এমন সময় একজন গ্রামবাসীর মুখে যখন শুনলাম যে, রক্ত পিয়াসী চ্যাঙ্গাটার হাতে তার শেষ বলদটার প্রাণনাশ হয়েছে তখনই আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম ধোলা কুন্‌বার জঙ্গলের উদ্দেশ্যে, অক্টোবরের আকাশ তখন গোধুলি আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে।

আমার বাবা যখন খবরটা পেলেন তখনই তিনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, "কিরে, ভাগ্য পরীক্ষা করতে একবার যাবি নাকি?" আমি তৎক্ষণাৎ আমার সম্মতির কথা জানিয়ে দিলাম। যদি আবার পরে বাবা অসম্মত হন এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম, তখন আধঘণ্টাও হয় নি, এর মধ্যেই আমি ঘোড়ায় চড়ে তার নাগালের বাইরে চলে গেলাম। লোকটা যে গ্রামের অধিবাসী, সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে আমার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

আমার এই ঘোড়াটার বয়সই যে শুধু কম তাই নয় তার জাতটাও

খুব ভালো। সে ছিল উৎকৃষ্ট জাতের কাথিয়াবাড়ি বংশের ঘোড়া। তার আকৃতিটাও খুব চমৎকার। বুনো শুয়োর তাড়াতে তার খুব উৎসাহ। তার এবং আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা ছিল একটু বেশী রকমের গভীর। ও আমাকে সাথী হিসাবে বহুবার সাহায্য করেছে, যখনই অমি ছুটতে ছুটতে বর্শার ফলা দিয়ে তাঁবুর খুঁট তোলা অথবা বেড়া টপকানোর খেলায় আনন্দকে উপভোগ করতে চেয়েছি এবং এভাবেই আমাদের উভয়ের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল।

এরকম একটা কাজের দায়িত্ব পেয়ে আমি তখন আহ্লাদে প্রায় আটখানা। আমার এই আনন্দের ভাগ থেকে আমার ঘোড়া মোতিও (যার নামকরণ করেছিলাম আমি) বঞ্চিত ছিল না। খুব খোশ-মেজাজে তখন আমরা চলেছি, আমি আর মোতি রাস্তার ঝোপঝাড়, খানা ডোবাকে তোয়াক্কা না করে। একটা জায়গায় এসে একটা বেশ লম্বা কাঁটাগাছের ঝোপ পার হতে গিয়ে মোতি যখন আচমকা একটা বিরাট লাফ দিলে তখন আগে থেকে বুঝতে না পারায় আমি অপ্রস্তুত হয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম তার পিঠ থেকে। এই আকস্মিক পড়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে যেই না ঘোড়ার জিনটাকে নাগালের মধ্যে আনার জন্য হাত বাড়িয়েছি, অমনিই বন্দুকটা আচমকা হাত আলগা হয়ে গিয়ে পড়ে গেল নিচের জমিতে। সেখানে মাটিটা ছিল খুব কঠিন অর্থাৎ শুকনো, তাই বন্দুকটা মাটিটাকে স্পর্শ করামাত্রই 'খটাশ্' করে একটা আওয়াজ উঠল।

ঘোড়াটা তাড়াতাড়ি ঝোপটাকে অতিক্রম করেই থেমে গেল রাস্তার উপর এসে। মাটিতে নেমে রাইফেলটা আমি তুলে নিলাম। বন্দুকটা হাতে নিয়ে চারপাশ দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, একটু ফেটে গেছে সেই ছোট্ট কাঁচের হাতলটা, যেটা বন্দুকের গুলি ছোড়া নলের বাঁদিকের যন্ত্রসমূহের সাথে যুক্ত নীচেকার পাতের স্তরের সঙ্গে কোনাকুনিভাবে আঁটা। বেদনায় আমার চোখে জল এসে গেছিল

—এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট তো হোলই, তার ওপরে আমার বাবা হয়ত এরপর আমায় প্রচণ্ড রকমের তিরস্কার করবেন এরকম একটা আশঙ্কাও তখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল।

হাতের অবশিষ্ট নলটার গর্তটা এমনি সাধারণ ধরণের। এখন আবার বাড়ী ফিরে যাব না নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে বাঘের পশ্চাদানুসরণ করব—দেরী না করে এখনই আমাকে এর জন্য যে কোন একটাকে নির্বাচন করে নিতে হবে। এর মানে হোল, বাঘ না আমার পিতৃদেবের কাছে যাব এখন, আমার এই ভাঙা বন্দুকটা নিয়ে?

একটা বুদ্ধি বার করলাম। আমার সঙ্গের মুখ মোছা তোয়ালেটা দিয়ে বন্দুকের কাঠের চিড় খেয়ে যাওয়া হাতলটাকে আচ্ছা করে বেঁধে নিয়ে মোতিকে একটু আদর করে জিনের ওপর পা রেখে তার পিঠে উঠে বসলাম। আর তারপর? তারপর সোজা আমি আর মোতি উভয়েই বিদ্যুতের বেগে ধাবিত হলাম জঙ্গলের দিক লক্ষ্য করে।

আমরা উভয়েই তখন আগেকার চাপল্যকে বর্জন করেছি। তার পরিবর্তে, কিভাবে এই অপ্রিয় চিন্তাগুলোর সমাধান করা যায় তাই আমাদের তখনকার মতো দুজনের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো। মোতির পরের চিন্তা হোল কিভাবে লাফিয়ে ঝোপ ডিঙ্গানো যায় আর আমার পরের চিন্তা হোল বাবার সামনে কি মুখ নিয়ে উপস্থিত হব।

অবচেতন মনে আমার চোখে উঠল সেই বাঘটার অপরূপ রূপসৌন্দর্যরাশি। আমি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমার স্মৃতিপটে উদিত হোল প্রায় দু-বছর আগেকার প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা।

চারপাশের যে সমস্ত গ্রামবাসীদের পোষা গরু ছাগলগুলো চাঙ্গার শিকার হয়ে পড়েছিল, সেখান থেকে কিছুটা দূরে দলবলসহ আমার বাবার তাঁবু ছিল। দলের সকলের আহারের কারণে

আমাকে মাংস সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্বটা ঠিকমত পালন করাই হোল আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

যৎসামান্য শিকারের ইচ্ছা নিয়ে আমি বন্দুকটা কাঁধে ফেলে অতি প্রত্যূষেই যাত্রা করলাম।

একটু গভীরে প্রবেশ করতেই আচমকা শাল বনের ভেতর থেকে ভীত একদল বুনো মোরগের কঁক-কঁক্ শব্দ শুনতে পেলাম। জঙ্গলের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তখনও আমি ভালো করে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারি নি, তখনও আমি জানি না, বনের জন্তু-জানোয়ারদের ভাষা কি রকম হয়। পাখিগুলোর চীৎকার ভবিষ্যৎ-বিপদের সঙ্কেত করে সকলকে সচেতন করে তুলছিল। সেই আওয়াজটা যেখান থেকে আসছিল, আমি সেই দিক লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম।

যে ঝোপটার ভেতর থেকে বন-মোরগের ভীত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসছিল আমি খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বনমোরগেরা এরকমভাবে ঝোপের মধ্যে মিশে গিয়েছিল যে, উভয়ের ব্যবধান মাত্র সাত-আট হাত হলেও সম্পূর্ণভাবে তারা আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

আমার সতর্কদৃষ্টিটা চারপাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মাটির বুকে শাল বনের প্রতিবিম্ব পড়ে তাকে করে তুলেছিল ঘোর কালো রঙের, তার ওপর জঙ্গলের বিশাল বিশাল গাছের পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রভাত সূর্যের সোনালি আলো এসে তির্যক ভাবে সেই কালো জমিটার ওপর পতিত হয়ে তাকে চুম্বন করে যাচ্ছিল বারবার, তাদের উভয়ের এই আলিঙ্গিত দেহসৌন্দর্য আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমার বাবার ড্রয়িংরুমের দেয়ালের আর মেঝের ওপর বিছানো বাঘছালটিকে।

আমার সমস্ত চিত্তকে সেই কঁককঁক শব্দের দিকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ করে ঝোপ লক্ষ্য করে আমি অতি সন্তর্পনে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

গুলি ছুঁড়ে কতকগুলো বনমোরগ শিকার করার তীব্র ইচ্ছা আমাকে প্রবলভাবে চালিত করছিল সেই ঝোপটার মধ্যে গুলি ছুঁড়তে—তবুও আমি গুলি ছুঁড়লাম না। কারণ, সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ই আমার স্মৃতিপটে উদিত হোল অস্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত সেই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য কটি "স্পষ্টভাবে কোন কিছু না দেখে গুলি ছুড়ো না কখনো"। তাই মনের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হলেও তাকে ত্যাগ করলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এক পলকের জন্য ঝোপের অপর পাশটা পর্যবেক্ষণের ইচ্ছা নিয়ে ছায়াচ্ছন্ন স্থান পরিত্যাগ করে আমি ঝোপটার চারদিকটায় মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম।

ঝোপটার চারদিক ঘুরে এসে যেমনই উঠে দাঁড়িয়েছি, তখনই বিরাটাকৃতি একটা ব্যাঘ্রসুন্দরের সঙ্গে একদম মুখোমুখি আমার শুভদৃষ্টি (অবশ্য শুভ না অশুভ তা তখন আমার জানা ছিল না) হোল। আমাদের উভয়ের মধ্যকার ব্যবধান অন্ততপক্ষে কুড়ি হাত হবে।

চারদিক থেকে তার গায়ের আবেশ আর অন্ধকার এসে মিশে গিয়েছিল যেন, আর তার সেই অপরূপ দেহ সৌন্দর্য নিয়ে সে যেন ঠিক বিখ্যাত চিত্রকর ভ্যানগগের সোনালি-কালোর আঁকা চিত্রপটের একখানা ছবি। তার এই অপরূপ দেহসম্পদ আমাকে বিন্দুমাত্রও ভীত করে তোলে নি—পরিবর্তে তাঁর এই বিস্ময়কর অশান্ত রূপরাশি আমাকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে তুলেছিল। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল, রঙগুলো খুজে পেল তার গতি, আর তারপর—ওঃ, আকাশ চিরে একটা গর্জন শোনা গেল। আর তাতে যে সুর উঠল তাতে ক্রোধ অপেক্ষা তিরস্কারের সুরই বেশী মেশানো ছিল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই, বাঘটা উলুবনের ভেতর এক লাফে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বাবার কাছে সব কথা বললাম। সঙ্গে সঙ্গে বাবা জঙ্গলের চারদিকে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু সমস্ত দিন ধরে তল্লাশী করেও কোন লোকই সেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাঘটির কোন খোঁজই পেল না।

আমার সঙ্গে চাঙ্গার সেই প্রথম মিলন। সেদিন তার উপস্থিতি আমাকে ভীত করে তোলার চেয়ে আনন্দিতই করে তুলেছিল বেশী। তাই এখন আমি নির্ভীক হৃদয়ে ঘোড়ায় চেপে দ্রুমগতীতে ছুটে চলেছি, তার বর্ত্তমানের অত্যাচারিত অঞ্চলের দিক লক্ষ্য করে উপরন্তু আমি তখন নিতান্তই উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলাম তার সঙ্গে আমার পুরানো অথচ প্রত্যক্ষ পরিচয়টাকে নতুনের মোহে উচ্ছাস করে তোলার জন্য।

যে গ্রামে বাঘটা বলদটাকে মেরেছিল বেলা তিনটের সময় আমি সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। যেখানে সেই বলদটার মৃতদেহ পড়ে আছে, সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটা জঙ্গলের কিছুটা ভেতরে, এই জায়গাটায় যেতে গেলে এখান থেকে কয়েক মাইল হাঁটতে হবে। শিকারীর আগমনের প্রতীক্ষায় সমস্ত গ্রামবাসীরা নিতান্তই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। সেখানে যখন তারা আমার মতো শিকারীকে দেখল, যার বয়স নিতান্তই অল্প তার ওপর আবার চুলগুলো তার খাড়াখাড়া এবং একটা নিরীহ ভাব ছড়ানো তার সমস্ত চোখেমুখে তখন একটা আশাভঙ্গের বেদনায় তারা ভেঙ্গে পড়ল—আমার ওপর ঠিকমত নির্ভর করতে পারল না।

গৃহবধূরা তাদের মেয়েরাও কৌতূহল দমন করতে না পেরে খড়ের ঘরের দরজার পাশ দিয়ে আমাকে আড়াল থেকে দেখছিল —এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একটা কাজল কালোর হরিণচক্ষু বিশিষ্টা কিশোরী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সে আস্তে আস্তে তার বান্ধবীর কানে কানে কি একটা বলল, তারপর আমার উদ্দেশ্যে একটু হাসল—আমার মনে হোল, সে বোধ হয় আমাকে ব্যঙ্গ করছে।

যখন হাতের ঘড়িটার ওপর চোখ পড়ল, সচেতন হলাম সূর্য তখন মাথার ওপরে। তারপর নজরে এলো ভাঙা বন্দুকটা। ভীষণ-

ভাবে আঘাত পড়ল আমার উৎসাহে। একে একা, তারওপর গাঁয়ের লোকেদের সামনে নিজেকে অপদস্থ না করে তোলার জন্য আমি দারুন হতাশায়ও নিজের চোখে জল আসতে দিলাম না। যা হোক, কোন মতে গলা ঝাঁকিয়ে আমি আমার মনটাকে এই গ্রামেরই অধীবাসী ভুরোচাচার সন্ধানে নিযুক্ত করলাম। ভুরোচাচা এই গ্রামেরই একজন বয়স্ক অধিবাসী, কিন্তু লেখাপড়া না জানলেও তিনি যেমন ছিলেন অত্যন্ত রকমের বিনয়ী তেমনি মনটাও ছিল তাঁর খুবই স্পর্শকাতর। বাল্যকাল থেকেই এই ভুরোচাচা আমার পরিচিত। আমি যখন সেই গ্রামে পৌছলাম তখন ক্ষেতে কাজ করছিলেন ভুরো-চাচা। আমার আগমনের সংবাদটা তাঁকে দেওয়ার জন্য গাঁয়ের একটা ছোট বাচ্চাছেলে তখুনি ছুটে গেল তাঁর ক্ষেতে। খবরটা পেয়েই ছুটে এসে ভুরোচাচা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বুকে।

সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে আমার ওপরে শুধু তারই অগাধ আস্থা দেখে মনে মনে বল পেলাম।

আনন্দে ডগমগ হয়ে ভুরোচাচা আমাকে প্রশ্ন করলেন, "বেলা হয়ে গেল অনেকটা, না? তাহলে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দেখি, চ্যাঙ্গার মতামতটা আবার কি ধরনের হয়।"

জঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমি ভুরোচাচাকে সঙ্গে করে অভিমানে বের হলাম, অবশ্য তার আগে মোতিকে পিঠ চাপড়ে আশ্বস্ত করে তার খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করে তাকে গ্রামেই রেখে এসেছিলাম।

আমরা, আমি আর ভুরোচাচা বিকেল পাঁচটাব সময় তাবুস্থলে পৌছলাম। তখন বাঘের আগমনের প্রত্যাশা করা মূর্খতা মাত্র। সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে চারটে বাজার অনেক আগেই আমার তাদের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কেননা, এ সময়ের মধ্যে বাঘেরা এবং বিশষতঃ চিতাবাঘেরা আলস্য ত্যাগ করে। মড়ির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য পছন্দমত একটা :জায়গা ঐ মড়ির থেকে কিছুটা: ব্যবধান রেখে অপেক্ষা করে।

চারদিকে সুগভীর নলগাছে ঘেরা একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে শিকার-টাকে ফেলা ছিল,—তার চারদিক ঘিরে আবার সুবিশাল গগনচুম্বী শালগাছ। এরকম একটা পরিস্থিতি আমার মনটাকে ভীষণ রকমের বিষন্ন করে তুলল। চার দিন আগেকার মৃত বলদটার সমস্ত দেহটার মধ্যে অবশিষ্ট যা ছিল দেখবার মধ্যে কেবল চারদিকে ছড়িয়ে ছিল কতকগুলো শুকনো হাড়, তাও হায়নারা, শিয়ালেরা ও শকুনেরা তাকেও ঠুকরে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে।

এমন সময় আমার দৃষ্টি পড়ল ভুরোচাচার ওপর। আমার চেয়ে তিনি বেশী হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার কাছে সরে এলেন, গলার স্বর আস্তে করে বললেন তিনি, যেখানে শয়তান চ্যাঙ্গাটা মন্থমতে দেহের কাছে ভুলেও আসে না সেখানে আমাদের এনমই দুর্ভাগ্য যে এই মড়িটাকে নিতান্তই দু-একদিন আগেই মারা হয়েছে। এটা সবথেকে দুর্ভাগ্যের কথা যে আমাদের শিকার করার নির্দিষ্ট সময় আমাদের প্রস্তুত হবার অনেক আগেই চলে গেছে। আমি চাচার মত জানতে চাইলাম, বললাম, এই সময়টা হরিণ শিকার অথবা শুয়োর হত্যা করারও উপযুক্ত নয়। তাহলে আমাদের উভয়ের গ্রামে ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। বরঞ্চ কিছুসময়ের জন্য এই রাত দশটা পর্যন্ত এখানেই তার অপেক্ষা করা যাক না?

ভুরোচাচা আমার মতামত জেনে একটা মুখে আপত্তি তুললেন বটে, কিন্তু একটা আনন্দের সম্মতির রেশ দেখা গেল তার সহানুভূতি-পূর্ণ দরদী চোখের কোনে। তা লক্ষ্য করে আমি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম নিজেকে এখন স্বাধীন বলে মনে করলাম। ব্যাডমিন্টন আকারের যে বিরাট ফাঁকা জমিটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল তার চতুর্পাশে মরা জীবজন্তুর মাংসশূন্য ফ্যাকাশে হাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। তার ওপর শালবনের ছায়া জায়গাটাকে এমন নিবিড় ও গভীর করে তুলেছিল, যে তা মনের মধ্যেও একটা অজানা

আশঙ্কার সৃষ্টি করছিল। প্রায় চার ফুট উঁচু হবে এমন একটা উইয়ের ঢিবি দেখতে পেলাম, ঢিবিটা ছিল এখান থেকে পূর্বদিকের কোন ঘেষে। আমার বসার জায়গা হিসাবে এই ঢিবিটাকেই আমি মনোনীত করলাম। উঁচুনীচু ঢিবিটাকে সমান করে নিয়ে নিশ্চিন্ত-ভাবে বসবার জন্য তার ওপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিলাম। পা দুটোকে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে কোলের ওপর রাইফেলটাকে আধশোয়া করে রেখে কম্বলের ওপর বসে বাঘের অপেক্ষায় রইলাম।

হাতের ইসারা করে ভুরোচাচাকে গৃহে ফিরে যেতে বললাম। কেননা, ঢিবিটা দুজনের বসবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এমন একটা বিশ্রী জায়গা থেকে বাঘ শিকার করা খুবই কঠিন ব্যাপার। যদিও ঢিবির অসমতল স্থানগুলো আমি বসেবসেই অনুভব করতে পারছিলাম এবং তা আমাকে যারপরনাই বেশ বিব্রত করে তুলছিল, তা সত্ত্বেও আমি তার কোন প্রকাশ না করে ভুরোচাচাকে স্থান ত্যাগের জন্য ইঙ্গিত করলাম। অন্ততঃ চারঘণ্টা ধরে এই রকম নিজের মনোনীত স্থানরূপ কণ্টকশূলের অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করতে হোল।

মনে মনে আমার একটা বদ্ধ ধারণা ছিল যে এমন অসময়ে বাঘ হয়ত আজ আর আসবে না। তবুও এই প্রথম বারের জন্য বাঘের অপেক্ষায় আমার একক অভিযান, একটা অব্যক্ত অনুভূতি বারবার আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ রাত্রি-যাপনের অভিজ্ঞতা এর আগেও আমার অনেকবারই হয়েছিল। তাই, বনজঙ্গল কিংবা রাত্রির অন্ধকারের নিঃস্তব্ধতায় আমার ভয় আস্তে আস্তে অনেকদিন আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল।—তাই মনে মনে দুটো ব্যাপারেই আমার আগে থাকতেই রীতিমত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল।

আমার বাবা অনেক পশু পাখী পুষতেন, বাড়িতে তাই এদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল। তিনি এবং আমি ছাড়া আর এদের নিয়েই আমাদের বাড়ীটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই অনেক

রকমের গল্প তাই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র আর সেই সঙ্গে রুডিয়ার্ড কিপলিং এর গল্পও আমার জানা ছিল।

বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে এই বাস্তব পরিবেশের চারদিকে তীব্র দৃষ্টি বোলালাম। সমস্ত জঙ্গলটা নিশ্চুপ, চারদিক থম্‌থম্‌ করছে। সকলেই যেন ভবিষ্যৎ অমঙ্গলাশঙ্কায় নীরব হয়ে সময়ের প্রতীক্ষায় আছে। খালি জঙ্গলের মধ্যে বিচিত্র সব পোকামাকড়ের একঘেয়ে গুনগুন আওয়াজ। মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতার বুক চিরে কাঠঠোকরার বিব্রত স্বর শোনা যাচ্ছে। একটার পর একটা মধুর কল্পনা আমাকে মোহাবিষ্ট করে তুলেছে—একটা অবিচ্ছিন্ন শান্তি মনে মনে অনুভব করছি। যৌবনাগনের বিচিত্র সুখস্বপ্নের জগত আমার মনে বিচিত্র ভাবতরঙ্গের দোলায় দোলায়িত—মনে হচ্ছে আমার মনের সেই অব্যক্ত কামনা বাসনায় জগতে আমি যেন সেই হরিণনয়না গ্রাম্যবালার সঙ্গে ক্রীড়ারত।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে আমার সেই সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে সেই আওয়াজ যেন মিনাম্বিত; একেবারে নতুন ধরনের—আওয়াজটা আমার চেতনার গভীরে গিয়ে আঘাত করল। মনে তৎক্ষনাৎ একটা সন্দেহ জাগল, এ-আওয়াজ বাঘের নয় ত? তাহলে কি আমাকে দয়া করতে বাঘের আগমন ঘটেছে?

বন্দুকের একটা মাত্র নল আমার কাজের সহায়ক। প্রায় সোয়া তিন ইঞ্চিটার একটা কার্তুজ ভরা রয়েছে তার মধ্যে। আসার সময় আমার বাবা নিজের হাতে ভরে দিয়েছেন খোলের ভেতর মোম দিয়ে আটকে পাঁচ ড্রাম কালো বারুদ আর—লোহার বারোটা বাক্‌শট গুলি। উত্তেজনায় আমার হৃৎপিণ্ডটার স্পন্দন তখন অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত। বন্দুকের ছোট হাতলটা আর ফিশপ্লেটের ওপর আমার হাত শক্ত হয়ে চলে গিয়েছে। একটুও

শব্দ না করে চোখ ঘুরিয়ে দেখলাল, হায় ভগবান, বাঘের জায়গায় একদল শেয়ালের আগমন ঘটেছে সেখানে।

ভালো করে গুনে দেখলাম, সাতটা শেয়াল আছে তাদের দলের মধ্যে। শীতকালে নতুন লোমে তাদের আপাদ মস্তক ঢাকা। খুব সতর্ক ছিল শেয়ালগুলো; নিজেদের পাপবোধ সম্পর্কে তারা খুবই সাবধানী ছিল। তাদের মধ্যে পাশ করে কতকগুলো যখন মড়ার হাড় চিবোতে ব্যস্ত ছিল, তখন বাকিগুলো কিছু সময় ধরে ধরেই সজাগ হয়ে চারদিকে সতর্ক ও সাবধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলেছিল।

আচমকা তারা তাড়াতাড়ি করে খাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিকটবর্ত্তি জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গিয়ে আত্মগোপন করল।

আমার অজান্তেই কখন ওরা আমায় আগমনের খবর পেয়ে গেছে দেখে আমি কিঞ্চিৎ খুব্ধ ও বিষন্ন হয়ে পড়লাম।

আচম্‌কা আমার ডানদিক থেকে একটা ময়ূরের তীক্ষ্ম স্বর ভেসে এল। সেই আওয়াজে সমস্ত জঙ্গলের মধ্যেকার এতক্ষণের বিরাজমান নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একটা আশঙ্কা আমাকে ভীত ও চকিত করে তুলল। আস্তে সমস্ত বনটা কিছু সময় ধরে ময়ূরের সমবেত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কাছ থেকে একটা সম্বর ও তার 'চাঁক চাঁক' আওয়াজটাও মিলিয়ে দিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিতলের দলের কম্পিত সবরমূছ'না প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নামল, সে আওয়াজে কম্পিত হোল শখর।

প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলল কে কতোখানি স্বরগ্রাম উচ্চে তুলতে পারে, তারই প্রতিদ্বন্দ্বীতা।—প্রথমে ধীর গম্ভীর স্বরে চলতে চলতে একটু উঁচুতে উঠল, তার পর আস্তে আস্তে একেবারে উঁচুতে উঠে গিয়ে উদাত্ত সুরসৃষ্টি হোল—তারপর তা আস্তে আস্তে আকাশের অসংখ্য তারার মধ্যে অপলকে নিঃশেষ করল।

তারপর, তা রাত্রির ঘুমস্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হয়ে মধ্যরাত্রির গুরুগম্ভীর নৈঃস্তব্ধতাকে স্বাগত জানাল।—একটা স্বপ্নের মতো যেন

সব কিছু মনে হোল, এখন সেই স্বপ্ন গিয়ে পূর্বের অবস্থা ফিরে এল সেই সারা বন জুড়ে একঘেয়ে নিঃস্তব্ধতা এবং কীটপতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি আর মাঝে মাঝে তার মধ্য থেকে পশুপাখীদের বিভিন্ন ধরনের চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

মেরুদণ্ডটাকে সিধে করে বসে আছি। একটা অজানা আশঙ্কায় নিশ্চুপ সমস্ত বনভূমিটা। এমন সময় ভীত শেয়ালেয় দলের সমবেত চীৎকার শোনা গেল—'ফে···উ' ; ফে···উ'। বাঘ যে আসেপাশেই আছে, তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু ঠিক কোনখানে তার অবস্থানটা সেটা অনুভব করতে পারলাম না।

এইসব ভাবছি, এমন সময় কাছেই একটা খুব আস্তে মচংমচ্ আওয়াজ উঠল ঘাসের মধ্যে। সোজা রেখে ঘাড়টাকে ডানপাশের রগের দিকে চোখের তারা ডুটোকে ঠেলে পাঠালাম। দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ে ও অনন্দের এবং উত্তেজনায় আমার চোখ বিস্ফারিত। কারণ সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। একটা মুহূর্তের জন্য আমার সমস্ত মনে তীব্র আলোড়ন, সমস্ত চেতনা জুড়ে একটা ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটে গেল।

মনের মধ্যে এর সত্যতা নিয়ে নানারকম সন্দেহের উপস্থিত হোল। দেখলাম, সন্ধ্যার গভীর অস্পষ্ট অন্ধকারে, অসম্ভব রকমের বড় মাথাটা নীচু করে, সামনের থাবা ডুটো মুড়ে বিরাট আকারের একটা বাঘ নিজের গায়ের ময়লা পরিস্কারে ব্যস্ত। ঘাসের ওপর সমস্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়েছে সে। তাকে এই অবস্থায় দেখে মনে হচ্ছে, যেন পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে কোন অলস কুকুর সোজা হয়ে শুয়ে শুয়ে আলিস্যি ভাঙছে। ঘাড়টা সোজা থাকার জন্য তার পেছনের সবটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বাঘটার আগমন হোল কোন পথ দিয়ে তবে ? কোন সময়েই বা তার আগমন ঘটল ?—এসব নানাবিধ চিন্তা আমকে পীড়িত করে তুলেছিল। আশ্চর্য রকমের বাঘটার গতিবীধি, আচার আচরণ,

'আমাকে বিস্মিত করে তুলল এই ভেবে যে বাঘটা নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসেছে—তার আসার সময় একটা পাতার পড়ারও শব্দ হোলনা, এমনকি গাছের একটা ডালও ভাঙেনি তার পায়ের আঘাতে, অথবা তার পায়ের নখের আঁচড়ে একটা ঘাসও ছেড়ে নি।—তাই কেউই কিছু বুঝতে পারেনি যে সে আসছে।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে দম বন্ধ করে কোন শব্দ না. করে আমি পাথরের মতো বসে রইলাম। একাগ্র দৃষ্টি চোখে। উত্তেজনায় চোখের পলক ফেলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় গুলি করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ. আমার অসুবিধে যেদিকটায়, বাঘ ঠিক সেদিকটাতেই বসে, আর আমার দুর্ভাগ্য এমনই যে বাঘটা যেদিকে বসে আমাব বন্দুকের নলটা ঠিক তার বিপরীত দিকে। এর ওপব আবার আমার কোলের ওপব বন্দুকটা পড়ে আছে,—তাকে কাঁধে তুলে টিপ করতে গেলেই বাঘটা টের পেয়ে যাবে এবং গুলি ছোড়ার আগেই এক লাফে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে।— তাই সে আশাও সুদূর পরাহত। উত্তেজনায় বন্দুকটাকে আমি এমন জোবে চেপে ধরেছি যে আমাব আঙ্গুল-গুলোতে ব্যথা অনুভব করছি। হঠাৎ দেখি রঙগুলো নড়েচড়ে উঠল এবং চাঁদের আলো তাব প্রকাণ্ড শরীরটার ওপর পিছলে পড়ছিল বলে সমস্ত শরীরটা থেকে একটা প্রখর জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল। বিদ্যুৎ গতিতে সেই রঙিন ছবিটা একটও শব্দ না করে সামনের দিকে এগুতে লাগল, তাই দেখে বিস্ময়ে আমার সমস্ত শরীরটা বিকল হয়ে যেতে লাগল।

বাঘটার মুখ ছিল সামনের দিকে, আমার বন্দুকের নলের ডানদিক দিয়ে। এবং ডানদিক থেকে খুব সামনেই তার ফুসফুস লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুঁড়তে পারি।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে আমি বন্দুকটা হাতে নিলাম। যে মুহূর্তে বন্দুকটাকে আমি কাঁধের উপর তুলেছি, একটা উলুঘাসের

ডগায় বন্দুকটার নলটা ঘসে গিয়ে একটু সামান্য শব্দ হোল। কিন্তু সেই শব্দটা এতোই ক্ষীণ যে কোন মানুষের পক্ষেই তা শোনা সম্ভব ছিল না। আর, বাঘ আর আমার মধ্যকার ব্যবধান হোল প্রায় ষাট গজ দূরে। তবুও সে শব্দটা সে ঠিক শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল, তার চোখে মুখে একটা বীভৎস ভাব খেলা করতে লাগল, আর আমার বন্দুকটাও তার যোগ্য জবাব দিতে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল— আমি বন্দুকের ট্রিগারে হাত রাখলাম।

আমার বন্দুকটি এক ঝলক বিদ্যুৎ উদ্গীরন করার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রচণ্ড আওয়াজ বনের নীরবতাকে আরও ঘন করে তুলল, আর বাঘ আর আমার সামনে গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী বিরাজ করতে লাগল।

সামনে ধোঁয়ার বিরাট কুণ্ডলী দেখে আমি রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি গায়ের জোরে বন্দুকের পশ্চাতভাগটা খোলায় মন দিলাম—উদ্দেশ্য ছিল যে এই সুযোগে কতকগুলো তাজা কার্তুজ দিয়ে চেম্বারটাকে ভর্তি করা। কিন্তু বন্দুকের অবস্থা লক্ষ্য করে আমি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, হাত থেকে বন্দুকটা বিকেলে মাটীতে পড়ে যাওয়ার দরুন যেটুকু নষ্ট হতে বাকি ছিল এখন বোকার মতো আমার ঝাঁকানিতে আর আচমকা গুলি ছোড়ায় অবশিষ্টটুকুও একেবারে নষ্ট হয়ে বন্দুকটাকে একেবারে বিকল করে দিয়েছে। বন্দুকের হাতলটা ভেঙ্গে গেছে একেবারে দুখান হয়ে আর এই রকম অবস্থায় আমি বিমূঢ় অবস্থায় হতভম্বের মতো বসে আছি।

আমার সামনে ধোঁয়ার আবরনটা তখনও সরে যায় নি। তাই বাঘও আমি উভয় উভয়েরই দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু তার গলার আওয়াজ আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে সেটা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ছটফট করছে। আর রাগে গর্জন করে বনের রাত্রিকালের নীরবতাকে ব্যঙ্গ করছে।

তার কিছুক্ষণ বাদেই একটানা একটা করুন স্বর তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর, একটা মরনাহত মুমূর্ষ কণ্ঠস্বর আ-উ-উ-উ করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল—তারপর আর সেই শব্দটা শুনতে পাওয়া গেল না।

ধোঁয়া কেটে যেতে দেখা গেল একেবারে সামনেই বিরাট চ্যাঙ্গারের শরীরটা পড়ে আছে। বনের রাজা রাজকীয়ভাবে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। —সে দৃশ্য বড় করুন অথচ বড় সুন্দর।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন ছটা বেজে চল্লিশ মিনিট। সেখানে আরও কিছুক্ষণ, এই প্রায় দশ মিনিট মতন অপেক্ষা করে আমি ঢিবি থেকে অবতরণ করলাম মাটিতে। বাঘটার কাছে গিয়ে তার ল্যাজটা স্পর্শ করলাম। স্পর্শ করেই মনটা ভারী রকমের বিমর্ষ হয়ে পড়ল। আবার নিজেকে এত বড় বীরকে যুদ্ধে পরাজিত করার ফলে মনে বেশ একটু অহঙ্কারও হোল। আমি এবার সে স্থান পরিত্যাগ করে মাথার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

তারপর দেখতে পেলাম সেই ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির আবরণ সরিয়ে দিলেন ভুরোচাচা। তিনি আমার কথা শুনে আদপে গ্রামেই ফিরে যান নি। কারণ, আমাকে একা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে তিনি নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন, এরকম হীন ব্যবহার করা তার পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না। তাই তিনি নিকটবর্ত্তী একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে সব কিছু নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং সমস্ত কিছুই নিজের কানে শুনেছিলেন। যা হোক, আমি যখন বাঘটার সামনে দাঁড়িয়ে দুঃখ এবং আনন্দের স্রোতে ক্রমান্বয়ে নিমগ্ন হচ্ছিলাম, তখন তিনি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে কাছে এসে আমার কপালে স্নেহচুম্বন করলেন। তারপর বনের একধারে চলে গেলেন আমাকে সেখানে ফেলে রেখেই এবং তারপর আমার অজ্ঞাত একটা গাছের কতকগুলো পাতা নিয়ে এলেন ছিঁড়ে! তারপর, দুহাতে সেই পাতাগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন বনরাজার

মৃতদেহে—এইভাবে তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন এবং মৃত রাজার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করে গ্রামে ফিরে এলেন—একজন বৃদ্ধ লোক ডগমগ্ হয়ে গর্বে আর আনন্দে আর তাঁর শিষ্য গর্বে আর আনন্দে বুক ফুলিয়ে গ্রামের দিকে চলল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

গোটা গ্রামে আমার বাঘ মারার খবরটা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল, দলে দলে লোক এল আমাকে কেবল চোখে দেখতে, লক্ষ্য করলাম হরিণনয়না মেয়েটিও তাদের সঙ্গে এসেছিল। উত্তেজনায় আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি খুব দ্রুত হয়ে পড়ল। অবশ্য, তার কোমল হৃদয়ের বিস্ময় ও উত্তেজনার দোলা আমাকে বেশী আনন্দ দিয়েছিলো, এবং আমি তাতে এতো বেশী আনন্দিত হয়েছিলাম যে, বোধহয় পৃথিবীর প্রেম নগরী রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের দোলাও আমার হৃদয়কে এমন ভাবে স্পর্শ করতে পারতো না।